অগ্নিযুগের পথচারী

★ ★

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

★ ★

: প্রাপ্তিস্থান :
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

প্রকাশক :
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক
নব ব্যারাকপুর, বিদ্যাসাগর রোড্ সাউথ
পোঃ আহারামপুর, ২৪ পরগণা

প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৩৬৮

মূল্য : টা. ৫·০০ (পাঁচ টাকা) মাত্র

প্রচ্ছদপট : তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর :
শ্রীরামচন্দ্র দে
ইউনাইটেড আর্ট প্রেস
২৫বি, হিদারাম ব্যানার্জী লেন
কলিকাতা-১২

নিবেদন

এই বই সম্পর্কে যা কিছু বক্তব্য তা 'পরিচয়'-এ বলা হয়েছে। তথাপি কিছু লিখতে হচ্ছে তার কারণ এই বই ছাপানোর জন্য আর্থিক সাহায্য প্রাপ্তির কথা ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে সাহায্য পাওয়া যায়নি। ফলে বইখানা দু'খণ্ড করে প্রথম খণ্ড 'অগ্নিযুগের পথচারী' নামে ছাপানো হল। টাকার জোগাড় হলে দ্বিতীয় খণ্ড 'ফেরারী পথচারী' নামে ছাপানোর চেষ্টা করব।

বইখানা দু'খণ্ডে ভাগ করে ছাপানোর ফলে বই অনুপাতে মূল্য কিছু বেশী হয়ে গেল। এর জন্য আমি দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

পাঠক, পাঠিকা ও সমালোচক মহোদয়গণের সমীপে বিনীত নিবেদন, এই বই পড়ে তাঁরা আমাকে সাহিত্যিক হিসাবে বিচার না করে যেন কতকগুলি ঘটনা ও সমস্যার পরিবেশক হিসাবে বিচার করেন।

কোনও কারণে কেউ যদি আমার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে ইচ্ছুক হন, তবে নিম্ন ঠিকানায় পত্র দিয়ে খোঁজ করবেন। আমি কিন্তু সত্যই পথচারী ; তাই বলে কেউ যেন আমাকে গেরুয়া বা জটাধারী পরিব্রাজক সাধুবাবা মনে না করেন।

নিবেদক

লেখক

C/o. শ্রীসুধাংশুভূষণ মৌলিক
নব বারাকপুর। বিদ্যাসাগর
রোড, দক্ষিণ।
পোঃ—আহারামপুর।
জেলা—২৪ পরগণা।

—উৎসর্গ—

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কলকাতা লালবাজার আই, বি,-তে যেয়ে আমার জীবন রক্ষার জন্য যে নিজেকে নিখোঁজ করে দিয়েছিল, সেই আলিপুর সেন্ট্রাল জেল হাসপাতালের ঝাড়ুদার—

নাথুয়া দোসাদ-এর

স্মরণে

অগ্নিযুগের পথচারী।

লেখক।

পরিচয়

বিশ্বরাজের রাজপথ। সে পথে মানুষ চলে এগিয়ে। পথের আদি কোথায়,—তা নিয়ে পণ্ডিতেরা করেন তর্ক। অন্ত কোথায়,—তা নিয়েও বহু সংশয়। তথাপি এ-পথের পথিক সম্মুখে চলে এগিয়ে। কেন চলে,—জিজ্ঞাসা করলে এক একজন এক এক কথা বলে। সেই বহু কথার মধ্যে একটি কথা প্রায় সকলেই বলে,—বিশ্বরাজের রাজপথ এগিয়ে যাওয়ার জন্যই, পিছু হটার জন্যে নয়। এ-পথে কেউ ছেড়ে আসা স্থানে ফিরে যেতে পারে না, ফেলে আসা কিছু আর খুঁজে পায় না।

এ-পথে মানুষ কেন চলে? বৈজ্ঞানিক বা নাস্তিক বলেন,—চলতে হয় তাই চলে। ধর্মশাস্ত্র বলেন,—সম্মুখে আছে অনন্ত আনন্দ, তাই পাবার আশায় চলে। এই উভয় মতবাদী যে যুক্তি দেখান, তর্কের ধোপে তা টেকে না। তার্কিক বলেন,—কিছুই আমরা জানি না, তথাপি এ-পথে সকলেই চলেছি।

পথের ধারের গৃহগুলি পান্থনিবাস। সে পান্থনিবাস বহুপ্রকার। কোনোটা রাজপ্রাসাদ, কোনোটা বা ভাঙ্গা কুঁড়ে। যে পথিকের যে প্রকার সম্বল, সে সেই প্রকার পান্থনিবাসে যেয়ে ওঠে।

পথের পথিক পান্থশালায় বিশ্রাম করে, ঘুমায়, আবার চলে। শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক একদিন এমন ঘুম ঘুমায়, যে ঘুম হতে আর তাকে জাগতে দেখা যায় না।

সব পথিক পথ চলে একটা ঝোলা নিয়ে। লক্ষ্য করার মত যা কিছু ভাল-মন্দ পথে পায়, কুড়িয়ে রাখে ঝোলায়। ঝোলায় আছে একটি ছিদ্র। সেই ছিদ্র পথে কত কিছু হারিয়ে যায়। পথিক তার ঝোলার ছিদ্রটা মেরামত করতে পারে না। কারণ—ও ছিদ্র মেরামত করা যায় না।

পথিকে পথিকে পরিচয় হয় পথে, পান্থশালায়। পথিক চায় তার অনুকূল পথিককে চিরসাথী করতে, প্রতিকূল পথিককে দূরে সরিয়ে

দিতে। কিন্তু পারে না সে কোনটাই। কেন পারে না? সঠিক উত্তর নেই।

পথের ধারে যেমন নানা আকারের পান্থনিবাস, তেমনি বহু প্রকারের হাট-বাজার। সে হাট-বাজারও সচল। সেই সচল হাট-বাজারে চলমান পথিকেরাই করে বেচা-কেনা, আদান-প্রদান। হাট-বাজারগুলি কিন্তু চমৎকার, এ বিশ্বে এমন কিছু নাই, যা সেখানে বেচা-কেনা হয় না। বাজারের এক অংশে আছে সাহিত্যের হাট। অপরাপর হাটে যা আছে এ হাটেও তা আছে। মহাজন, আড়তদার, দালাল, ফড়ে, যাচনদার, বড় দোকানদার, ছোট দোকানদার, চোর, বাটপার, পকেটমার, কালো বাজার, ভাল মাল, পচা মাল. ভেজাল মাল, চোরাই মাল, সব কিছু আছে। আর আছে এই হাটের বৈশিষ্ট্য,—অপরিচিত নবাগত উৎপাদকের প্রতি অবহেলা। খাস-খদ্দের যারা, তারাও প্রায় সকলেই দালালের কথামত মাল কেনে; মালের ভালমন্দ বিচার করে আড়তদারদের মাইনেভুক্ত যাচনদারদের কথা শুনে।

বিশ্বরাজের রাজপথের এক পথিক পথচারী। তার ছেড়ে আসা পথ ছিল অগ্নিযুগের অগ্নিকুণ্ড ঘেঁষে। সে দেখেছে সে যুগের আগুন নিয়ে নির্ভীক খেলা। আর ঐ আগুনে নিজের 'বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে' সেই আলোকে দেখেছে, তার পথের অপর পাশের সাধারণ সমাজজীবন, অসাধারণ রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজী, অদ্ভুত ধর্মধ্বজী ভণ্ডামী। সেই সাথে সে শুনেছে দূরদর্শী রাজনীতিকদের ভবিষ্যদ্‌বাণী, সান্নিধ্য পেয়েছে খাঁটি দেশসেবীর, দেখেছে প্রকৃত ধার্মিকের আচার-ব্যবহার, স্পর্শ পেয়েছে আন্তরিক ভালবাসা-স্নেহ-শ্রদ্ধার।

পথ চলতে পথচারী যেখানে যা কিছুর সংস্পর্শে এসেছে, তাই কুড়িয়ে ভর্তি করেছে তার স্মৃতির ঝুলি। সে ঝুলির অনেক কিছুই হারিয়ে গিয়েছে বিস্মৃতির ছিদ্রপথে। যেয়ে থুয়েও যা আছে তাই প্রকাশ করে জনসমাজে দেখাবার, জানাবার একটা আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগে পথচারীর বুকে।

বর্তমান জনসমাজ সাহিত্য মারফতেই জানে সব কিছু। এমন কি বক্তার বক্তৃতাও সংবাদ-সাহিত্য অবলম্বনেই প্রচারিত হয়। তাই ১৯৩৩ সাল হতেই পথচারী চেষ্টা করছিল সাহিত্যের হাটে, তার ঝুলির মাল দেখাতে। কিন্তু এ পর্যন্ত সফল হতে পারেনি সে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ কুটুম্ব কেউ নেই তার সাহিত্য হাটে। তারপর না আছে তার 'চাঁদিকা জুতি', না আছে 'বিশুদ্ধ সর্ষপতৈলপূর্ণ ভাণ্ড' তার হাতে।

১৯৩৩ সাল হতে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত পথচারী তার ঝুলির মাল মাঝে মাঝে পাঠাত সাহিত্যহাটের মহাজনদের গদীতে। প্রথম প্রথম মাল হাতে করে নিজেই গদীতে উপস্থিত হত। তাতে দেখা গেল, গদীয়ান মহাজনের দর্শন পাওয়াই এক বড় সমস্যা। যদি বা দর্শন মিলে, পথচারীর হাতের মালটা দেখা তো দূরের কথা, দুটো কথা বলার অবকাশই তাঁদের নেই। এ অবস্থায় পোষ্ট অফিসে রেজেষ্ট্রী পার্শ্বেল যোগে মাল পাঠিয়ে দেখা গেল, পোষ্ট অফিস হতে নিয়ম-মাফিক প্রাপ্তিস্বীকার পত্রে গদীয়ান বা তাঁর কর্মচারীর স্বাক্ষরটুকু ছাড়া, পত্র লিখেও কোনও উত্তর পাওয়া যায় না। তারপর মাল লোপাট হয়ে অন্যের মাল পরিচয়ে বাজারে বেরুতেও দেখা যায়।

হতাশ পথচারী ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চলে পথে। হঠাৎ তার ম্লান মুখ আকর্ষণ করল এক সংসারত্যাগী বৈষ্ণব মহাপুরুষের কৃপাদৃষ্টি। তিনি বললেন,—হতাশ হয়ো না, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। তোমার ঝুলির মাল খাসখদ্দেরের হাতে তুলে দেবার মত করে প্রস্তুত কর। প্রস্তুতমাল নিয়ে সাহিত্যহাটের বাইরে পথে দাঁড়াও। এমন অনেক খদ্দের ও মালউৎপাদক আছেন, যাঁরা দালাল ও যাচনদারদের নিকটে নিজের চোখ-কান জমা রাখেন না। তাঁরা তোমার ঝুলির মাল দেখে শুনে সমাদর করতে পারেন। এর জন্যে আর যা কিছু সাহায্য প্রয়োজন, তা তুমি পাবে।

সেই মহাপুরুষের উপদেশ ও সাহায্যে আজ পথচারী এসে দাঁড়িয়েছে সাহিত্যহাটের বাইরে খোলা পথে।

সাহিত্যহাটে যে সমস্ত মাল সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা বলে

চালু করা হয়, সেগুলিকে জনপ্রিয় করার জন্যে সাহিত্যিক কল্পনার 'মেক-আপ' দিয়ে সাজিয়ে বের করেন। এ প্রথা সেই সুপ্রাচীন কাল হতেই চলে আসছে। পথচারীরও কিছু মেক-আপ্ আছে, তবে সেটা সিনেমা আর্টিষ্টের মেক-আপ্ নয়, সুন্দরী গৃহস্থবধূর মুখে একটু পাউডার মাখার মত।

পথচারী বর্ণিত ঘটনাগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েক-জনের নাম উল্লেখ করা হয়নি। কেন হয়নি তা ঘটনায়ই সুস্পষ্ট। 'পরি-পারু' অধ্যায়ে দাদুর নামটি ছদ্মনাম, আর ঐ ঘটনার স্থানগুলিও ছদ্ম। এতদ্ভিন্ন আর সমস্ত ঘটনার স্থান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম যথাযথ দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় এখনও জীবিত আছেন।

পাঠকবর্গসমীপে বিশেষ অনুরোধ,—কালীশঙ্কর ব্রহ্মচারী ও 'ফেরারী ভূত' সম্পর্কে কেউ যদি কিছু জানেন, তবে পথচারীকে জানালে পথচারী বিশেষ কৃতজ্ঞ হবে।

অগ্নিযুগের পথচারী, যদিও সে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেনি, তথাপি দেখেছে 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনা হীন' বাঙ্গালী তরুণদের। তাদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়েছে,—'যায় যাবে জীবন চলে, বন্দেমাতরম্ ব'লে'।

আজ পথচারী শোনে,—'ইনকিলাব জিন্দাবাদ। আমাদের দাবী মানতে হবে। নইলে গদী ছাড়তে হবে'। এগিয়ে যেয়ে দেখে শোভাযাত্রা চলেছে, তার পুরোভাগে রয়েছে শিশু কোলে নারীর দল, তার পেছনে কতকগুলি উদ্বাস্তু বা কল-কারখানার শ্রমিক, অথবা সরল গ্রাম্য কৃষক। তাদের পরিচালনা করছে গুটিকয়েক ভদ্র বেশধারী তরুণ।

কৌতূহলী পথচারী দিনের পর দিন, মাসের পর মাস খোঁজে সংবাদপত্রের পাতায়, তাদের সেই দাবী কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছেন কিনা। নাঃ, সে দাবী কেউ মেনে নেয়নি। তারপর খোঁজে শ্লোগানওয়ালারা কাউকে গদী ছাড়িয়েছে কিনা। নাঃ, কেউ গদী ছাড়েনি, গদীয়ানগোষ্ঠী

খোসমেজাজে বহালতবিয়তে যথাপূর্বং তথাপরং তাঁদের গদীতে সমাসীন আছেন। এতবড় জোর শ্লোগানে তাঁদের কেশাগ্রও কম্পিত হয়নি। পথচারী ভাবে,—তবে এ শ্লোগানের অর্থ কি! এ শোভাযাত্রা কাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ?

পথচারী বিস্মিত হয় যখন সে শোনে,—ঐ শ্লোগানওয়ালা তরুণদের নেতৃদলে আছেন অগ্নিযুগের আগুনে ঝলসানো দু-একজন কর্মী। সে আরো বিস্মিত হয় যখন দেখে,—সে যুগের কোনও আধপোড়া শালকাঠ এ যুগের স্বার্থপর ধাপ্পাবাজদের জয়ঢাকের কাঠি হয়ে দিব্বি আরামে বসে 'ঝাঁ গুড়্ গুড়্ ঝাঁ।' বাজাচ্ছেন। অথবা স্বার্থের বালুচরে বেদের হাতে হাওয়াই লাড্ডু দেখে চমৎকার ভালুক-নাচ নাচছেন।

বিশ্বরাজের রাজপথ। এ-পথে পথিক যা ফেলে যায়, তা আর পায় না। অবহেলায় যে সুযোগ হারিয়ে যায় সে সুযোগ আর আসে না। অগ্নিযুগ চলে গিয়েছে, সে আর ফিরবে না। সে যুগের অগ্নিহোতৃ তরুণেরা যে পরিবেশ, যে সুযোগ সৃষ্টি করেছিল, আপাত-স্বার্থের মোহে তা হারিযে গিয়েছে, ঐ প্রকার সুযোগ আর আসবে না।

স্বাধীনতালাভের পূর্বমুহূর্তে ভারতের দুর্ভাগ্য নিবিয়ে দিয়েছে অগ্নিযুগের শেষ শিখাটি। স্বাধীনতালাভের পরমুহূর্তে তুষার চাপে শেষ হয়েছে শেষ উত্তাপটুকু। স্বাধীনতা এনেছে এক অভূতপূর্ব বন্যা। সে বন্যায় ভেসে উঠেছে গত সাত শতাব্দীর পরাধীনতার্ ক্লেদ-আবর্জনা। আবর্জনা-দূষিত জলের মধ্যে বসে তৃষ্ণার্ত মানুষ জলের জন্যে হাহাকার করছে। আবর্জনা ছড়াচ্ছে বিষাক্ত বীজাণু। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা হয়েছে বিপন্ন। আর্ত মানুষ একটু নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় ছুটেছে দিকে দিকে। দেখে শুনে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় পথচারী তার ঝুলিটি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে সাহিত্যহাটের পথে।

ইতিহাস শিক্ষা দিয়েছে পথচারীকে,—যে বন্যা ফুলগাছ ডুবিয়ে ভাসিয়ে তোলে আস্তাকুঁড়ের আবর্জনা, সেই বন্যার স্রোতই টেনে নিয়ে

যায় ঐ বিষাক্ত আবর্জনা লোকচক্ষুর অন্তরালে, তারপর ভূমি করে উর্বর। স্রোতের টানেও যে জঞ্জাল সরে যায় না সেগুলো দূর করতে এগিয়ে আসে নির্ভীক তরুণ-তরুণীর সবল হাত। সেই দৃঢ়-সঙ্কল্প তরুণ-তরুণীদের 'ঝড়-বাদলে আঁধার রাতে' 'পায়ের তলে মূর্ছে তুফান, উর্ধ্বে বিমান ঝড়-বাদল'। তাদের বুদ্ধি কোনও বিদেশী 'ইজিম্'-এর ধার ধারে না, বা তারা কোনও ইজিম্-ধুরন্ধরের চরণতলে পরামর্শ নিতেও ছোটে না। তাদের পূর্বপুরুষের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস যোগায় প্রেরণা। তাদের নিজস্ব বুদ্ধি উদ্ভাবন করে কার্যোদ্ধারের পন্থা। জাতীয় সাহিত্য পরিচয় করিয়ে দেয় তাদের স্থান-কাল-পাত্রের সাথে।

পথচারী তার পিছনে ফেলে আসা যুগের স্মৃতি নিয়ে এ যুগে পথ চলতে যখন শোনে,—'এর চাইতে ইংরেজ রাজত্বই ভাল ছিল,' তখন দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে ভাবে,—এরই জন্যেই কি সে যুগের তরুণেরা হাসিমুখে ফাঁসিকাঠে ঝুলেছিল! এর জন্যেই কি তারা কালাপানির ওপারে নির্জন কারাবাসে তিলে তিলে জীবন ক্ষয় করেছে!! এর জন্যেই কি তাদের অনেকে ফেরার হয়ে নিখোঁজ হয়ে গেল!!! তবে তো তাদের কর্তব্য শেষ হয়নি। সে কর্তব্য সম্পাদন করার মত তরুণ-তরুণীদল আজ কোথায়?

পথচারীর পথ চলা শেষ হয়ে আসছে। নির্দিষ্ট পথ সীমার অবশিষ্টটুকু চলতে চলতে রেখে যেতে চায় সে তার চলার পথের স্মৃতিকথা। কারণ তার আশা,—অতর্কিত বিপদ-বিহ্বল বাঙ্গালী আবার মাথা তুলবে। আবার দেখা দেবে নির্ভীক দৃঢ়সঙ্কল্প বাস্তবকর্মী বাঙ্গালী তরুণ-তরুণীদল। তারা দৃঢ়কণ্ঠে গাইবে—'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার আমার দেশ। * * আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা, নহি তো মেষ'। সারা ভারতে বজ্র নির্ঘোষে ধ্বনিত হবে বন্দনা ধ্বনি—বন্দেমাতরম্।

ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

১৩৷১ যুগীপাড়া বাই লেন,
কলিকাতা-৬

ফেরারী ভূত

ইংরেজী ১৯২০। জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ।

থাকি কলকাতার এক মেসে। তখনকার দিনে বোমারু বিপ্লবীরা এই মেসটা বেশ চিনতেন। পরে কলকাতা পুলিসেরও সুপরিচিত হয়ে ওঠে। এই চেনা পরিচয়ের মূলে মেসটার যে কৃতিত্ব ছিল তা একটা ঘটনা হতেই বুঝা যাবে।

কলেজ খুলেছে। মেসেব কলেজী পাখি যে ক'টি সব ফিরেছে। বাড়ির গন্ধ তখনও গা থেকে যায়নি। বাড়ির চিড়ে মুড়কী, নারকেল-নাড়ু তখনও অনেকের কলেজ-ফিরতি পয়সা বাঁচাচ্ছে। এমনি একটা দিন।

সকাল হতেই বৃষ্টি চলছে, টিপ্ টিপুনি লেগেই আছে, মাঝে মাঝে মুষলধারেও চলে। অফিস, কলেজ হতে ফিরে বাদল-সন্ধ্যায় আসর বেশ জমাট। মেসটা বড় মেস। বিভিন্ন ঘরে বিভিন্ন রুচির আসর বসেছে। আমাদেরটা ছিল গল্পের আসর।

সেদিন পৃথিবীদেবী তাঁর বাদল-সন্ধ্যা-শাড়ির ঘোমটা একটু আগেই টেনেছেন। জমাট আসরে আলোর সুইচ আর টেপা হয়নি। জানালার সার্সির ভিতর দিয়ে রাস্তার আলো যতটুক পাওয়া যায় গল্পের আসরে তাই যথেষ্ট।

সে আসরে সেদিন সার্বজনীন মুখরোচক ও শ্রবণ-সুখকর ভূতুড়ে গল্প হচ্ছিল কিনা তা আর এখন মনে নেই। তবে ভূতের মতই একজন অপরিচিত এসে দাঁড়ালেন আমাদের দরজায় সেই আলো-আঁধারে।

নবাগতের সর্বাঙ্গ ভেজা, কাদামাখা। পরনে ধুতি, গায়ে আস্তিনগুটান শার্ট, পায়ে জুতো নেই। বয়স বাইশ-বত্রিশের মধ্যে যে কোনও সংখ্যা অনুমান করা যায়। সকলেই তাকিয়ে আছি তাঁর দিকে।

আগন্তুক সতর্ক দৃষ্টিতে আমাদের দেখে নিয়ে ঘরে ঢুকে আলোর সুইচ টিপে দিলেন। তারপর তাঁর জামার তল হতে একটা চামড়ার

ভারী কেস খুলে তাকের ওপর রেখে আমাদেরই একখানা কাপড় নিয়ে ভিজে জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে বললেন,—সদর দরজাটা ভাল রকম বন্ধ করা দরকার, কুত্তা আসতে পারে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পেটে কিছু পড়েনি, ট্যাঁকেও পয়সা নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুটো কিছু খেয়ে খসে পড়তে হবে। শেষরাত্রে ঢাকা মেলের চেন টেনে দমদমের মাঠে নেমেছি। সারাদিন এক পুঁইক্ষেতে পড়ে ছিলাম বৃষ্টিটা মাথার ওপর দিয়েই গেছে।

মজবুত দুটো কাঠ আর শিকল দিয়ে সদর দরজা বন্ধ করা হল। গজানন্দ ঠাকুর দুটো উনুনে আলুসিদ্ধ ভাত আর মুশুরীর ডাল চাপিয়ে দিল। কিন্তু সে ভাত আর নামানো গেল না। পুলিস এসে পড়ল।

সদর দরজায় প্রথম কড়া নাড়া, শেষে গুঁতোগুঁতি আরম্ভ হয়ে গেল। দরজাটা ছিল খুব মজবুত, অল্প সময়ে ভাঙ্গতে হলে বুলডজার দরকার। সেকালে কলকাতা-পুলিসের বুলডজার ছিল না।

এদিকে কি করা যায়? ঠাকুর জানাল, আর দশ মিনিটে ভাত নামিয়ে পাঁচ মিনিটে খাইয়ে দিতে পারে। কিন্তু সে সময় তো আর নেই। এখন একটি মিনিটও যে মূল্যবান!

যাঁর চিন্তায় আমরা ব্যস্ত তিনি কিন্তু নির্বিকার চিত্তে আমাদের একজনের কৌটা খুলে শুখনো চিড়ে মুট মুট গিলতে আরম্ভ করেছেন। ওঃ রে বাপ্‌রেঃ, সে কি গেলার গেলা!! আমরা ওরকম গিলতে গেলে গলায় বেধে মরেই যেতাম। কিন্তু এরা তো আর আমাদের মত নয়! এরা যে বাংলা মায়ের শ্যামল বুকের দামাল ছেলে, বহু শতাব্দীর শত অপমানের তীব্র দাহক।

কয়েক মিনিটের মধ্যে আধ সের চিড়ে আর আধ কুঁজো জল গিলে ফেলে বললেন,—ভাই, এইবার আমি জলের ট্যাঙ্কের ওপর দিয়ে প্রাচীর পার হয়ে ঐ কানা গলিটায় নেমে যাব। একটা ছেঁড়া ছুটো শুখনো জামা, কয়েকখানা খবরের কাগজ, আর ঐ রেলবাবুর টুপিটা চাই। খবরের কাগজ গায় জড়িয়ে টুপিটা মাথায় দিয়ে গেলে, এই বৃষ্টির মধ্যে মোড়ের কনষ্টেবলটাকে ফাঁকি দিতে পারব।

রমেনবাবু নামে এক রেলওয়ে টিকিট কলেক্টর আমাদের ঘরেই থাকতেন। ভদ্রলোক বেশ একটু কৃপণ। দু-বছর চাকরি করছেন কিন্তু ছাতা কেনেন না। আমাদের ছাতা দিয়েই প্রয়োজন মত কাজ চালিয়ে নেন। সেবার সকলে মিলে নন-কো-অপারেশনের হুমকি দেওয়ায় মাত্র ক'দিন পূর্বে দশ টাকা দিয়ে একটা ডাকব্যাক ওয়াটারপ্রুফ কিনে এনেছিলেন। কৃপণ রমেনবাবু নিজহাতে সেই ওয়াটারপ্রুফটা ফেরারী ভূতের গায়ে পড়িয়ে দিয়ে টুপিটা মাথায় এঁটে দিলেন।

কলেজের ছাত্র নরেন পূজো পর্যন্ত খরচ চালানর জন্যে টাকা এনেছিল, তা থেকে পঞ্চাশ টাকা এনে দিল। ফেরারী মাত্র দশটি টাকা নিলেন।

উড়িয়া গজানন্দ ঠাকুর রথযাত্রায় পুরী গিয়েছিল। সেখান হতে কিছু মিষ্টান্ন প্রসাদ এনেছিল। উদ্দেশ্য,—দুপুরে মেসে যখন কাজ থাকে না তখন পাড়ায় পাড়ায় মেয়ে মহলে প্রসাদ বিতরণ করে প্রণামী সংগ্রহ করা। সে তার সেই মূলধন প্রসাদের পোঁটলা ফেরারীর হাতে দিয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল,—বাবু, আমি তোমাকে রাঁধাভাত খাওয়াতে পারলাম না, এ আমার বড় দুঃখ। এই প্রভু জগন্নাথের প্রসাদ। এ প্রসাদ সাথে রেখে রোজ ভক্তি করে একটু খেও। প্রভু জগন্নাথ তোমার মঙ্গল করবেন।

বিপ্লবী ফেরারী হাতজোড় করে প্রণাম জানিয়ে দু-হাত পেতে প্রসাদ নিয়ে মাথায় ছোঁয়ালেন। তারপর তাঁকে নামিয়ে দেওয়া হল সেই কানা গলিতে। ভাগ্যক্রমে তখন জোর বাতাস আর ফিস্ ফিস্ বৃষ্টি চলছিল।

এরপরে সদর দরজা খোলা হল। ভিতরে ঢুকেই দুজন কনষ্টেবল আর দুজন অফিসার মেজাজ দেখাতে আরম্ভ করলেন। দেখাবেন নাই বা কেন? ব্রিটিশসাম্রাজ্য-স্টীল-ফ্রেমের আটটি নাট-বল্টু আমাদের মেসের বন্ধদরজার বাইরে দাঁড়িয়ে অন্তত পনরো মিনিট হাঁকাহাঁকি গুঁতোগুঁতি করে বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়েছেন। এটা কি একটা সাধারণ কথা !!

আমাদের একজন উত্তর দিলেন,—মশাই, যে রকম বৃষ্টি আর বাতাস চলছে তাতে ঘরে বসে বাইরের বুলডগের ডাক শোনা যায় না, তা রাস্তায় আপনাদের ডাক শুনবো কি করে?

আরম্ভ হল জিজ্ঞাসাবাদের পালা।—এইরকম একটা লোক এসেছে কিনা, ইত্যাদি। আমাদের সকলেরই এক উত্তর,—নাঃ, দেখিনি, জানিনে।

তারপর চলল দ্বিতীয় পালা—খানাতল্লাসী। আমাদের ঘরে সেই ভিজে জামাকাপড় পড়ে ছিল। একজন 'এই যে তার জামাকাপড়' বলে হাতে তুলে নিলেন। সাথে সাথেই উত্তর হল,—আমি খেলা দেখতে মাঠে গিয়াছিলাম। তাই বৃষ্টিতে ভিজে জামাকাপড় ছেড়ে রেখেছি, কাল ধুতে দেব।

তাতেও রেহাই নেই। অফিসার উত্তরদাতার অন্য কাপড় চেয়ে নিয়ে ধোপার দাগ মিলিয়ে দেখে বললেন,—কই, দুই দাগে তো মিল নেই?

উত্তর হল,—আমি যে ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিলাম। দেশের দাগ আর কলকাতার দাগ তো পৃথক হবেই।

এ উত্তর পাওয়ার পর কাপড় ছেড়ে দিয়ে প্রতিঘর, ঘরের কোণ, এমন কি বড় টিনবাক্স পর্যন্ত খুলে তল্লাসী চালিয়ে নাচে জলের ট্যাঙ্কের কাছে এসে একজন চেঁচিয়ে উঠলেন.—এই যে, এই পথ দিয়ে পালিয়েছে, এই যে শেওলা ভাঙ্গা।

চোদ্দ-পনরো বছর বয়সের চাকর নিতাই বলল,—সত্যবাবুর কাপড় তারে বেধেছিল, সারাদিন বৃষ্টির জন্য ছাড়াতে পারিনি। এদিকে রাত হয়ে যায়। তাই এই এখুনি অতি কষ্টে দেওয়ালে উঠে কাপড় ছাড়িয়েছি। ও শেওলা আমার পায়ে ভেঙ্গেছে।

দু-ঘণ্টা ধরে খোঁজাখুঁজি করে পুলিশ চলে গেলে আমরা সকলে চাঁদা তুলে নিতাইকে বক্‌শিশ দিয়েছিলাম। রাত্রে খেতে বসে কৃপণ রমেনবাবুর ওয়াটারপ্রুফের কথা উঠলে তিনি বললেন,—আমার তো ভাই, তোমাদের ছাতা দিয়েই দিব্বি চলে যাচ্ছিল। তোমরাই জবরদস্তি করে ওয়াটারপ্রুফটা কেনালে। এখন বুঝলে তো,—

তোমাদের ছাতাগুলোর ওপরে আমার ঈশ্বরপ্রদত্ত অধিকার। তোমরা 'না' করলে চলবে কেন!

টুপিটার জন্যেও রমেনবাবু দু-টাকা দণ্ড দিয়ে উপরওয়ালার ধমক খেয়েছিলেন।

এর কিছুদিন পরেই মেসের দু-জন সরকারী অতিথিশালায় চলে গেলেন। তাঁদের ফিরতে দেখা আর আমার ভাগ্যে ঘটেনি। দু-মাস পরে লালবাজার রাজবাড়িতে আমার নিমন্ত্রণ হল।

আমার চাকরি

সেপ্টেম্বর মাসের এক শুভ প্রভাতে আমার নিমন্ত্রণপত্র হাতে উপস্থিত হলেন সেই পূর্বপরিচিত একজন পুলিস অফিসার ও দুজন কনষ্টেবল। তাঁদের সাথে গেলাম লাল বাজারের রাজবাড়ি। আমার আদর অভ্যর্থনা করলেন যিনি, তাঁর নাম নছিরুদ্দিন সাহেব; বেশ মিষ্টভাষী অমায়িক ভদ্রলোক। আলাপের প্রথমেই আমি সকালে চা, জলখাবার খেয়ে আসতে পারিনি শুনে আমার সাথী পুলিস অফিসার-টিকে বেশ ধমকে দিয়ে আমার নিকটে ক্ষমা চাইলেন। একজন কনষ্টেবল পাঠিয়ে দু'খানা সিঙ্গাড়া, দু'খানা কচুরি, দুটো বড় সন্দেশ, দুটো বড় রসগোল্লা একেবারে একপ্লেট ভরতি খাবার আর চা আনিয়ে পরম আদরে খাওয়ালেন। খেয়েদেয়ে যখন সুস্থ হলাম, তখন ঘরের সমস্ত লোক সরিয়ে দিয়ে, আমার ভবিষ্যৎ চাকরি বাকরি ও উন্নতির জন্যে কি করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন।

আমার আর্থিক দুরবস্থার কথা সাহেব ভাল করেই জানেন। সে জন্যে আমার প্রতি তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করে কখন কি উপায়ে এই দুর্গতি হতে উদ্ধার পেতে পারি সে বিষয়ে কিছু সৎপরামর্শ দেবার জন্যেই যে লালবাজারে ডেকে এনেছেন তা বেশ করে বুঝিয়ে বললেন।

সাধারণভাবে পুলিস বিভাগে ভাল চাকরিতে ঢোকা ও পদোন্নতি হওয়া সহজ নয়। কিন্তু তিনি আমার মত ভাল সদ্বংশের শিক্ষিত সচ্চরিত্র ছেলেকে পুলিস বিভাগে ঢুকিয়ে নিয়ে তিন বছরে পুলিস ইনস্পেক্টর করে দেবেন। তবে কিনা আমার দিক থেকে রাজভক্ত প্রজার অবশ্য কর্তব্য একটা কিছু করে একটু যোগ্যতা দেখানো প্রয়োজন। সেটাও এমন কিছু কঠিন কাজ নয়,—এই কয়েকজন সাংঘাতিক বোমা পিস্তলওয়ালা খুনে ডাকাত ধরার মত সংবাদ যা আমি জানি, তাই তাঁকে বললেই হবে। তারপর ঐ ক'জন ধরা পড়লেই আমার উন্নতির পথ একেবারে ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার হয়ে যাবে। চাই কি, কালে পূর্ণ লাহিড়ী মশায়ের মত ডেপুটি কমিশনারের পদও তো আমাদের মত বুদ্ধিমান রাজভক্ত পুলিস অফিসারদের জন্যে পাকা আমের মত ঝুলছে। যদি একবার পেয়ে যাই তবে কি স্ফূর্তি! কি আরাম!!

দুদিন ধরে বুঝিয়ে শেষে নছিরুদ্দিন সাহেব একেবারে হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন। আমার দুর্বুদ্ধির শত দোষ দিয়ে, ভবিষ্যতে সুবুদ্ধি উদয়ের আশায় সেবারের মত বিদায় দিলেন। দু'দিন পরে মেসে ফিরলাম।

তিনদিন পরে টেলিগ্রাম পেলাম,—মা'র ভয়ানক অসুখ। বাড়ি যেতে হবে। বাড়ি যেয়ে দেখলাম, মা অত্যন্ত অসুস্থই বটে, তবে সেটা শারীরিক নয়, মানসিক। আমাকে পুলিসে ধরেছে সংবাদ পেয়ে পুলিস ছাড়ানর ব্যবস্থাও স্থির করা হয়েছে। আমার এক ভগ্নীপতি আসামে নামকরা পুলিস ইনস্পেক্টর। তিনি ছুটিতে বাড়ি এসেছেন। তাঁর সাথে গেলে সাহেব কোম্পানির চা বাগানে চাকরি হবে। সাহেবদের হেফাজতে থাকলে পুলিসে ধরার ভয় কম।

মার কথায় বাধ্য হয়ে গেলাম ভগ্নীপতির সাথে। চাকরিও পেয়ে গেলাম বাঁশবাড়ি চা-বাগানে। বাগানে পৌঁছে আমার কাজ বুঝে নিলাম। কাজ হচ্ছে,—কুলীরা চা-পাতা তুলে আনলে সেগুলো ওজন করে নামে নামে লিখে নেওয়া।

কুলীরা যে চা-পাতা তুলে আনে, তা তাদের ঝুড়ি সমেত মাপা হয়। ঝুড়ির ওজন বাদ দেবার জন্যে দাঁড়ির যে দিকে বাটখারা থাকে সেই দিকে আর একটা ঝুড়ি থাকে। এই ঝুড়িটার ওজন কুলীদের ঝুড়ির প্রায় দ্বিগুণ। কুলীদের ঝুড়িগুলোও কোম্পানির ঝুড়ি।

এই ওজনের মারপ্যাঁচে প্রতিদিন কুলীদের আট-দশ-পয়সা মজুরি ফাঁকি দেওয়া হয়। যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে একটা কুলীকে রোজ আট দশ পয়সা ফাঁকি দেওয়া বড় সহজ কথা নয়। সেকালে চা-বাগানের একটা কুলী দৈনিক চার আনা থেকে ছ-আনা মজুরি পেত। বাজারে চালের দাম সাড়ে তিন টাকা থেকে পাঁচ টাকার মধ্যে ওঠা নামা করত। সরষের তেল পাঁচ আনা ছয় আনা সের, চিনি ছিল চার আনা সের। কণ্ট্রোল, রেশন কার্ড, ব্ল্যাক মার্কেট, কথাগুলো তখন কেউ শোনেনি। বোধহয় ইংরেজী, বাংলা অভিধানেও ও শব্দ-গুলো ছিল না, আর থাকলেও বর্তমান তাৎপর্যে নিশ্চয়ই ছিল না।

এই ওজনের ফাঁকি-বাজী বুঝতে পেরে, সেই রাক্ষুসে ঝুড়িটা সরিয়ে কুলীদের ঝুড়ির সমান ওজনের একটা ঝুড়ি ওজনে চাপিয়ে চা-পাতা মাপা আরম্ভ করলাম। ব্যাপারটা কুলীদের বুঝিয়ে দিতেই তারা ভারী খুশি। মজুরিও বেশী পেতে লাগল।

কথাটা ক্রমে সাহেব ম্যানেজারের কানে গেলে আফিসে আমার ডাক পড়ল। মিনিট দুই কথা কাটাকাটির পর ইংরেজ ম্যানেজার অতি ইতর ভাষায় বাপ-মা তুলে দিল গালাগালি। পাশেই বড়বাবুর টেবিলের ওপর ছিল একটা বড় কাঠের রুল। রুলটা একবার ব্যবহার করতেই সাহেব গড়িয়ে পড়লেন টেবিলের তলে। অফিস ঘর থেকে বেরুতেই চাপরাশীটা ধরতে এল। আর একবার রুলটা চালাতেই 'ইয়া আল্লা' বলে সেটাও মাটি নিল। নিকটেই অফিস-পিওনের সাইকেল ছিল। সাইকেলে এক ঘণ্টায় বড়পেটারোড স্টেশনে পৌঁছে গেলাম।

এক চায়ের দোকানে দশ টাকায় সাইকেলটা বন্ধক থাকল। স্টেশনে যেয়ে দেখি লালমনির হাট প্যাসেঞ্জার ছেড়ে যাচ্ছে। চলতি

গাড়িতে উঠে পড়লাম। টিকিট করা হল না। পথে আর টিকিট করলামও না। তিনটে সিকি খরচ করে পাংসা পৌঁছে গেলাম।

মা সমস্ত শুনে ভয় পেয়ে মুরারীবাবুকে পত্র দিলেন। প্রায় একমাস পরে উত্তর পাওয়া গেল। ম্যানেজার সাহেব মাথায় ফ্যাটা বেঁধে দিন পনরো নিজের বাংলোয় পড়ে ছিলেন, কোথাও বের হননি, বা পুলিসে ডায়রী করেননি। অফিসে বসে নেটিভের হাতে মার খাওয়া সাহেব সমাজে দারুণ লজ্জার কথা।

কুলীরা ঝুড়ি আন্দোলন আরম্ভ করেছে। সে আন্দোলন দ্রুত বেগে বাগানে বাগানে ছড়িয়ে পড়ছে। আন্দোলন দমন করতে পুলিস হিমসিম খাচ্ছে। চা-কোম্পানিগুলো তাদের ফাঁকিবাজী ঢাকার জন্যে বাইরে আন্দোলনটার অন্য রূপ দিচ্ছে। মুরারীবাবু দরং হতে শিবসাগর বদলী হয়েছেন।

এই হল চা-বাগানের ইতিহাসে বিখ্যাত ঝুড়ি-আন্দোলনের গোড়ার কথা। এই সময়ে চা-বাগানের কুলীদের স্বার্থরক্ষার জন্যে কোনও প্রতিষ্ঠান ছিল না। যা কিছু ছিল তাতে বাগানের কর্তৃপক্ষই কর্তৃত্ব ক'রতেন।

মাকে অনেক কষ্টে বুঝিয়ে পূজোর ছুটি শেষ হলে আবার কলকাতা যেয়ে কলেজে ভর্তি হলাম।

গোয়ালন্দ ঘাটে

১৯২১ সালে গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি যেয়ে শুনলাম আমাদের সম্পত্তি নিয়ে হাইকোর্টে যে মামলা চলছিল তাতে আমরা হেরেছি। এ হারা মানে একেবারে পথে বসা। মনের অবস্থা খুবই খারাপ। একদিন দেখা করতে গেলাম ইয়াকুব আলী চৌধুরী সাহেবের সাথে। চৌধুরী সাহেব ছিলেন পাংসা হাইস্কুলের একজন শিক্ষক, আমাকে বিশেষ স্নেহ

করতেন। আমার ছেলেবেলায় তিনি তাঁর লেখা 'নূরনবী' বই একখানা জন্মদিনের উপহার দিয়েছিলেন।

তৎকালে চৌধুরী সাহেব মাষ্টারী ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট প্রচারক হয়েছেন। চৌধুরী সাহেব ছিলেন একজন উঁচুদরের বক্তা।

ইয়াকুব আলী চৌধুরীর বড় ভাই রওসন আলী চৌধুরী সাহেবও কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি যশোর জেলায় এক সভায় মানুষ ক্ষেপানো বক্তৃতা করে ধরা পড়েন। বিচারে দু'মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। গোটা পঞ্চাশেক ফুলের মালা গলায় আর হাতে পরে, হরিসংকীর্তন বন্দেমাতরম্‌, আল্লা হো আকবর, বড় চৌধুরী সাহেব কি জয়, ধ্বনি দিতে দিতে বিরাট মিছিল করে জেলযাত্রা করেন। তারপর যশোর জেলে দিন সাতেক টিনের শান্‌কীতে লপ্‌সী ব্রেকফাস্ট খেয়ে বুঝে ফেললেন যে, কংগ্রেসী আন্দোলন ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়, তথা ইসলামের পক্ষে বিপজ্জনক। কংগ্রেসী হিন্দু ও গান্ধীর আসল মতলব,—মুসলমানদের পরম বন্ধু ইংরেজদের তাড়িয়ে দিয়ে ভারতে হিন্দুরাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে ভারতীয় মুসলমান ও ইসলাম ধ্বংস করা। অতএব যেহেতু তিনি খাঁটি মুসলমান, সেহেতু নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে, ইসলামের বন্ধু ইংরেজ সরকারের নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করে বণ্ড লিখে দিয়ে, জেল হতে বেরিয়ে এসেছেন।

জেল হতে বেরিয়ে এসে বড় চৌধুরী সাহেব সরকারী সাহায্যে নানাস্থানে সভাসমিতি করে বক্তৃতা করছেন,—মুসলমান ভাইবেরাদার-দের ঘটে যদি সামান্য কিছু বুদ্ধিও থাকে তবে এই ধাপ্পাবাজ গান্ধীর কথায় কান দিয়ে, হিন্দু কংগ্রেসীদের সাথে মিশে, এদেশ হতে ইংরেজ তাড়িয়ে দিয়ে, মুসলমান ও ইসলামের সাড়ে সর্বনাশ যেন কেউ না করেন।

প্রথম প্রথম সভায় বক্তৃতার সময় রওসন আলী চৌধুরী সাহেবের আশেপাশে দুচারখানা ছেঁড়া জুতো, ভাঙ্গা খড়ম এসে পড়ত। কিছুদিন পরে আর পড়ত না। মুসলমান ভাইরা কান পেতে বড় চৌধুরী

সাহেবের বক্তৃতা শুনতো। তবে তখনও ঐ শ্রেণীর বক্তৃতায় 'মারহাব্বা' পড়তে আরম্ভ করেনি। বড় চৌধুরী সাহেবের সাথে আমার মাষ্টার ছোট চৌধুরী সাহেবের মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

মাষ্টার সাহেবের মুখে বড় চৌধুরী সাহেবের কার্যকলাপ শুনে একটু চিন্তিত হলাম। কারণ এর পূর্বে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে শুনেছিলাম বিপিন পাল মশায়ের বক্তৃতা। সে বক্তৃতায় তিনি কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে মুসলমানদের ধর্মীয় খেলাফৎ আন্দোলনের গাঁটছড়া বাঁধার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

দেখলাম মাষ্টার সাহেব আমার বৈষয়িক বিপর্যয়ের সংবাদ পূর্বেই পেয়েছেন। আমার মানসিক অবস্থা বুঝে সান্ত্বনা দিয়ে পরামর্শ দিলেন, —কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার হয়ে গোয়ালন্দ ঘাটে কিছুদিন থাকলে, নানা কাজের মধ্যে ডুবে, মন সুস্থ হয়ে যাবে। বাড়িতে এসে মাকে কথাটা বললাম। তিনি হ্যাঁ, কি না, কিছুই বললেন না। স্ত্রীকে বলতে সে যেতেই পরামর্শ দিল। পরদিন পাংসা কংগ্রেস অফিসে নাম লিখিয়ে কংগ্রেস ভলান্টিয়ারের ব্যাজ গলায় ঝুলিয়ে গোয়ালন্দ গেলাম।

গোয়ালন্দ ঘাট সম্বন্ধে আমার ছেলেবেলা থেকেই একটা আকর্ষণ ছিল। প্রভাতে গোয়ালন্দ ঘাটে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে বাংলার যে রূপ দেখেছি তা ভাষায় বর্ণনা করার সামর্থ্য আমার নেই। সম্মুখে বিরাট নদী। নদীর ওপারে ঈষৎ কুয়াশা ঢাকা গ্রামের ওপর দিয়ে চলেছে সূর্যোদয়ের আলোকোৎসব। নদীর বুকে অসংখ্য ছোট বড় নৌকা রং বেরঙের পাল উড়িয়ে চলেছে। এপাড়ে ষ্টীমারগুলো ছাড়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ঘন কালো ধোঁয়া ছাড়ছে। ঢাকা মেলট্রেন এসে থামার সাথে সাথে ঘরমুখো যাত্রী ছুটেছে ষ্টীমারে কে কার আগে জায়গা দখল করবে। তাদের সাথে কত রকমারী গৃহস্থালীর জিনিষ। নানা প্রকার ঢঙে নানাপ্রকার রঙের শাড়িপরা মেয়েরা চলতো কত কথা বলতে বলতে। কি সে আনন্দ, কি সে উদ্দীপনা বাড়ি ফেরার।

১৯৫৬ সালে আশ্বিন মাসে পূজোর ষষ্ঠীর প্রভাতে আর একবার দাঁড়িয়ে ছিলাম গোয়ালন্দ ঘাটে। দেখলাম বারোয়ারি পূজামণ্ডপে

পূজো শেষ হয়ে প্রতিমা বিসর্জন হয়ে গেছে। পড়ে আছে শুধু তার অতীত গৌরবের স্মৃতি। সে স্মৃতিতে ভবিষ্যতের আশা নেই, আছে শুধু হতাশার হাহাকার।

সেই ১৯২১ সালের মে মাসের শেষে যখন আমি কংগ্রেস ভলান্টিয়ার হয়ে গোয়ালন্দ যাই, তখন আই, জি, এন্ ও আর, এস্, এন্ ষ্টীমার কোম্পানিতে ধর্মঘট চলছিল। প্রায় পঞ্চাশখানা বড় বড় ষ্টীমার ধর্মঘট করে গোয়ালন্দ ঘাটে মাঝ নদীতে নোঙ্গর ফেলেছে। কয়েক হাজার চাটগেঁয়ে খালাসী আর পশ্চিমে কুলী বেকারানন্দে সর্বত্র হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছে।

ধর্মঘটের কারণ,—লর্ড সিংহের পুত্র ম্যাজিষ্ট্রেট সুশীল সিংহ চাঁদপুর ষ্টীমার ঘাটে অনেকগুলো ঘরমুখো চা-বাগানের কুলী গুলি চালিয়ে মেরেছেন। এই কুলীদের ঘরমুখো হওয়ার মূলে নাকি সেই ঝুড়ি আন্দোলন। স্বামী বিশ্বানন্দ ও বসন্ত মজুমদার মশাই গোয়ালন্দ ঘাটে ধর্মঘট পরিচালনা করছেন। মধ্যে মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি বড় বড় নেতারাও দেখতে আসেন।

ঘাটে পৌঁছে দু-দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম করার মত কাজ কিছুই নেই। সকালে বিকালে মিছিল করে মাইল চারেক হাঁটতে হয়। সে সময়ে যার গলায় যত জোর আছে, তা খাটিয়ে আল্লাহো আকবর, বন্দেমাতরম্, গান্ধীজীকি জয়, আলী ভাই কি জয়,—বলে ধ্বনি দিতে হয়। সেকালে পথের ধারের জনসাধারণের কানের তালা ফাটানোর জন্যে গলার জোরই খাটাতে হত। চোঙা বা মাইক তখনও আসরে নামেনি। ওগুলো বোধহয় 'ইনকেলাব জিন্দাবাদ (?)' এর সাথে আমদানী মাল।

এক সহকর্মীর মুখে শুনলাম মাঝে মাঝে চাঁদা আদায় করতে যেতে হয়। চাঁদা প্রায় সকলেই দেয় বটে তবে তার পরিমাণ বিশেষ কিছু নয়। খরচপত্র কংগ্রেস ফাণ্ড হতেই চলে। গোয়ালন্দঘাটের অবাঙ্গালী ব্যবসাদারেরা স্বেচ্ছায় প্রচুর টাকা কংগ্রেস ফাণ্ডে দিয়ে থাকেন। তবে সে টাকা স্থানীয় ফাণ্ডে দেন না, সরাসরি কংগ্রেসের

উপরতলায় পাঠিয়ে দেন। কথাটা শুনে তখন বিস্মিত হয়েছিলাম। এখন স্বাধীনতা পাওয়ার পর বুঝেছি, এই সমস্ত দূরদর্শী ব্যবসায়ীরা কেন এত টাকা কংগ্রেস ফাণ্ডে ইনভেস্ট করেছিলেন।

একটা ব্যাপার দেখে মনে বড় বিতৃষ্ণা এল। গোয়ালন্দঘাট ও আশেপাশের বাজারের অনেকগুলো অল্পবয়সী বেশ্যা ভলান্টিয়ার হয়ে স্কুল-কলেজের ছাত্র ভলান্টিয়ারদের সাথে অবাধে মেলামেশা করছে। কদিনের মধ্যেই বুঝলাম রেল-সাইডিং-এর প্যাসেঞ্জার গাড়িগুলো সন্ধ্যার পর নিরাপদ নয়। দেখে শুনে পাঁচদিনের মধ্যেই মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। স্থির করলাম সন্ধ্যার ট্রেনেই বাড়ি যাব।

সেদিন কি একটা কাজে গোয়ালন্দ উপরবাজারে যেতে হয়েছিল। সেখান থেকে একাই ফিরছি। বেলা তখন প্রায় পাঁচটা হবে। গোয়ালন্দঘাট বাজারের কাছে আসতেই একটা গোলমাল চোখে পড়ল। মানুষ যে যেদিকে পারে দুর্দাড় ছুটছে। ঝুপঝাপ দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হচ্ছে। কি ঘটেছে তা বলার অবকাশ কারও নেই। আর একটু এগিয়ে যেতে এক চাটগেঁয়ে খালাসী ছুটতে ছুটতেই সাহস করে বলে গেল,—এজাণ্ট ছাব গুল্লী মারবো।

এজেন্ট সাহেব গুলি মারবে? ব্যাপারটা কি দেখার জন্যে বাজারের দিকে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম ষ্টীমার কোম্পানির এজেন্ট ব্লাকমুর সাহেব রিভলভার হাতে টলতে টলতে বাজারের ভিতর দিয়ে পূবদিকে চলেছেন, আর হিন্দীতে অশ্লীলভাষায় কাদের গালাগালি দিচ্ছেন।

একজন পশ্চিমে ছাতুর দোকানদার তার দোকানের ঝাঁপ একটু ফাঁক করে ব্যাপার কি হয় দেখছিল। তার মুখে শুনলাম,—সাহেব ঘণ্টাখানেক পূর্বে মাতাল অবস্থায় বেশ্যাপাড়ার নিকটে খালাসীদের সাথে বিবাদ বাধিয়েছিলেন। সাহেব তাঁর যত্নে শেখা সাহেবী হিন্দীতে দেন গালাগালি। ফলে কংগ্রেসের শক্তিতে শক্তিমান চাটগেঁয়ে খালাসীরা চাঁদা করে সাহেবকে বেশ কিছু চাঁটি লাগিয়ে দেয়। সাহেব সে সময় বেগতিক দেখে বাজার ছেড়ে তাঁর ফ্লাটে যান।

তারপর বোধ হয় আরও দু-এক গ্লাস টেনে চাঙ্গা হয়ে গুলিভরা হাতে বাজারে এসে তাঁর চাঁটিমারা চাটগেঁয়েদের খুঁজছেন।

গুলিভরা ঝক্‌ঝকে রিভলভারের সম্মুখে নিরস্ত্র কোনও শক্তিই যে আপাতত প্রাণটাকে পৈতৃক দেহের মধ্যে টিকিয়ে রাখতে পারবে না, তা বুঝতে বুদ্ধিমান মুসলমান খালাসীরা একটুও বিলম্ব করেনি। তারা যে যার মত বাজার ছেড়ে সরে পড়েছে। বাজারের সংখ্যাগুরু অবাঙ্গালী মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাঙ্গালী দোকানদাররাও দোকানের দরজা বন্ধ করে বোধ হয় দুর্গানাম জপ করছে।

বাজারের পূবে ছিল একটা খাল। খালের ধার দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ লম্বা রাস্তা দক্ষিণে খালাসী পটির দিকে গিয়েছে। সাহেব সেইপথ ধরে দক্ষিণে চললেন। বুঝলাম অবস্থা গুরুতর।

রাস্তার এক জায়গায় বৃষ্টির জল জমে কাদা হয়েছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে কি করে জুতো বাঁচানো যায় তাই বোধ হয় সাহেব ভাবছিলেন। এই অবস্থায় সুযোগ পেয়ে গেলাম। কলেজ-জিমনাসিয়ামে কয়েকটা জাপানী জুজুৎসুর প্যাঁচ শিখেছিলাম। পিছন থেকে যেয়ে একটা প্যাঁচ কষতেই ব্লাকমুর সাহেব কাদায় পড়ে মাড্‌মুর হয়ে গেলেন। রিভলভারটা হাতে পাওয়ামাত্র নিকটের খালে ফেলে দিলাম। সাথে সাথে মনে হল, ঘাড়ের ওপরে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কোনও প্রকারে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, বাঘ নয়, বৃটিশ সিংহ স্টেইন সাহেব পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

রাত্রিটা থানায় হাজতে কেটে গেল। পরদিন বেলা নয়টায় রাজবাড়ির বিখ্যাত মোক্তার বীরেশ্বর লাহিড়ী মশাই আর ফরিদপুরের উকীল তমিজুদ্দিন খান সাহেব থানায় এসে দেখা করে জানালেন যে, সেই দিনই বেলা এগারটায় গোয়ালন্দ ডাক বাংলোয় স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার বিচার করবেন।

তাঁদের মুখে শুনলাম,—ব্লাকমুর সাহেব থানায় যে ডায়রী লিখিয়েছেন সেটা নাকি খুব খারাপ। পুলিস সাহেব কিছু বলেন নি, তিনি সাক্ষী হবেন।

আমার মুখে সমস্ত শুনে খান সাহেব উত্তেজিত হয়ে বললেন, দরকার হলে তিনি আমার জন্যে হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়বেন। টাকার জন্যে কুচপরোয়া নেই, সব ব্যবস্থা তিনিই করবেন। অতএব ঘাবড়াও মৎ।

আমি কিন্তু মোটেই ঘাবড়াইনি। বরং ঘটনাটা বলে বন্ধু মহলে কেমন বাহাদুরী পাব তাই ভাবছিলাম।

বেলা এগারটায় ডাক বাংলোয় কোর্টে উপস্থিত হলাম। বিচারক আই, সি, এস, ম্যাজিষ্ট্রেট ইংরেজ হক সাহেব। আমার পক্ষ সমর্থনের জন্যে লাহিড়ী মশাই ও খান সাহেব উপস্থিত আছেন।

বিচারের প্রথম পর্ব শেষ হয়ে সাক্ষী পর্ব আরম্ভ হল। প্রথম সাক্ষ্য জয়েন্ট ষ্টীমার কোম্পানির সুযোগ্য এজেন্ট মাননীয় ব্লাকমুর সাহেব যথারীতি হলপ্ করে বললেন,—গোয়ালন্দঘাটে জাহাজের খালাসী ও কুলীরা ধর্মঘট করে বিদ্রোহী হওয়ায় তিনি রাস্তাঘাটে চলতে হলে আত্মরক্ষার জন্যে তাঁর লাইসেন্স করা রিভলভারটা কোটের পকেটে নিয়ে চলেন। সেদিন ঐ প্রকারে যেতে যেতে পথে এক জায়গায় কাদায় জুতো ফস্‌কে পড়ে যান। পড়ার সময় রিভলভারটা পকেট হতে বেরিয়ে যায়, সেটা তিনি লক্ষ্য করেন নি। হঠাৎ এই বেঙ্গলী কংগ্রেসী বডমাশটা ছুটে এসে রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়ে তাঁকে গুলি করতে যায়। থ্যাঙ্ক গড্, সুযোগ্য পুলিস সুপার মিষ্টার স্টেইন সময় মত ঐ ব্লাডথার্স্টি বেঙ্গলী বডমাশটাকে ধরে ফেলেন। তাতেও কানীং বডমাশটা আমার মূল্যবান ছয় ঘড়া রিভলভারটা খালের জলে ফেলে দিয়েছে। সেটা খুঁজে এখনও পাওয়া যায়নি।

জবানবন্দি শেষ হলে এজেন্ট সাহেব তাঁর স্বদেশী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ডাইনে টেবিলের ধারে চেয়ারে বসলেন। তারপর দ্বিতীয় সাক্ষী যুদ্ধ ফেরৎ মিলিটারী ম্যান স্টেইন সাহেব এসে দাঁড়ালেন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাঁয়ে টেবিল ঘেঁসে।

স্টেইন সাহেব হলপ্ করে বললেন,—বাজারে একটা হল্লা হচ্ছে

সংবাদ পেয়ে আমি বাজারের দিকে যাচ্ছিলাম। খালের ধারের রাস্তায় দেখলাম মিষ্টার মুর রিভলভার হাতে দক্ষিণ দিকে চলেছেন। পথে একটা জায়গায় জলকাদা ছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে মিঃ মুর যখন ইতস্তত করছিলেন তখন পাশের ঘরের আড়াল হতে এই ইয়ং চ্যাপ তাঁর দিকে ছুটে গেল। তারপরেই দেখলাম মিষ্টার মুর একটা পাক খেয়ে জল কাদায় পড়ে গেলেন। তাঁর হাতের রিভলভারটা দ্যাট বয় কেড়ে নিয়ে খালের জলে ফেলে দিল। আমি দৌড়ে গিয়ে ছেলেটাকে ধরে ফেললাম।

জবানবন্দি শেষ হলে বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার পক্ষের উকীল-মোক্তারকে সাক্ষীদের জেরা করতে বললেন। উকীল খান সাহেব বললেন,—তাঁরা এখন কিছুই করবেন না, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ওপরেই সমস্ত ভার দিচ্ছেন।

ইংরেজ আই, সি, এস, ম্যাজিষ্ট্রেট বিচারক তাঁর বাঁয়ে দণ্ডায়মান পুলিস সুপারকে প্রশ্ন করলেন,—আপনি বলছেন আসামী মিষ্টার মুরকে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে তিনি নিজেই জুতো স্লিপ করে পড়ে গিয়েছিলেন ?

স্টেইন সাহেব উত্তর দিলেন,—না, না। আমি প্রকাশ্য দিবালোকে নিজের চোখে দেখলাম,—দ্যাট ইয়ং চ্যাপ্‌ উইথ এ ফাইন ট্রিক্‌ মিষ্টার মুরকে ডিগবাজী খাইয়ে ফেলে দিয়ে হাতের রিভলভারটা কেড়ে নিল।

এই কথা যেই না বলা, মুর সাহেব টেবিলের ওপরে বিরাশী সিক্কা ওজনের এক কিল মেরে লাফিয়ে উঠে বললেন,—কক্‌খনও না। ওর সাধ্য কি যে আমাকে ফেলে দেয়। তুমি মিথ্যে কথা বলছ। আমি জুতো পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম। রিভলভারটা আমার কোটের পকেট থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায়।

এরপর আর তাঁদের কথা বিশেষ কিছু বুঝতে পারলাম না। দুজনেই তাঁদের খাস মাতৃভাষা ধরলেন। নোয়াখালী-চাটগাঁর ভাষা বাংলা হলেও যখন দুই জাহাজী খালাসী ঝগড়া করে, তখন যেমন বাংলা

জানা অন্য প্রদেশবাসী, এমন কি পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালীরাও তাদের কথা বুঝতে পারেন না, ঠিক সেই প্রকার চলল। তবে কয়েকবার মুর সাহেবের মুখে 'ইউ আইরিশ ডগ (—তুই আইরিশ কুত্তা)' এবং স্টেইন সাহেবের মুখে,—'ইউ হাংরী স্কচ্ উল্‌ফ্ (—তুই হ্যাংলা স্কচ্ নেক্‌ড়ে)' শুনে বুঝলাম, স্টেইন সাহেব আয়ার্ল্যাণ্ডের অধিবাসী আইরিশ ; আর মুর সাহেব স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী স্কচ্। উভয়ের সম্বন্ধটা কলকাতার খেলার মাঠে ঘটি ও বাঙালের সম্বন্ধের চাইতেও সরেস।

ওদিকে মুর সাহেবের কিলের চোটে টেবিলের লালকালো কালির দোয়াত দুটো লাফিয়ে উঠে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাদা পোষাকের ওপর গড়াগড়ি দিয়ে হোলিখেলা করেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সে হোলিরঙে মাতার অবকাশ পেলেন না। সম্মুখে যাতে পুরোপুরি গজকচ্ছপী বেধে না যায়, তার জন্যে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ডাইনে বাঁয়ে চারখানা বিশাল হস্তের বিপুল আস্ফালন ঠেকাতে লাগলেন। ঘরে-বাইরে বহু লোক নির্বাক হয়ে এই অপূর্ব দৃশ্য দেখছে, কেবল মাত্র প্রবীণ মোক্তার লাহিড়ী মশাই ধীরে ধীরে মন্ত্র জপ করছেন, —নারদ নারদ, নারদ নারদ।

কতক্ষণ যে একাণ্ড চলেছিল তা বলতে পারব না। এ রকম ঘটনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে সময়ের হিসেব রাখতে পারে, এরকম হিসেবী কেউ কোথাও আছেন কিনা সন্দেহ। শেষ পর্যন্ত ম্যাজিষ্ট্রেট হক সাহেবের চেষ্টায় গজকচ্ছপীটা আর পাকতে পারল না। দুজনের আস্ফালন থামিয়ে অবস্থাটা আয়ত্তে এনে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমাকেই কি ঘটেছিল তা বলতে অনুরোধ করলেন।

আমার পক্ষের উকীল-মোক্তার দুজনেই এ প্রকার অনুরোধে আইনগত আপত্তি করলেন। আমি কিন্তু উত্তর দিলাম,—স্টেইন সাহেব যা বলেছেন তাই ঠিক। এ বিষয়ে যদি কোনও সন্দেহ থাকে তবে মিষ্টার মুরকে ডাকবাংলোর সম্মুখে মাঠে যেয়ে দাঁড়াতে বলুন। আমার কৌশলটা আপনাদের সম্মুখেই আর একবার দেখিয়ে দিচ্ছি।

বিচারক, পুলিস সুপার স্টেইন সাহেবকে প্রশ্ন করলেন,—আসামী রিভলভারটা জলে ফেলে দেবার পূর্বে আপনাকে দেখেছিল কি?

স্টেইন সাহেব উত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—নো, নো। আপন মাই অনার আমি বলছি, ওকে ধরার পূর্বে ও আমাকে দেখতেই পায়নি। মিষ্টার মুরের হাত হতে রিভলভারটা কেড়ে নিয়েই জলে ফেলে দিয়েছে। যখন রিভলভারটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দেয়, তখন ও আমার দিকে মাথা করে মাটিতে পড়েছিল। মাটি থেকে ওঠার সাথে সাথেই আমি ওকে ধরে ফেলেছি। ধরা পড়ে ও অবাধ্য হয়নি।

ম্যাজিষ্ট্রেট আর একবার আমার উকীল-মোক্তারদের জিজ্ঞাসা করলেন,—তাঁদের কিছু বলার আছে কিনা। উকীল খান সাহেব ও মোক্তার লাহিড়ী মশাই পরামর্শ করে জানালেন, এখন তাঁদের কিছু বলার নেই।

এরপর দশ মিনিটের মধ্যে রায় দেওয়া হয়ে গেল। যেহেতু আসামী ষ্টীমার কোম্পানির মাননীয় এজেন্ট মিষ্টার ব্লাকমুর সাহেবের কাদা জলে পড়ে অপমানিত হওয়ার কারণ, সেহেতু আসামীকে একমাস কারাদণ্ড দেওয়া হল।

রায় শুনিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট উকীল খান সাহেবকে বললেন,—যদি তাঁরা আপিল করতে ইচ্ছে করেন তবে তিনি আসামীকে ব্যক্তিগত জামিন দিতে প্রস্তুত।

আমি খান সাহেবকে বললাম,—কলেজ খুলতে এখনও দেড় মাস বাকী। এই ফাঁকে জেলটা কেমন তা একবার দেখে আসি।

খান সাহেব বললেন,—বেশ, তাই হোক। আমি জেলে তোমার খোঁজ-খবর নেব। তোমার বিশেষ কোনও অসুবিধে হবে না।

এই তমিজুদ্দিন খান সাহেবই পরে পাকিস্থানের প্রথম গণপরিষদের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন।

মামলার ব্যাপার মিটিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট হক সাহেব তাঁর মূল্যবান পোষাকটার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন দেখে লাহিড়ী মশাই বললেন,—

মিষ্টার মুর বোধহয় এক টাকা খরচ করেই তাঁর পোষাকটা ঠিক করে নিতে পারবেন। কিন্তু আপনারটা··· ?

হক সাহেব উত্তর দিলেন,—ওঃ, এটা আমাকে বিশ টাকা খরচ করাবে।

খান সাহেব বললেন,—ওটা যে বৃটিশ কালি।

ম্যাজিষ্ট্রেট হক সাহেব হেসে উত্তর দিলেন,—না, এটা স্কচ।

হক্ সাহেব ছিলেন খাঁটি ইংরেজ। তাঁর কথায় সকলেই হেসে উঠলেন। কেবল মাননীয় ব্লাকমুর সাহেব বিষন্ন মুখে বিদায় হলেন।

সেদিন আর ফরিদপুর জেলে যাওয়া হল না, গোয়ালন্দ থানায় থাকতে হল। সে থাকা আসামীর মত নয়, দারোগাবাবুর আত্মীয়ের মত।

পরদিন প্রাতে স্নান আহার সমাধা করে দুজন কনষ্টেবলের সাথে চললাম গাড়ি ধরতে স্টেশনে। থানার বাইরে হাজার খানেক খালাসী ও কুলী ভলান্টিয়ার মিছিল করে অপেক্ষা করছিল। তারা চলল পিছনে পিছনে ধ্বনি দিতে দিতে। স্টেশন প্লাটফর্মে পৌঁছুলে শত খানেক বেশ্যা উলু দিতে লাগল। তাদের দুজন ফুলের মালা আর চন্দন বাটা নিয়ে এগিয়ে আসতেই তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে পড়ে কনষ্টেবল দুজনকে বলে দিলাম, আমার গাড়িতে যেন কেউ না ওঠে।

অল্পক্ষণ পরেই গাড়ি ছেড়ে দিল। আমাদের কামরাটা ধীরে ধীরে প্লাটফর্ম ছাড়তে চলেছে। হঠাৎ পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট স্টেইন সাহেব গাড়ির পাদানীর ওপরে উঠে বুক পর্যন্ত গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে আমার হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন,—ডোণ্ট মাইণ্ড মাই বয়। বী চিয়ারফুল (—কিছু মনে কর না ভাই। খুশি মনে থাক।)

তারপর নেমে শীষ দিতে দিতে চলে গেলেন।

এবার ভাল করে বুঝলাম, যুদ্ধ ফেরৎ মিলিটারী স্টেইন সাহেব আইরিশম্যান, ডি, ভ্যালেরার দেশের লোক।

ভাগ্য বিড়ম্বনা

জেল হতে বেরিয়ে বাড়ি এসে যা দেখলাম তাতে মা সরস্বতীর চরণে এ জন্মের মত বিদায় নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। মা তাঁর বউমাকে নিয়ে চলে গেলেন নবদ্বীপে। আমি বেরুলাম অর্থের ধান্ধায়। চা-বাগানের চাকরির তেরদিনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম তাতে চাকরি করার ইচ্ছে আর ছিল না। প্রায়ই লোকমুখে শুনি, 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী'। আমিও কর্মজীবনের প্রারম্ভে সেই পথই বেছে নিলাম। স্ত্রীর হাতের একজোড়া রুলী বিক্রয় করে সত্তর টাকা মূলধন নিয়ে আরম্ভ করলাম পাকসা থেকে পদ্মাপার সাতবাড়ীয়া পর্যন্ত যাত্রীবাহী গহনার নৌকার ব্যবসা। বর্ষার তিনমাস গহনা চালিয়ে ছয়'শ টাকা লাভ করে পূজোর ছুটির পর খুললাম পাবনা-নাজিরগঞ্জ বোট সার্ভিস। দেড় বৎসর নৌকা চালিয়ে বার্ড কোম্পানি থেকে কিনলাম বার হাজার টাকার এক মটরলঞ্চ। ছ-হাজার টাকা দিলাম নগদ, ছ-হাজার টাকার হল চার বছরে চারটে কিস্তি। লঞ্চ পাঁচ হাজার টাকায় ইনসিওর করলাম গিলেণ্ডার আরবুথনট কোম্পানির সাথে। লঞ্চ চলল কুষ্টিয়া, পাবনা. নাজিরগঞ্জের মধ্যে।

পাঁচমাস বেশ গেল, ভাল লাভ হয়, বুকভরা আশা, চোখে রঙিন স্বপ্নঘোর। ১৯২৩, ২৭শে জুন, কাল সন্ধ্যা। পাবনার ঘাটে পদ্মা নদীর পাড়ি ভেঙ্গে লঞ্চের ওপরে পড়ে লঞ্চ ডুবিয়ে দিল। রাত্রে কিছুই করা গেল না, পরদিন লঞ্চের খোঁজই পাওয়া গেল না।

ইনসিওরের টাকা আদায় করে আর হাতে যা ছিল তাই দিয়ে, বার্ড কোম্পানির পাওনা দিলাম। একটা খালাসীর একখানা ঠ্যাং ভেঙ্গেছিল, মেরাইন অ্যাক্ট অনুযায়ী তার সেই ঠ্যাঙের দাম দিলাম দু-হাজার টাকা। আর আর দেনা শোধ করে অবশিষ্ট আট টাকা বার আনা হাতে একদিন উপস্থিত হলাম নবদ্বীপ বাসায়।

বার হাজার টাকার লঞ্চ কিনেছিলাম। ঐ বার হাজারের মূলে

স্ত্রীর হাতের যে রুলীজোড়াটা ছিল, তা কিন্তু আর নতুন করে তার হাতে ওঠেনি। কল্পনারাজ্যের রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে বাস্তব সংসারের কোনও কিছুই এই দু-বছর ভাবিনি, দেখিওনি। ফলে আবার সেই উনুনে হাঁড়ি চড়ানর সমস্যা। সামান্য কিছু মূলধন যোগাড় করার মত কিছুই হাতে নেই।

এর মধ্যে মা-ষষ্ঠীর কৃপাও একটি দেখা দিয়েছে। খানেওয়ালা ছোট খোকাকে নিয়ে আমরা ছ-জন। খোকাকে ধরলাম, কারণ মা বলতেন, 'মাথায় ছোট বড়, পেটে সব সমান'। তিনটে টিউশনি যোগাড় করে দিন রাত ছ'ঘণ্টা বকে মাসে পাই পনরো টাকা। পূর্ববঙ্গে কিছু পৈতৃক শিষ্য ছিল, মা মাঝে মাঝে শিষ্যবাড়ি যান বটে কিন্তু অন্য গোসাঁইদের মত পাওনা হয় না। স্ত্রী অবসরমত কিছু শিল্পকাজ করে যা পায়, তা তার সোনার চাঁদের দুধেই যায়। ভাড়াটে বাসার ভাড়া মাসে পাঁচ টাকা গুনতে হয়। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, সে দৃশ্য চোখে দেখা কষ্টকর।

এ দুর্দশা দেখার দায় থেকে অব্যাহতিলাভের ব্যবস্থা হয়ে গেল। একদিন নবদ্বীপ থানায় ডাক পড়ল। তারপর কৃষ্ণনগর হয়ে আবার কলকাতা লালবাজারের রাজবাড়িতে উপস্থিত হলাম।

রাজবাড়িতে আমার পূর্বপরিচিত নছিরুদ্দিন সাহেব এবং তাঁর সাথে ঐ রকম এক আলী সাহেব আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। প্রথমে নছিরুদ্দিন সাহেবই আলাপ আরম্ভ করলেন। তিন বৎসর পূর্বের সেই একই উপদেশ, সহানুভূতি, প্রলোভন, ভয় দেখানো সমানে চলল। এবার বিশেষত্ব দেখলাম,—চা-বাগানে সাহেবের মাথা ফাটানো, গোয়ালন্দের ঘটনা, পদ্মায় লঞ্চ ডুবি, এমন কি আমার বাল্যকালের অনেক ঘটনার সংবাদও কর্তারা রাখেন।

ঘণ্টা চারেক আলাপ-আলোচনার পর নিতান্ত বিরক্ত হয়ে শেষে আমি বললাম,—দেখুন, আমার সাংসারিক অবস্থার ভালমন্দ অন্তত কিছুটা আমি বুঝি। সে বিষয়ে আপনার আন্তরিক সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু যে সমস্ত সংবাদ আপনি জানতে চাচ্ছেন, তাতে বলার

মত কিছুই তো খুঁজে পাচ্ছিনে। অকারণ আমাকে নিয়ে আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে মাত্র।

এইবার আলী ছাহেব মুখ খুললেন,—আরে মছয়, আপনাগো লইয়্যাই তো আমাগো কাম। বোমা বানাবেন, পিস্তল মারবেন, ইংরাজগো বুকে বইস্যা দাড়ি উপড়্যাবেন, আবার বালমানুষ হাইজ্যা ঘুইর‍্যা বেড়াইব্যান। এ দোনো কাম চলবো না। ইস্কুলে বায়াত্তর ব্যাত খাইয়্যাও জবান ছাড়েন নাই, তা আমি হক্কল জানি। এহানে কচুয়া ধোলাইতে পইল্যা পট্ প-অ-অট্ কইর‍্যা হক্কল কথা ছাড়ন্ লাগবো-ও-ও।

উত্তর না দিয়ে আর পারলাম না।—আরে মিঞা', হাঁতার পানির যাস্তি পানি আমি তো কোহানেও দেহি নাই। মিঞাছাহেব গো নোয়াখাইল্যা পানিতেও না।

এইখানেই সে দিনের আলাপ শেষ হল। লালবাজারে স্পেশাল হাজতে রাত্রি কাটানর জন্যে চললাম। পরদিনে কচুয়া ধোলাই-এর জন্য মন প্রস্তুত করার এক রাত্রি সময় পেলাম।

কচুয়া ধোলাই

কলকাতা বাজারে যে সমস্ত ওলকচু ওঠে সেগুলো বিক্রেতারা ঘষে মেজে ছালবাকল তুলে এমন ধপ্ ধপে পরিষ্কার করে আনে, যে কিনে এনে তুদিন ঘরে রাখলেই পচে ওঠে। কোনও জিনিস ঐ প্রকার পরিষ্কার করাকে কচুয়া ধোলাই বলে। ভাষাটা অবশ্য অবাঙ্গালী।

আজকাল আছে কিনা জানিনে। আগে ইংরেজ আমলে সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তিদের স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে লালবাজারের কর্তারা এলিসিয়াম রোতে একটি চমৎকার ধোবীখানা করেছিলেন। সেখানে যে ধোলাই হত তার নাম ঐ কর্তারাই রেখেছিলেন 'কচুয়া ধোলাই' ধোলাই-এর রকমারীও ছিল বহু। আমার যতদূর জানা ও শোনা

আছে তাতে, একমাত্র বাঙ্গালী বোমারু বিপ্লবী গোষ্ঠী ছাড়া আর কেউ ঐ ধোলাইখানায় কচুয়া ধোলাইতে পড়ে নির্বাক থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

আগামী দিনে কচুয়া ধোলাইতে পড়ার সম্ভাবনা সম্মুখে নিয়ে সে রাত্রি থাকলাম লালবাজার পুলিস হাজতে। এক রাত্রি যখন সময় পাওয়া গেল তখন আলা সাহেবের উক্তি সেই বায়াত্তর ব্যাতের কাহিনীটা শুনাই।

তখন আমার বয়স তের বৎসর। পাংসা হাইস্কুলে ক্লাস সেভেন-এ উঠেছি। জানুয়ারী মাস, নতুন ছাত্র ভর্তি চলছে। সতীশ প্রামাণিক নামে মাইনরে বৃত্তি পাওয়া একটি ছেলে আমাদের ক্লাসে ভর্তি হল। ছেলেটার পেটটা একটু অসাধারণ রকমের মোটা। সতীশ প্রথম দিন ক্লাসে এলে আমিই আদর করে কাছে বসিয়ে তার নামটা জেনে নিলাম। তারপর সকলকে জানিয়ে দিলাম নবাগতের নাম পেট্‌কে মাণিক।

দিন পনরোর মধ্যে স্কুলের প্রায় সকলেই তার সতীশ নামটা ভুলে গেল, প্রামাণিকের প্রা-টাও হারিয়ে গেল, টিকে রইল পেট্‌কে-মাণিক। তবে মাষ্টার মশাইরা কেবল মাণিক বলেই ডাকতেন। নামটা যে আমার দেওয়া তা সে জানত, কিন্তু তার জন্যে কোনও দিন আমাকে কিছু বলেনি।

মাস দুই পরে একদিন, তখনও ঘন্টা পড়েনি, সকলে ক্লাসে হৈ-চৈ করছি। এমন সময় মাণিক বই বগলে ক্লাসে ঢুকতেই আমাদের একজন মিলিটারী কায়দায় মার্চ করে যেয়ে তার পেটে হাত ছুঁইয়ে স্যালুট করল। তখন মাণিক কিছু বলল না, প্রথম ঘণ্টায় ক্লাস টিচার শরৎবাবু এলে নালিশ করল। স্যালুটকারীর শাস্তি হল একঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা।

পরদিন আর একটি ছেলে স্যালুট দিল। মাণিকও নালিশ করল। সে ছেলেটা শাস্তি পেল স্ট্যাণ্ড-আপ-অন দি বেঞ্চ। তার পরদিন আর একজন স্যালুট দিয়ে শাস্তি পেল নীল-ডাউন-অন দি বেঞ্চ।

সেদিন কিন্তু মাষ্টারমশাই মাণিককে বললেন,—দেখ মাণিক, তোর পেটটা ছোট কর। একটা শক্ত ফিতে পেটে কষে বাঁধ, তা হলেই পেটটা ছোট হয়ে যাবে।

পেটকে মানিক কিন্তু পেটে ফিতে বাঁধল না। সে ঘণ্টা পড়লে মাষ্টার মশায়ের সাথে ক্লাসে আসে, আর ছুটির ঘণ্টা পড়লেই মাষ্টার মশায়ের পেছনে পেছনে বেরিয়ে যায়।

একদিন টিফিনের ঘণ্টা পড়েছে, মানিক বেরিয়ে না যেয়ে বোর্ডে কষা অঙ্কটা দেখছিল। আমাদের ক্লাসের বটকৃষ্ণ যেয়ে দিল স্যালুট। স্যালুটের সাথে সাথেই অমন নিরীহ মানুষ মানিক হিংস্র ভালুকের মত জাপ্‌টে ধরল বটাকে। দুজনে হুড়মুড় করে যেয়ে পড়ল চেয়ারের ওপড়ে। চেয়ারের একটা পায়া ভেঙে গেল।

চেয়ারের পায়া ভাঙা দেখে মানিকের রাগ, আমাদের মজামারা সব থেমে গেল। ক্লাস-মনিটর সরফুদ্দিন চেয়ারের পায়াটা কোনও প্রকারে জোড়া দিয়ে চ্যাটাইয়ের বেড়া ঠেঁস দিয়ে রেখে সকলকে বলে দিল, কি ঘটেছে তা যেন কেউ মাষ্টার মশাইদের কাছে না বলে।

পরের ঘণ্টায় বাংলা পড়াতে এসে মাষ্টার মশাই চেয়ারে বসতে যেয়েই পড়ে গেলেন। পড়াটা একটু বেকায়দা মত হল। চেয়ারের আর একটা পায়াও ভেঙেছে। মাষ্টার মশায়ের মাথায় ছিল মোটা টিকিতে গিঁঠ বাঁধা। টিকির গিঁঠটা চাঁচের বেড়ার চটায় বেধে মাথাটা নীচু হতে দিল না। পা দু'টা ভাঙা চেয়ারের ওপর দিয়ে টেবিলের তলে শূন্যে প্রসারিত। হাত দুখানা মেঝে হতে কয়েক ইঞ্চি ওপরে মেঝের মাটি ধরার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করছে। নিতান্ত অসহায় অবস্থা।

সাহায্য করতে আমরা সবাই ছুটে গেলাম। কিন্তু অবস্থা দেখে হাসির চোটে সকলেরই গায়ের জোর কমে গেছে। হঠাৎ বটার বুদ্ধি খুলে গেল, পকেটে ছিল ধারাল ছুরী, ছুরী দিয়ে টিকিটা কেটে দিতেই মাষ্টার মশাই হাতে মাটি পেলেন। আমাদের সাহায্য আর প্রয়োজন হল না।

গোলমাল শুনে হেডমাষ্টার মশাই এসে পড়লেন, কে চেয়ার ভেঙেছে জানতে চাইলেন। সকলেই বললাম,—জানিনে। আমাদের প্রত্যেকের চার আনা করে ফাইন হল।

পরের ঘণ্টায় এলেন ইয়াকুব আলী চৌধুরী সাহেব, আমার প্রাইভেট মাষ্টার। তিনিও জিজ্ঞাসা আরম্ভ করলেন,—কে চেয়ার ভেঙেছে। সকলেই 'জানিনে' বললেও আমি পারলাম না, কারণ তাঁর নিকটে কোনও দিনই মিথ্যা কথা বলিনি। আমি উত্তর দিলাম, —জানি, কিন্তু বলব না।

মাষ্টার সাহেব তখন আমাকে কিছুই বললেন না। ছুটির পর হেডমাষ্টার মশাই লাইব্রেরী ঘরে ডেকে পাঠালেন। জানতে চাইলেন কে চেয়ার ভেঙেছে। আমি নির্বাক। খেলাম গুণে বার বেত। দিনটা ছিল সোমবার।

পরদিন টিফিনের ছুটিতে আবার ডেকে পাঠালেন। আবার জিজ্ঞাসা করলেন। আমি নিরুত্তর। খেলাম বার বেত।

সে দিন ছুটিব পর মানিক, বটা আর সরফুদ্দিন তিনজনে যেয়ে হেড-মাষ্টার মশাইকে সমস্ত ঘটনা বলে প্রত্যেকে দশ দশ বেত খেয়ে এল। কিন্তু তাতেও হেডমাষ্টার মশায়ের রাগ পড়ল না, তিনি আমার মুখ দিয়ে কথা বের করবেনই। কাজেই পরদিনও টিফিনের ছুটিতে লাইব্রেরীতে যেয়ে গুণে বার বেত খেয়ে এলাম। এই প্রকারে শনিবার পর্যন্ত চলে বাহাত্তর বেত খাওয়ার পর মাষ্টার মশাই হাল ছেড়ে দিলেন।

আমার সেই তের বছর বয়সের ঘটনা লালবাজারের বড় কর্তারা রেকর্ড করে রেখেছেন জেনে বিস্মিত হলাম।

আমি বিস্মিত হলেও লালবাজারী কর্তারা কিন্তু বুঝতে ভুল করেছেন। ফলে পরদিন সকাল সাতটায় এলিসিয়াম রো-এর বিখ্যাত ধোবীখানায় যেতে হল। সেখানে যেয়ে দেখলাম সেই নোয়াখাইল্যা আলীছায়েব কাগজ কলম নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন। আমি ধোলাইয়্যা পইড়া যহন পট্ প-অ-ট্ কইর‍্যা হক্কল কথা ছাড়ুম্, তহন ছায়েব ঝট্ প-অ-ট্ কইর‍্যা লিখ্যা লইবেন।

ধোলাই আরম্ভ হল। দুপায়ে দড়ি বেঁধে কপিকলের সাহায্যে হেঁট মুণ্ডে ঝুলিয়ে মাথার নীচে একটব পচা বিষ্ঠা, আর একটু দূরে দূরে তিনটে জ্বলন্ত পাথুরে কয়লার চুলো রেখে দেওয়া হল।

দূরে সাড়ে সাতটার ঘণ্টা এক ঘা শুনলাম।

কিছুক্ষণ পরে দুহাতের দুটো আঙ্গুলে নখের মধ্যে দুটো তাজা সিঙ্গি মাছের কাঁটা ফুটিয়ে দেওয়া হল। মাছ দুটো আঙ্গুলের সাথে লেগে থাকল।

দূরে আটটার ঘণ্টা শুনলাম।

আরও কিছুক্ষণ পরে কতকগুলো শুঁড়ি পিঁপড়ে সারা গায় ছেড়ে দেওয়া হল। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে। নাক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে।

দূরে ঘণ্টার এক ঘা কানে এল।

নাক দিয়ে বেশী রক্ত পড়ছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। সারা গায় পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। মাছ দুটো আঙ্গুলের মধ্যে কৎ কৎ করছে। কাণের ভিতরে এক প্রকার অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। আলী ছাহেবের কথা আর শুনতে পাচ্ছিনে। চোখ অন্ধকার হয়ে আসছে। চোখের কোণে পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। দুহাতই পেটের সাথে বাঁধা আর কিছু জানিনে।

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নার্স

জানার মত অবস্থা যখন হল তখন প্রথম চিন্তা এল, আমি যমের বাড়ি পৌঁছে গেছি কিনা। কয়েকবার তাকিয়ে দেখে কিছুই বুঝলাম না। চোখ বুঁজে পূর্বের ঘটনা স্মরণ করতে চেষ্টা করলাম। যা স্মরণে এল তাতে মনে হল এটা নিশ্চয় যমের বাড়ি। পরক্ষণেই মনে হল এটা যদি যমের বাড়িই হয়, তবে যম রাজা আমাকে এনে এমন নরম বিছানায় শুইয়ে রাখবেন কেন? হঠাৎ কাণে এল কে যেন ইংরেজীতে বলছে,—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, রোগীর বোধ হয় জ্ঞান হচ্ছে।

ইংরেজীতে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! রোগীর জ্ঞান হচ্ছে! তবে কি এটা যমালয় নয়? আমি বেঁচে আছি? ভাল করে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। মাথায় খুব যন্ত্রণা, কে যেন মাথায় ঠাণ্ডা কিছু চেপে ধরছে। জিজ্ঞাসা করতে গেলাম,— আমি কোথায়, পারলাম না। কথা স্পষ্ট হল না। যে মাথায় আইস-ব্যাগ লাগাচ্ছিল, সে সম্মুখে এসে বলল,—আর ভয় নেই। আপনি ভাল হয়ে যাবেন। এখন কথা বলবেন না, তাতে পীড়া বৃদ্ধি পাবে। আপনি আলীপুর সেণ্ট্রাল জেল হাসপাতালে আছেন। আপনার আর কোনও ভয় নেই। আপনি সুস্থ হয়ে উঠছেন।

তাকিয়ে দেখলাম অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নার্স, বয়স বিশ-পঁচিশ, স্নেহ-মমতার প্রতিমূর্তি।

আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি দেখে কাছেই বিছানার ওপরে বসে আমার একখানা হাত তার দুহাতের মধ্যে নিয়ে আবার বলল,— আপনি আর ভয় করবেন না। আপনার ওপরে আর অত্যাচার হবে না। কয়েকদিনের মধ্যেই ভাল হয়ে বাড়িতে মা-বোনের কাছে যেতে পারবেন।

আমার জ্ঞান হয়েছে শুনে অনেকগুলি নার্স ছুটে এল। সকলেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগল। তাদের কথায় ও মুখের ভাবে বুঝলাম, সকলেই আমার জন্যে দুঃখিত ও চিন্তিত ছিল। একটা অত্যন্ত অল্প-বয়সী নার্স বলল,—'একেবারে কচি মানুষ।' দেখলাম চোখ দুটো তার সজল।

জেলের ঘড়িতে আটটা বাজল। নার্সদের কথায় বুঝলাম রাত্রি নয়টায় নার্স বদল হবে। কিছু পরেই ডাক্তার এলেন। ডাক্তারটি খাস ঢাকাই বাঙাল। তিনি প্রথমেই জানালেন,—আর ভয় নেই। তিনি রিপোর্টে জানিয়ে দেবেন, আর ধোলাই চালাতে গেলে এ মাল টিকবে না। সেজন্যে যা কিছু করা প্রয়োজন, তা সমস্তই তিনি করবেন।

নতুন যে নার্স এসে আমার ভার নিল তাকে পূর্বের নার্স ও ডাক্তার ভাল করে সব বুঝিয়ে দিলেন। ন'টা বাজলে যাওয়ার সময় পূর্বের

নার্সটি আবার আমার কাছে এসে পরম স্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে, 'কাল বেলা নয়টায় আবার দেখা হবে', বলে বিদায় নিয়ে গেল।

সতরো দিন ছিলাম হাসপাতালে। ডাক্তারবাবু দুবেলা দুটো আপেল দিতেন। নার্সেরাও নানাপ্রকার খাবার এনে দিত। আমি যেন তাদের একটা ছোট ভাই। তাদের মুখে শুনলাম,—এলিসিয়াম রো৷ ধোবীখানা হতে কোনও বিপ্লবী হাসপাতালে এলে, আর যাতে ধোবী-খানায় তাকে যেতে না হয় তার জন্যে ডাক্তারবাবু সাধ্যমত চেষ্টা করেন। ডাক্তারের ডায়রী, রোগীর বেডচার্ট, উপরওয়ালা সার্জন জেনারেলের নিকটে রিপোর্ট,—এসবের মধ্যেও বহু কারসাজি চালাতে হয়।

শুনে আশ্চর্য হলাম। ডাক্তার না হয় বাঙালী হিন্দু, কিন্তু এই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েরা? এরাও এই ব্যাপারে যোগ দিয়েছে !!

কি জন্যে যেন এই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের ওপরে মনে একটা বিতৃষ্ণা ছিল। এই হাসপাতালে যা দেখলাম ও শুনলাম তাতে বুঝলাম, এরাও আমাদের আপন জন, আপন বোন। তবে আমাদের ওপরে একটু অভিমানিনী।

আমার এই বিচিত্র জীবন-যাত্রাপথে আরও একবার এই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে হয়েছিল। হাসপাতালের অভিজ্ঞতায় মনের মিথ্যে সংস্কার দূর হওয়ার ফলে, তখন এদের সমাজে খোলা মনে মিশতে পেরেছিলাম। সে মেশামিশিতে লক্ষ্য করেছি, পাশাপাশি হিন্দু সমাজের সাথে মেলামেশা করতে এরা অত্যন্ত আগ্রহশীল। হিন্দু সমাজের পারিবারিক ব্যবহার, রীতিনীতি সমস্ত কিছুই এরা অতিশয় আগ্রহ সহকারে শুনতে চায়, বুঝতে চায়। তবে নানাকারণে এদের মন বড় স্পর্শকাতর। আমাদের দিক থেকে সামান্য অবজ্ঞাও এরা গুরুতর ভাবে গ্রহণ করে।

সে যুগে হাসপাতালে দেশী নার্স ছিল না বললেই হয়। তখনকার দিনে কোনও বিপ্লবী আহত বা পীড়িত হয়ে হাসপাতালে এলে, এই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নার্স-বোনেরাই বুকভরা স্নেহ আঁখিভরা মমতা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে তাদের রোগ-শয্যার পাশে।

এই বোনদের সেবাযত্নে সুস্থ হওয়ার পর বিচারে তার ফাঁসি হয়েছে সংবাদ শুনে এরা নীরবে কেঁদেছে। সে যুগের বিপ্লবী রোগীদের প্রতি এই নার্স বোনদের অনেকেরই একটা বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল একথা অনেকের মুখেই শুনেছি।

সে যুগের সেই দুর্দান্ত বিপ্লবীদের জন্যে যাঁদের মনের কোণে এখনও সহানুভূতির ব্যথার সুর বাজে, তাঁদের সেই কোমল স্থানে এই অজ্ঞাত অখ্যাত অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নার্স বোনদের জন্যে যদি একটু স্নেহ মমতা স্থান পায়, তবে তা অযোগ্যের জন্য হবে না। এরা আমাদেরই বোন, বিদেশীর নয়।

নিরুদ্দেশের যাত্রী

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে দিন পনরো জেলের ঠাণ্ডা-গারদ অর্থাৎ সেলে বাস করতে হল। এই সময়ে একদিন একজন বড়দরের অফিসার এসে দেখা করে অনেক সদুপদেশ দিলেন। তাঁর কোনও উপদেশই আমি গ্রহণ করলাম না বুঝে যাওয়ার সময় বললেন,—দেখ, আমিও বাঙ্গালী, স্বাধীনতা আমিও চাই। কিন্তু তোমরা যে পথে স্বাধীনতার সন্ধান করছ, সে পথে অন্তত ভারতের স্বাধীনতা আসবে না। গত তিন শ' বৎসরের পৃথিবীর ইতিহাস লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে, যে সমস্ত দেশ রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র বিদ্রোহের ফলে স্বাধীনতা লাভ করেছে, সে সমস্ত দেশের জনসাধারণ প্রায় সকলেই সামরিক মনোভাবাপন্ন। এদেশে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকাল থেকে আরম্ভ করে এই আড়াই হাজার বৎসর যাবৎ এত বেশী অহিংসাবাণীর উদ্গাতা অবতার-মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে যে, তার ফলে জনসাধারণের মন হতে সামরিক বৃত্তি নিঃশেষে মুছে গিয়েছে। ফলে তোমাদের সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা স্বাধীনতা আনার স্বপ্ন সফল হবে না। আরও একটা বিশেষ ব্যাপার লক্ষ্য করতে হবে। এ দেশের মুসলমান সমাজ কিন্তু

হিন্দুদের মত সামরিক মনোবৃত্তি হারায়নি। সিপাই-বিদ্রোহের পর হতে সুচতুর ইংরেজ এই মুসলমান সমাজটাকে এমন ভাবে তৈরী করেছে, যে তাদের শতকরা নিরেনব্বুই জন মনে করে তারা আরব থেকে এসেছে, তাদের স্বার্থ ভারতীয় হিন্দুদের স্বার্থ হতে পৃথক। এর ফলে ভবিষ্যতে যদি তোমরা সশস্ত্র গণ-বিদ্রোহ উপস্থিত কর, তবে ইংরেজ একমাত্র এই মুসলমানদের দ্বারাই তোমাদের সে চেষ্টা বানচাল করে দেবে। বর্তমানে গান্ধীজী হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু এ বন্ধনে যে খেলাফতের দড়ি ব্যবহার করা হয়েছে তা এতই সরু যা সামান্য স্বার্থের টানেই ছিঁড়ে যাবে। সে ছেঁড়ার ফল হবে মুসলমান প্রধান বাংলার পক্ষে ভয়ানক। অনেকে মনে করেন দধীচি ঋষির জীবনদানের ফলে যেমন দেব-শত্রু বৃত্রাসুর বধ হয়েছিল, তেমনি কয়েকজন বেপরোয়া যুবক স্বাধীনতার জন্যে ফাঁসিকাঠে ঝুললেই দেশে এমন একটা সামরিক উন্মাদনা আসবে যার ফলে সশস্ত্র গণ-বিদ্রোহ সম্ভব হবে। এ ধারণা ভুল। বৃত্রাসুর দূরদর্শী কূটনীতিবিদ্ ছিলেন না। তিনি দেবতাদের মধ্যেই ব্যক্তিস্বার্থের দানব তৈরী করতে চেষ্টা করেন নি। ইংরেজ কিন্তু ঐ দিকে খুব জোর দিয়েছে। এ অবস্থায় যদি ইংরেজ এদেশের শাসনভার এ-দেশীদের হাতেই দিয়ে যায়, তাতে জনসাধারণের বিশেষ কোনও সুবিধে হবে বলে মনে হয় না। বরং দুদিক থেকে শোষিত ও অত্যাচারিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। আমার এই কথাগুলো একটু ধীর চিত্তে চিন্তা করে দেখে যদি সঙ্গত মনে কর, তবে এই সন্ত্রাসমূলক বিপজ্জনক পথ ত্যাগ করে অপর বিপথগামীদের সংশোধনের জন্যে আমাদের সাহায্য কর। অকারণ কতকগুলি অমূল্য জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এর জন্যে সত্যই আমি আন্তরিক দুঃখিত।

এই সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়ে অফিসারটি চলে গেলেন। পরে শুনলাম ইনি পুলিসের বিখ্যাত ডেপুটি কমিশনার রায়বাহাদুর ভূপেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জি। চ্যাটার্জি সাহেবের সে বক্তৃতায় তখন কোনও গুরুত্ব না দিলেও এখন কিন্তু অনেক সময় তাঁর কথাগুলো বেশ ভাবিয়ে তোলে।

আরও কয়েকদিন কেটে গেল। তারপর একদিন স্নান-আহার সেরে, হাতে পায়ে রাজকীয় গয়না পরে, কালো গাড়িতে উঠলাম। সাথে চলল একজন লালমুখ সার্জেন্ট, আর দুজন গাড়োয়ালী সিপাই। সার্জেন্টের কোমরে পিস্তল, সিপাইদের হাতে বন্দুক। কোথায় যাব জানিনে, জিজ্ঞাসা করার প্রবৃত্তিও নেই।

শিয়ালদহ এসে আসাম মেলের রিজার্ভ কামরায় উঠলাম। সার্জেন্ট সাহেব অল্পবয়সী, নিজের শারীরিক শক্তি সম্বন্ধে বোধ হয় একটু অহঙ্কারও আছে। গাড়ি ছাড়তেই আমার কোমরের দড়িটা একজন সিপাইএর কোমরের সাথে বেঁধে দিয়ে গাড়ির সমস্ত জানালা খুলে দিল।

সার্জেন্টটি বেশ আলাপী। আমি কিছু ইংরেজী জানি বুঝে আলাপ আরম্ভ করল। সেদিন তার সাথে কি আলাপ হয়েছিল তা আর এখন মনে নেই। তবে একটা কথা মনে আছে, কথাপ্রসঙ্গে আমি যখন এলিসিয়াম রো-এর ধোলাইখানার ধোলাই বর্ণনা করছিলাম, তখন তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল Brutes (—জানোয়ার)। পরে শুনেছি ঐ ধোলাই কাজের জন্যে লালবাজারে বিশেষ একশ্রেণীর ধোপা আছে। যে কোনও পুলিস দিয়ে ও কাজ চলে না।

রাত্রি দুটোয় লালমনিরহাট জংসনে নেমে জি, আর, পি, তে ঘুমিয়ে নেওয়া গেল। বেলা সাতটায় কুচবেহার-দালসিংপাড়া লাইনের গাড়িতে উঠলাম। তখনও কোথায় চলেছি জানিনে। মনের একটা ভাব হয়েছে, যা হয় হোক গিয়ে ; ও নিয়ে আর মাথা ঘামাব না।

কুচবেহার, আলিপুরদুয়ার পার হলাম, এ পর্যন্ত আমার চেনা পথ। রাজাভাতখাওয়া জংসনে নেমে গাড়ি বদল করার সময় জানতে পেলাম, আমি বক্সা ডিটেন্সন্ ক্যাম্পে বাসা পেয়েছি। শুনে স্বস্তি বোধ করলাম। জেল অপেক্ষা ডিটেন্সন্ ক্যাম্প অনেক ভাল, এ কথা শোনা ছিল।

এ লাইনের শেষ স্টেশন জয়ন্তী। তার এদিকের স্টেশন বক্সা রোড। বক্সা রোডে গাড়ি পৌঁছুলেও আমাদের নামা হল না দেখে

সার্জেণ্ট সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম,—আমরা যখন বক্‌সা ক্যাম্পেই যাব, তখন এ স্টেশনে নামা হল না কেন ?

সার্জেণ্ট উত্তর দিল,—এটা কংগ্রেসীদের জন্যে। তোমাকে নামতে হবে জয়ন্তী স্টেশনে।

সার্জেণ্ট সাহেবের কথার তাৎপর্য তখন ঠিকমত বুঝতে পারিনি, পরে বুঝেছি। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের শুদ্ধি রক্ষার জন্যে মহাত্মাজী অপেক্ষাও ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট বেশী আগ্রহশীল। যাতে কোনও সহিংস বিপ্লবীর ছোঁয়াচ লেগে অহিংস কংগ্রেসী বন্দীরা কলুষিত না হয়, তার জন্যে বক্‌সা ক্যাম্প দুটো। দুই ক্যাম্পে যাওয়ার পথও দুটো। সর্বত্রই নাকি এই সতর্ক ব্যবস্থা।

শেষ স্টেশন জয়ন্তী নেমে প্রায় চার মাইল উঁচু-নীচু পাহাড়ে পথ ভেঙ্গে পুলিস ক্যাম্পে পৌঁছুলাম। সেখানে যে অফিসার আমার ভার বুঝে নিলেন, তাঁর নাম মফিজুদ্দিন সাহেব, বয়স পেনসনের কাছাকাছি, মুর্শিদাবাদ জেলার অধিবাসী, কথাবার্তায় বুঝলাম মার্জিত রুচি, শিক্ষিত ভদ্রলোক।

মফিজুদ্দিন সাহেব চারজন বন্দুকধারী সিপাই-সাথে আমাকে নিয়ে চললেন আমার বাসায়। প্রায় দু'মাইল হেঁটে বাসায় পোঁছে বাসার ঘর-বার তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখে তারপর আমার হাতপায়ের কড়া-বেড়ী ও কোমরের দড়ি খুলে দিয়ে সমস্ত দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন,—এখানে আপনি থাকবেন। আপাতত প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস দেওয়া হয়েছে। রান্না করে খেতে হবে। আর যা প্রয়োজন কাল আমাকে জানাবেন, সম্ভব হলে দেওয়া যাবে। প্রতিদিন আমি একবার এসে আপনার খোঁজ নিয়ে যাব।

সে বাসায় আমার জন্যে কি দেওয়া হয়েছিল, আর কি দেওয়া হয়নি, তার হিসেব না লিখেও একথা বলা চলে যে, সেখানে যা ছিল তার অনেক কিছু না থাকলেও সে যুগের বিপ্লবী বন্দীরা কোথাও কোনও দিন আপত্তি করেছে, বা ইনচার্জ অফিসার ও জেলারের বিরুদ্ধে বড় বড় দরখাস্ত লিখেছে,এমন কথা এ পর্যন্তও শুনিনি। তথাপি একজন

বিপ্লবী বন্দীর জন্যে যে ব্যয় হত তা দিয়ে নাকি শতখানেক কংগ্রেসী সাধারণ বন্দী প্রতিপালন করা যেত বলে শুনেছি। এর কারণ কিন্তু বোমারু বন্দীর খাওয়া-পরার ব্যয় নয়, তাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ই ছিল অসাধারণ।

মফিজুদ্দিন সাহেব দলবল নিয়ে চলে গেলেন। ঘরের মধ্যে শোবার জন্যে বাঁশের মাচা ছিল। তার ওপরে তিনখানা কম্বল ভাঁজকরা রয়েছে, আমার সাথেও একখানা ছিল। মাচার ওপরে বসে অনেকক্ষণ কাটালাম। প্রায় তিরিশ ঘণ্টা হাত-পায় কড়াবেড়ী লাগানো থাকায় শরীরে ব্যথা ও অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। খাওয়ার তাগিদ বেশী ছিল না। পথে সার্জেণ্ট সাহেবের সৌজন্যে ক্ষুধায় কষ্ট পাইনি। মনটা বড় ফাঁকা হয়ে পড়েছে। যেন ভাবার মত করার মত কিছুই নেই। মাঝে মাঝে আলীপুর জেলের হাসপাতালে নার্সবোনদের কথা মনে পড়ছিল।

রাত্রি ন'টার ঘণ্টা পড়ল। পাহাড়ে ফাঁকা জায়গা, দু-মাইল দূরের পুলিস ক্যাম্পের ঘণ্টা বেশ শুনতে পেলাম। উঠতে হল। বালতি ভরা জল ছিল, স্নান করে খিচুড়ি রান্না করে খেয়ে মাচায় শুয়ে এগারটার ঘণ্টা শুনলাম।

বক্সা ক্যাম্প

প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গতেই কানে এল "গান্ধীজীকি জয়"। ধ্বনিটা বহুদূর থেকে ভেসে আসছে। বিছানায় শুয়েই কান পেতে রইলাম বন্দেমাতরম্ ধ্বনি শোনার জন্যে। কিন্তু তা আর শুনলাম না। আল্লাহো আকবরও শুনলাম না। গোয়ালান্দ ঘাটের অভিজ্ঞতার পর তিন বছর কেটে গেছে। এ তিন বছর নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম, বাইরের কিছুই লক্ষ্য করিনি। বক্সা ক্যাম্পের সেই প্রথম প্রভাতে আল্লাহো-আকবর-বর্জিত 'গান্ধীজীকি জয়' ধ্বনি শুনে মনে হল,—তবে কি পুলিস কমিশনার চ্যাটার্জি সাহেবের উক্তিগুলির সত্যতা কিছু আছে?

উঠে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। তখনও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে মাঝে মাঝে ধ্বনি আসছে। সে দিকে তাকিয়ে দেখলাম অনেক গুলো বড় বড় দো-চালা ঘর দেখা যায়। পাহাড়ে জায়গায় সঠিক দূরত্ব নির্ণয় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় তবে অনুমান দু-তিন মাইল হবে। জায়গাটা আমার ক্যাম্প থেকে নীচু দিকে।

ধ্বনির গভীরতায় বুঝলাম বক্সায় সরকারী অসহ-যোগাশ্রমে বহু যোগী আছেন। আরও বুঝলাম এ সমস্ত যোগীদের ঘন ঘন গমনাগমনে বক্সা রোড স্টেশনে ভিড় থাকায় বিশেষ সম্মানিত আমাদের জন্যে জয়ন্তী স্টেশনে ব্যবস্থা হয়েছে কেন।

হাতমুখ ধুয়ে আমার আশ্রমটাও একবার ভাল করে দেখে নিলাম। একখানা তে-চালা খড়ের ঘরে দুটো কুঠরি, একটা আমার, অপরটি তালাবন্ধ অবস্থায় বোধহয় আর একজন ভয়ঙ্কর অতিথির অপেক্ষা করছে। বারান্দায় রান্নার ব্যবস্থা। পায়খানা, জলের কল, জলের বালতি, এলুমিনিয়মের বাসনপত্র, কাপড়, গামছা, দুটো জামা, কাপড়-কাচা সাবান, প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত জিনিসই আছে। এদিক থেকে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্য গভর্ণমেণ্ট তার এ একটা প্রমাণ।

ঘরের সম্মুখে ও পিছনে প্রায় দশ কাঠা ফাঁকা জমি। তার চারধারে সহরের ট্রেজারীর মত কাঁটাতারের বেড়া। এই বেড়ার আট-দশ ফুট দূরে প্রায় দশ ফুট উঁচু আর একটা কাঁটাতারের বেড়া বহু দূর চলে গিয়ে আরও কয়েকখানা ঘর ঘিরেছে। এক খানা ঘর থেকে আর এক খানা ঘর প্রায় তিন শ' গজ দূরে। এ ঘরের অধিবাসী যাতে ও ঘরের বাসিন্দা দেখতে না পায় তার জন্যে মধ্যে বাঁশের উঁচু পর্দা-বেড়া দেওয়া হয়েছে। প্রতি বাসার সম্মুখে ও পিছনে কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে কাঠের গুমটি ঘরে বসে এক একজন রাইফেলধারী সিপাই পালা করে রাত দিন খাইনি ডলে, আর মাঝে মাঝে 'রামা হো' গায়। মাঝে মাঝে পাহাড় থেকে বাঘ এসে এই সমস্ত রাইফেলধারী সিপাই দু' একটা নিয়ে যেয়ে সপরিবারে ভোজ লাগায়। ঘটনাটা প্রায়ই

ঘটত। কর্তারা বোধ হয় ব্যাপারটা বেমালুম চেপে যেতেন। আর তা না করেও বোধ হয় উপায় ছিল না, কারণ ঘটনা প্রকাশ হলে বক্সার আদিম অধিবাসী তৎকালে উদ্বাস্তু ব্যাঘ্র সমাজের মধ্যে মধ্যে একটু ভোজোৎসবের জন্যে খইনিওয়ালা রামভক্ত সিপাই পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বক্সায় ব্রিটিশ সৈন্যের একটা ঘাঁটি ছিল। সে ঘাঁটি যে কোথায় ছিল তা বুঝতে পারলাম না। বোধহয় তৎকালের কংগ্রেসী বন্দী শিবিরটাই সেই ঘাঁটি হবে।

প্রতিদিন মফিজুদ্দিন সাহেব দু-জন রাইফেলধারী সিপাই আর গুলিভরা রিভলভার হাতে এসে আমার বাসস্থান তল্লাশী করে যেতেন। সেই সময় আমার যা কিছু প্রয়োজন তা দেখে শুনে দেবার ব্যবস্থা করতেন। লোকটি বেশ ভদ্র, কিন্তু বড় ভীতু বলে মনে হত।

একদিন মফিজুদ্দিন সাহেব বললেন,—আপনি একমাসের বেশী হল ক্যাম্পে এসেছেন। এর মধ্যে একদিনও নতুন কিছু ফরমাশ করলেন না, বা কোনও বিষয়ে কোনও আপত্তিও তুললেন না। ও দিকে কংগ্রেসী ক্যাম্পে প্রতি দিন প্রত্যেকেব নতুন নতুন ফরমাশের ঠেলায় আমরা অস্থির হয়ে পড়েছি। আপত্তির তো অন্তই নেই। গত কাল মাছটা একটু নরম ছিল বলে রাত্রে খাওয়ার সময় গোলমাল বাধে। সংবাদ পেয়ে আমি উপস্থিত হাওয়ামাত্র একজন এক বাটি ঝোল আমার গায়ে ঢেলে দিলেন। আপনাদের শায়েস্তা করে রাখার জন্যে ঢালাও হুকুম আমাদের হাতে আছে। কিন্তু অহিংস কংগ্রেসীদের জন্যে সে-প্রকার কিছুই নেই। তাদের দুর্ব্যবহারের কথা উপরওয়ালাদের জানিয়ে কোনও ফল হয় না বরং তারা আমাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত লম্বা লম্বা অভিযোগ করে দরখাস্ত করে, তারই কৈফিয়ৎ দিতে হিম-সিম খেতে হয়। আপনাদের আটক রাখার জন্যে কত সতর্ক ব্যবস্থা। কংগ্রেসীদের বেলায় সে রকম কিছুই নেই। তাতেও ওরা একটাও পালায় না। গেরস্তের ছাড়া গরু যেমন জাব্না খাওয়ার সময় হলেই বাড়ি ফেরে, এরাও তেমনি গুণতির সময় হলেই সব হাজির। মাঝে মাঝে যদি দু-একটা পালাতো, তা হলে উপরে লেখালিখি করে হয়তো

একটু কড়া ব্যবস্থা করা যেত। তা একটাও পালায় না। এই বুড়ো বয়সে আর এ ঝামেলা সহ্য হচ্ছে না। ছুটির জন্যে দরখাস্ত করেছি, তু-মাস হতে চলল, কোনও সংবাদ নেই।

বৃদ্ধ ইনচার্জ অফিসারের কথায় বুঝলাম, সহিংস বিপ্লবীদের নিয়ে এই সমস্ত নীচের তলার অফিসারদের বিশেষ কোনও অসুবিধে নেই। প্রয়োজন হলে এঁরা বিপ্লবীদের কচুয়া ধোলাই করতে পারেন। বেসামাল হয়ে পড়েছেন এঁরা কংগ্রেসী অহিংসদের নিয়ে। অপর দিকে উপরতলার কর্তারা ঠিক এর বিপরীত অবস্থায় পড়ে আছেন।

কর্মহীন দিনগুলো কোনও প্রকারে কেটে যায়। তবে কি একেবারেই কাজ নেই? আছে বৈ কি, রাঁধা খাওয়া ঘুমপাড়া, ঘুমপাড়া রাঁধা খাওয়া, থোর-বড়ি-খাড়া,—খাড়া-বড়ি-থোর। এ প্রকার অবস্থায় পড়ে অনেকেই অনেক কিছু করেছেন। কেউ বই লিখে যশস্বী হয়েছেন, কেউ সাধন-ভজনে মন দিয়ে পরবর্তীকালে মহাপুরুষ হয়েছেন। আমার ও সব কিছু চিন্তাতেই আসত না, এলেও ও সমস্ত বিষয়ে কোনও যোগ্যতাও ছিল না। নিকটেই বিশাল হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে প্রথম দিনকতক বেশ ভালই লাগত, ক্রমে সেও একঘেয়ে হয়ে গেল। হিমালয় নিয়ে কল্পনার জাল বুনতে চাইতাম,—কত দেবতা, মুনি-ঋষি, রাক্ষস-খোক্কস, বাঘ-ভালুক ঐ হিমালয়ে বাস করে। তাদের বাসস্থান কেমন, খায় কি, কি করে, এই সব ভাবতে চাই, পারিনে, বিরক্তি আসে। সকাল-সন্ধ্যায় পাহাড়ে পাহাড়ে কত মেঘের জটলা। মেঘের ওপরে সূর্যকিরণ পড়ে কত রঙের খেলা। এ দেখে কত ভ্রমণকারী কত কবিতা লিখে ফেলেন। মাথায় কবিতা না গজালে প্রবন্ধ লিখে প্রিয়জনকে পাঠান। টাকা ও খুঁটোর জোর থাকলে সংবাদপত্র-পত্রিকাতেও সে লেখা ছাপা হয়ে বেরোয়। আমার মাথায় পদ্যের পুঁইশাক তো দূরের কথা, গদ্যের সজনে ডাঁটাও জন্মায় না। এর কারণ বোধ হয় বাল্যে খেলার সাথী সমবয়সী স্ত্রীটি আমার একেবারেই গদ্য-পদ্যের অতীত,—ভাত-ডাল-তরকারী—তরকারী-ডাল-ভাত। অধিকন্তু শিশুকাল থেকেই তুজনের সম্বন্ধ-জ্ঞান আর পনরোয়

পা দিয়েই বিয়ে হওয়ায়, কল্পনা-সুন্দরীর প্রেমে পড়ে রসিক-কবি হওয়ার সুযোগ পাইনি।

একদিন মফিজুদ্দিন সাহেবকে বললাম,—স্যার, আজ আমি কিছু ফরমাশ করতে চাই। আপনাদের আইনে যদি বাধা না থাকে তবে একটু শাক-সব্জির বাগান করার মত যন্ত্রপাতি ও কিছু বীজ পেলে বড়ই উপকৃত হব।

মফিজুদ্দিন সাহেব বললেন,—আচ্ছা, আমি উপরে লিখে চেষ্টা করব।

সপ্তাহ তিনেক পরে প্রয়োজনীয় সমস্তই পেলাম। চুক্তি থাকল, প্রতিদিন সূর্যাস্তের পূর্বে কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে যন্ত্রপাতি বাইরে ফেলে দিতে হবে এবং সেগুলো যখন আমার কাছে থাকবে তখন পাহারাওয়ালা সিপাই যেন সব সময় সেগুলো দেখতে পায়।

মাস খানেকের মধ্যেই যখন কনকা শাক আর কুমড়ো গাছে উঠান ভরে উঠছে, তখন একদিন মফিজুদ্দিন সাহেব লোকজন নিয়ে এসে আমার পাশের কুঠরি খুলে সমস্ত ঠিক করতে আরম্ভ করলেন। জিজ্ঞাসা করে শুনলাম,—দু-একদিনের মধ্যেই আর একজন আসছেন।

সংবাদটায় ভয়ানক রকমের খুশি হলাম। প্রশ্ন করলাম,—কে আসছেন? কোথা হতে আসছেন? তাঁর নাম কি?

সাহেব আমার মনের অবস্থা বুঝে হেসে উত্তর দিলেন,—আপনার এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না। তবে তিনি যেদিন আসবেন, সেদিন আপনাকেই তাঁর অভ্যর্থনার ভার নিতে হবে। আগামীকাল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আপনাকে দিয়ে যাব।

সঙ্গী পেলাম

বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলেন,—'সৃষ্টির প্রারম্ভে একটি মাত্র আত্মা ছিলেন। তিনি চারিদিকে চেয়ে দেখলেন,—আর কেউ নেই। তিনি একাকা সুখী হতে পারলেন না। একাকী সুখী হওয়া যায় না। তিনি দ্বিতীয় সঙ্গী চাইলেন।'

এই শ্রুতিবাক্য যে কত বড় সত্য, জীবমাত্রেই অন্তত একটা সঙ্গী পাবার জন্যে যে কতখানি ব্যাকুল, তা বক্‌সা ক্যাম্পে আমার মত অবস্থায় না পড়লে কেউ ধারণা করতে পারে না।

কোনও এক পত্রিকায় পড়েছিলাম, আমেরিকায় একজাতীয় পাখি লোপ পেয়ে মাত্র একটা অবশিষ্ট ছিল। সে পাখিটা সারারাত ঘুমাত না, গাছের ডালে বসে করুণ কণ্ঠে ডাকত। তার একটা সঙ্গী খুঁজে দেবার জন্যে আমেরিকান সরকার কয়েক লক্ষ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন।

অবস্থাগতিকে সঙ্গী পাওয়ার আশা ছেড়েছিলাম। হঠাৎ সঙ্গী-আগমনের কথায় আনন্দের আতিশয্যে পরদিন নিজেই ঘরখানা পরিষ্কার করলাম। মাচার ওপরে কম্বল বিছিয়ে বিছানা করলাম। সন্ধ্যার পূর্বেই রান্না শেষ করে বালতিতে স্নানের জল ধরে রেখে পথের দিকে তাকিয়ে বসে দূরে থানার ঘণ্টা শুনে কটা বাজে গুণতে লাগলাম।

সাতটা বাজলে আর বসে থাকতে পারলাম না, উঠে একবার কাঁটাতারের বেড়ার দরজায় যাই আবার ঘুরে আসি। ক্রমে আটটার ঘণ্টা পড়ল, উৎকণ্ঠা চরম সীমায় উঠল। বেড়ার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দূরে তাঁকে দেখা যায় কিনা তার জন্যে অন্ধকারে চোখের সার্চলাইট ফেলতে লাগলাম। সে সার্চলাইটে ন'টা পর্যন্ত কিছুই প্রকাশ পেল না।

এক দুই করে ঘড়িতে ন'টা ঘা পড়ল, সাথে সাথে আমার আশার জোয়ারে হতাশার ভাটা দেখা দিল। আজ আর এলেন না, কাল আসবেন।

পরদিন আবার রান্না করে স্নানের জল ধরে রেখে পথের দিকে তাকিয়ে রাত্রি নটা বাজালাম। এমনি করে চারদিন গেল। প্রভাতে উঠে মনে করি,—আজ তিনি নিশ্চয়ই আসবেন, রাত ন'টায় হতাশায় ভেঙ্গে পড়ি। মফিজুদ্দিন সাহেব এলে জিজ্ঞাসা করি,—আজ তিনি আসবেন কিনা। সাহেব কিছুই বলতে পারেন না।

পঞ্চম দিনে প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গতেই মন হতাশায় ভরে গেল। বোধ

হয় এ ক্যাম্পে তাঁর আসা হল না। কোনও কিছুই ভাল লাগে না। দুপুরে চিড়ে ভিজিয়ে খেলাম। বেলা চারটে বাজতেই মনে হল যদি সত্যই তিনি আজ আসেন! দুজনের মত রান্না করলাম, স্নানের জল ধরলাম, তারপর বিছানা ঝেড়ে পেতে রেখে বাইরে এসে বসলাম।

হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে আছি, দেখছি সূর্যদেব দিনের শেষে অস্ত যাওয়ার পথে তাঁর সারাদিনের সঙ্গীদের নিকটে কেমন করে বিদায় নিচ্ছেন।

সূর্যদেব চলে যাচ্ছেন, রাত্রি বুড়ি আসছে। মেঘেরা ভয়ে মলিন হয়ে পড়েছে। একখানা মেঘ আরও কিছুকাল সূর্যদেবকে দেখার জন্যে তাড়াতাড়ি বড় পাহাড়টার মাথায় উঠছে। ছোট ছোট পাহাড় কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোবার যোগাড় করছে। সূর্যদেব বিদায় বেলায় শেষবারের মত আদর করে বড় পাহাড় আর উচু মেঘের গায় হাত বুলোচ্ছেন। সে আদরে কি আনন্দ! কত ভাবের, কত রঙের খেলা চলছে মেঘের গায়, পাহাড়ের মুখে।

সকলেই চায় সঙ্গী-সাথী। সঙ্গী সাথীর সাথে মিলনে আনন্দ, বিচ্ছেদে দুঃখ। এই মিলন-বিচ্ছেদ, আনন্দ-দুঃখ নিয়েই রস। জগতে কতই না ঝগড়াবিবাদ, মারামারি, হানাহানি। তবুও আমরা সকলেই সামাজিক মানুষ। আমরা ভাল যদি নাই বা হতে পারি, মন্দ হওয়ার জন্যেই সমাজ চাই, সঙ্গী চাই, সাথী চাই। ভাল যদি নাই বাসতে পারি, ঝগড়া করার জন্যেই সমাজ চাই, সঙ্গী চাই, সাথী চাই। ভাল-মন্দ, ভালবাসা-ঝগড়ার বাইরে যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা এ-জগতে নেই, সাধারণ মানুষের তাতে আগ্রহও নেই। কদিন যাবৎ যা কিছু দেখছি, যা কিছু ভাবি সব বিষয়ের মধ্যেই যেন একই সুর, সঙ্গী চাই, সাথী চাই।

হঠাৎ কানে এল,—কি ভাবছেন বসে? এই দেখুন, আপনার সঙ্গী এসেছেন।

চমকে উঠে দাঁড়ালাম। এগিয়ে গেলাম বদ্ধ দরজার দিকে। দু-দুটো তারের বেড়ার বাইরে সেই আলো-আঁধারে দেখলাম, আমার

সঙ্গী এসেছেন। সঙ্গী দাঁড়িয়ে আছেন আমার থেকে বিশ হাত দূরে। সুদৃঢ় কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করে তাঁর নিকটে যাওয়ার অধিকার আমার নেই। সে বেড়া ভেদ করে এসে বন্দীত্ব গ্রহণ করে তিনিই আমার সঙ্গী হবেন।

অনেকের নিকটে শুনেছি, নিজেও বহুবার অনুভব করেছি, কোনও কোনও লোক প্রথম দেখার সাথে সাথে আপনজন বলে মনে হয়। আবার এমন লোক আছে, যাকে প্রথম দেখার সাথে সাথেই মন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। এর কারণ যে কি, তা এ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারিনি। জন্মান্তরবাদী পণ্ডিতেরা বলেন, ওটা জন্মান্তরীণ সংস্কার। কিন্তু তাঁদের কথা তো আর বর্তমান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতসমাজ স্বীকার করতে পারেন না।

এই নবাগতকে দেখার সাথে সাথেই মনে হল, সত্যই আমার সঙ্গী এসেছেন, কেবল সঙ্গীই নন, আরও কিছু ; আমার আপনজন, আমাকে অনেক কিছু দিতে এসেছেন।

মফিজুদ্দিন সাহেব পর পর দুটো কাঁটাতারের দরজা খুলে সদলবলে ক্যাম্পে প্রবেশ করলেন। আমি কোনও কথা বললাম না, বলার মতও কিছু তখন ছিল না। নির্দিষ্ট ঘরের দরজা খুলে দিয়ে হারিকেন ধরানর ছলে আমার ঘরে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আগন্তুক ফর্সা রং, মাথায় লম্বা চুল, দাড়ি-গোঁফ কামানো, ভাল স্বাস্থ্য, শরীর অনুপাতে একটু বেঁটে, পরনে গেরুয়া কাপড় আর পাঞ্জাবি, গলায় মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চান্নের মধ্যে।

হাতে পায়ের কড়া-বেড়ী খুলে দিয়ে মফিজুদ্দিন সাহেব আমাকে উদ্দেশ্য করে তাঁকে বললেন,—আপনারা দুজনে একসাথে থাকবেন। আপাতত যা কিছু প্রয়োজন তা আপনার সঙ্গীর নিকটে পাবেন। আর যা প্রয়োজন তা আমাকে জানাবেন। আইনের বাধা না থাকলে ও সম্ভব হলে আমি দিতে চেষ্টা করব।

ইনচার্জ অফিসার সদলবলে চলে গেলে আমি লণ্ঠন হাতে তাঁর ঘরে গেলাম। লণ্ঠনটা যথাস্থানে রেখে মাটির দিকে নত দৃষ্টিতে সম্মুখে

দাঁড়িয়ে বেশ বুঝলাম, তিনি বেশ কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাকে দেখছেন। কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে বলে উঠলেন,—আরে, তুমি না একেবারে ছেলে-মানুষ, গো-বেচারী! তুমি এপথে এলে কি করে? এ পথ তো তোমার মত দুর্বল মানুষের নয়!

মনে বড় অভিমান হল, কথার কোনও উত্তর দিলাম না। বললাম, —স্নান যদি করেন জল ধরে রেখেছি। রান্নাও হয়েছে।

আগন্তুক হেসে বললেন,—কবে থেকে তোমাকে আমার চাকরিতে বহাল করেছি তা তো মনে পড়ছে না। যাই হোক এর জন্যেই আমি তোমাকে মাইনে দেব, তবে সেটা টাকায় নয়।

এ কথারও কোনও উত্তর দিলাম না। আমাকে নিরুত্তর দেখে তিনি আবার বললেন,—তুমি একটি 'গোপাল অতি সুবোধ বালক।' আজকের মত তোমার তোলা জলে স্নান করে তোমার রান্নাই খাব। কাল হতে সমস্ত কাজ যদি ভাগে করতে রাজী হও, তবে তোমার চাকরি থাকবে। কাজ ভাগকরা আর হুকুম চালানর ভার আমার থাকবে, নচেৎ পোষাবে না।

এবার আমি হেসে ফেললাম। বললাম,—প্রকৃত হুকুম চালানর ভার কেউ পরামর্শ করে নিতেও পারে না, দিতেও পারে না। কিন্তু এখন এসব কথা থাক। তিরিশ ঘণ্টার মধ্যে বোধহয় পেটে ভাত পড়েনি। এখন স্নান করে খেয়ে নিন। আমারও খিদে পেয়েছে।

রান্না কি দুজনের জন্যেই করেছ, না তেমারটাই খেতে হবে?

আজ পাঁচদিন যাবৎ বিকেলে দুজনের রান্না করা থাকে।

কথাটা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। আর কিছু না বলে স্নান করে খেতে বসলেন। আমিও খেতে বসলাম। খাওয়া যখন শেষ হয়ে এসেছে তখন তিনিই নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন,—তোমার সাথে কাজ ভাগ করে নিতে চেয়েছি বটে, কিন্তু এখন দেখছি রান্না নিয়ে ভাগাভাগি করলে দু-পক্ষেরই ঠকা হবে। আমার রান্না তোমার গলা দিয়ে যদিই বা নামে পেট বিদ্রোহ করবে। তোমার উপাধি শুনে জাতটা তো ধরতে পারলাম না?

আমি হেসে বললাম,—এখন আর ও ধরাধরিতে কি লাভ হবে? আপনি তো আমার রান্না ভাত খেয়েই ফেলেছেন। এতে যদি আপনার জাতটা পাকা আমের মত সমাজের বোঁটা থেকে খসে যেয়েই থাকে তবে না হয় পরে প্রায়শ্চিত্তের মোক্ষম সুতো দিয়ে সমাজের ডালে বেঁধে রাখবেন, অবশ্য তাও যতদিন না পচে।

দাদা গম্ভীর মুখে বললেন,—তোমরা জাত বলতে যা বোঝ, তা আমার বহুপূর্বেই চলে গিয়েছে। আমি জাতি বলতে যা বুঝি, তা অন্য ব্যাপার। সে জাতি, জাতিভেদ প্রথা ও তার প্রবর্তক মনীষীদের আমি গভীর শ্রদ্ধা করি। তোমার জাতটা জানতে কৌতূহল হল তোমার রান্না খেয়ে। আমি বহু দেশে বহু জাতের রান্না খেয়েছি। তাতে লক্ষ্য করেছি বাঙ্গালীর ঘরে সদাচারনিষ্ঠ মেয়েরা বনের ঘাস, লতা-পাতা কুড়িয়ে এনে এমন সুখাদ্য রান্না করতে পারে, যার তুলনা অন্যত্র বড়লোকের ডিনার টেবিলেও মেলে না। তুমি বোধ হয় তোমার মায়ের কাছে রান্না শিখেছ?

না, মায়ের নিকটে রান্না শেখার সুযোগ আমার হয়নি। আমি রান্না শিখেছি আমার প্রয়োজনের নিকটে। যাই হোক আপনার মূল প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি, আমি ব্রাহ্মণ, একদম রাঢ়ীশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ।

এরপরে খাওয়া শেষ করে হাতমুখ ধুয়ে ঘরে যাওয়ার সময় দাদা আদেশের সুরে আমাকে বললেন,—তুমি হাতমুখ ধুয়ে আমার কাছে এসে বস। এঁটো বাসনপত্র যেমন আছে তেমনি থাক। আমাদের রাইফেলধারী পাহারাওয়ালা আছে।

আজ্ঞে, যদি রাইফেলওয়ালাটাকে বাঘে নিয়ে না যায়।

বল কি! এখানে রাইফেলধারী সিপাই বাঘে নিয়ে যায়?

হাঁ, ওঁরা রাজকীয় বঙ্গ-ব্যাঘ্র কিনা, তাই বোধ হয় রাজপুরুষই ওঁদের প্রিয়।

তুমি কোনও সিপাইকে বাঘে ধরতে দেখেছ?

হাঁ, দেখেছি। এই মাস দুই হল বেলা দুটো-আড়াইটের মধ্যে ঐ সম্মুখের গুমটির ভিতর থেকে একটা নিয়ে গিয়েছেন।

কেমন করে নিয়ে গেল ?

বেশ রাজকীয় চালে ধীরে সুস্থে এসে গুমটির মধ্যে ঢুকলেন। তারপর যখন বেরিয়ে এলেন তখন দেখলাম তার পিঠের ওপরে দেহের অর্ধেকটা চাপিয়ে মুখের সাথে ঝুলতে ঝুলতে রাইফেলওয়ালা চলেছে তাঁর সাথে।

তুমি চেঁচালে না ?

আজ্ঞে ওঁর শ্রীমূর্তি-দর্শনানন্দে বোধ হয় ঘন্টাখানেক আমার চক্ষু স্থির হয়ে ছিল। আর এই সব রাজকীয় ব্যাপারে নাক গলানও তো অনধিকার চর্চা। দেখছেন না, অনধিকার চর্চা থেকে আমাদের সরিয়ে রাখার জন্যে বহু অর্থব্যয়ে দু-প্রস্থ কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে, রেল স্টেশনও পৃথক।

সিপাইটার কাছে তো রাইফেল ছিল, তা সত্বেও সে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল না !

সে চেষ্টা সে করেছিল কিনা তা বলতে পারিনে, কারণ গুমটির ভিতরটা এখান থেকে দেখা যায় না। তবে মনে হয় কোনও চেষ্টাই করেনি, কারণ এখান থেকেই শুনতে পাই প্রায় সব সময়ই গুমটির ভিতরে নাক ডাকে।

আ-হাঃ, গরিব বেচারী ! মাসে মাত্র আঠারটা টাকার জন্যে এই বিদেশে বেঘোরে বাঘের মুখে প্রাণ দিল। ওর বাড়িতে মা বউ যারা আছে, তারা হয়তো মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কিছুই জানতে পাবে না। তাদের হয়তো শুনানো হবে কলেরায় মরেছে। ক্ষতিপূরণও কিছু দেবে না। যাক, তুমি হাতমুখ ধুয়ে আমার ঘরে এস।

তাঁর আদেশমত কাছে গিয়ে বসলাম। তিনি বললেন,—এইবার তোমার সমস্ত কথা খুলে বল। অবশ্য যে সমস্ত কথা বলতে পার্টির নিষেধ আছে তা বাদ দিয়েই বলবে। আমি বিশেষ করে শুনতে চাই তোমার পারিবারিক অবস্থা।

আমি সমস্ত কথাই বললাম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে সব শুনে শেষে প্রশ্ন করলেন,—তোমার স্ত্রীর বয়স কত ?

সে আমার ছ-মাসের ছোট।

অ্যাঃ বল কি! সেও কি তবে বিপ্লবী?

মোটেই না। বিপ্লব কি, কিসের জন্যে বিপ্লব, তা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না।

তবে এ যুগে এ প্রকার বিয়ে কি করে সম্ভব হল?

সে আমার শিশুকালের বাগদত্তা, বাল্যে খেলার সাথী। চোদ্দ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে।

দেখলাম আমার কথায় দাদার মুখে-চোখে একটা অপূর্ব বেদনার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ নীরব থেকে প্রশ্ন করলেন,—

কত বছর বয়সে বিপ্লবী দলের সাথে পরিচিত হয়েছ?

পনরো বছর বয়সে।

কে তোমাকে প্রথম পরিচয় করিয়েছিলেন?

মহানির্বাণ মঠের মহানন্দ ব্রহ্মচারী।

মহানন্দ ব্রহ্মচারী তোমার মত ছেলেকে বিপ্লবীদলে ভরতি করলেন কেন?

আমার বন্দুকের হাত ভাল সই ছিল বলে।

সে কথা তিনি জানলেন কি করে?

ম্যাজিষ্ট্রেট অ্যালফ্রেড বোসের মুখে শুনেছিলেন।

অ্যালফ্রেড বোসের সাথে তোমার পরিচয় হল কি করে, আর অত ছেলেবেলায় বন্দুকে হাত পাকালে কি করে—সব খুলে বল।

আমি সংক্ষেপে সমস্তই বললাম,—

তখন আমার বয়স চোদ্দ বছর। সময়টা ছিল কার্তিক মাসের প্রথম। আমাদের ও অঞ্চলে ওটা বঁড়শি দিয়ে কইমাছ ধরার সময়। বঁড়শির টোপ বোলতা-ডিমের চাক ভাঙ্গার জন্যে যাচ্ছিলাম বাগচি বাড়ির বেতবনে। যাওয়ার পথে দেখলাম গোয়ালন্দ মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট অ্যালফ্রেড বোস সাহেব কি একটা তদন্তের জন্যে সদলে মজুমদার বাড়ির বৈঠকখানায় বসে আছেন। ইংরেজ আমলে বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটলে জেলার বড় কর্তারা নিজে ঘটনাস্থলে যেয়ে সরেজমীন তদন্ত করতেন।

মজুমদার বাড়ি ছেড়ে বাগচি বাড়ি যেতে পথের মাঝে একটা খালের মত ছিল। সেই খালের ওপরে প্রায় পঞ্চাশ গজ লম্বা একটা একবাঁশের সাঁকো, সাঁকোর নীচে তখন হাঁটু জল হলেও তার দুধারে ছিল গভীর জল আর ঘন বেতবন। সেই বেতবনে খুঁজেপেতে একখানা বোলতা-চাক ভেঙ্গে আরও পাওয়া যায় কিনা দেখছি। এমন সময় সাঁকোর দিক থেকে একটা হল্লা কানে এল। ব্যাপার কি দেখার জন্যে ছুটে গেলাম।

এস, ডি, ও, বোস সাহেব কাজ সেরে, সদলবলে ফেরার পথে সাঁকোর কাছে এসে একবাঁশের সাঁকোয় উঠতে ভরসা পাননি, চৌকিদার ভাদু ভুঁইমালীর কাঁধে উঠে জলটা পার হচ্ছিলেন। বুদ্ধিমান ভাদু মাঝামাঝি এসে বোস সাহেবকে গভীর জলে বেতবনে ফেলে দিয়ে সাঁকোর নীচের হাঁটু জলে ডুব দিয়ে উঠেছে। গোটা দশেক বেতের শীষ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে জড়িয়ে ধরেছে। প্রথম দিকে নিজেই উঠতে চেষ্টা করে জড়িয়েছেন একটু বেকায়দা রকমের। চৌকিদার-দফাদারগুলো খাবলাখাবলি করে সাহেবের অবস্থা আরও সঙ্গীন করে ফেলেছে। পশ্চিমা কনষ্টেবল দুটো ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে হাউমাউ করছে। দারোগা সাহেব সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে হাঁ করে আছেন।

এক নজর দেখে নিয়ে জলে নেমে পড়লাম। বোলতার চাক ভাঙ্গার কাস্তে আর সাঁকোর তিনখানা বাঁশের সাহায্যে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বেতবন হতে উদ্ধার পেয়ে ডাঙ্গায় এসে আমার নাম, কোন স্কুলে পড়ি সব জেনে নিয়ে গেলেন। সরস্বতী পূজার পর স্কুলে পুরস্কার-বিতরণী সভার সভাপতিত্ব করতে এসে আমাকে একখানা ভাল 'রবিনসন ক্রুসো' বই দিয়েছিলেন।

আমাদের বাড়িতে একটা একনলা কারট্রিজ বন্দুক ছিল। বন্দুকের কারট্রিজ তৈরী করার যন্ত্রও ছিল। লোহার জালের কাঠি দিয়ে বুলেট তৈরী করে ছেলেবেলায়ই হাত সই করতাম। পনরো বছর বয়সেই আমার হাত বেশ সই হয়ে যায়। তের বছর বয়সে শেষ

অভিভাবক জেঠামশাই মারা গেলে বন্দুকটা মামার নামে লাইসেন্স করা হয়। দু-বছর পরে মামা চাকরি পেয়ে ডিব্রুগড় যাওয়ার সময় বন্দুকটা থানায় জমা দিয়ে যান।

বন্দুকটার ওপরে আমার ভয়ানক ঝোঁক ছিল। কোনও প্রকারে আমাদের গোমস্তার নামে লাইসেন্স করে বন্দুকটা রাখা যায় কিনা সেই চেষ্টা করতে গেলাম একদিন গোয়ালন্দ মহকুমার সদর রাজবাড়ি এস, ডি, ও. অ্যালফ্রেড বোস সাহেবের বাংলোয়।

বোস সাহেব আমার আবেদন পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—খোকা, তুমি বন্দুক দিয়ে কি করবে?

আমাদের ধানের ক্ষেতে শুয়োর লাগে। শুয়োর মারব।

তুমি বন্দুক চালাতে পার?

হ্যাঁ, পারি। আপনার গাছে ঐ যে এক বোঁটায় দুটো আম ঝুলছে, ওর নীচেরটা বুলেট মেরে পেড়ে দিতে পারি। তাতে দুটো আমের একটাও জখম হবে না।

সাহেব উঠে যেয়ে তাঁর বন্দুক আর একটা বুলেট এনে দিলেন। আমি আমার কথামত আমটা পেড়ে দিলাম। সাহেব খুশি হয়ে পিঠ চাপড়িয়ে বললেন,—বাহাদুর ছেলে! আমি তোমার বন্দুকের জন্যে চেষ্টা করব।

চেষ্টা তিনি সত্যিই করেছিলেন। কিন্তু আমার সেই বাহাদুরীই তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে আমার ওপরে সি, আই, ডি, বিভাগের শ্যেনদৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আমার এত সাধের বন্দুকটা নীলামে পনরো টাকায় বিক্রী হয়ে গেল। মনিঅর্ডারে টাকা কটা পেয়ে কেঁদে ফেলেছিলাম।

এর কিছুদিন পরে পাংসা কানাইলাল দত্ত ডাক্তারের বাড়িতে মহানির্বাণ মঠের মহানন্দ ব্রহ্মচারীর সাথে আমার দেখা হয়। অ্যালফ্রেড বোসমশায়ের সাথে ব্রহ্মচারীর পরিচয় ছিল। বোসমশায়ের মুখে তিনি আমার কথা শুনেছিলেন। আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক কানাইবাবুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্রহ্মচারীমশাই আমাকে বিপ্লবীদলের সাথে পরিচয় করে দেন।

আমার কথা শেষ হলে দাদা বললেন,—যাও এখন ঘুমাও গিয়ে। হ্যাঁ, আমার পরিচয়টাও তোমাকে বলি। আমার নাম কালীশঙ্কর ব্রহ্মচারী বলেই জানবে। জন্ম এই বাংলাদেশেই কোনও ভট্টাচার্য বংশে। এই টুকুই এখন জেনে রাখ। তুমি কালীদা, শঙ্করদা, ব্রহ্মচারীদা- যা খুশি বলে ডাকলেই সাড়া পাবে। এখন যাও, রাত্রি অনেক হয়েছে। কাল ভোরে উঠবে।

মফিজুদ্দিন সাহেবের ছুটি

পরদিন প্রভাতে উঠে দেখি আমার কনকা শাকের ক্ষেতের মধ্যে মন দুই ওজনের যে কাঠের গুঁড়িটা ছিল, দাদা সেটা সরিয়ে একপাশে রেখে ক্ষেতের ঘাস তুলছেন। ঐ কাঠ সরানোর ব্যাপারে তাঁর শারীরিক শক্তির যে পরিচয় পেলাম, তাতে গতরাত্রে আমাকে দুর্বল বলায় মনে যে ক্ষোভ জমেছিল তা মুছে গেল।

দাদা আমাকে দেখে বললেন,—আরও ভোরে ওঠা অভ্যাস করতে হবে। রাত দশটার মধ্যে শোবে, আর ভোর চারটে বাজলেই উঠবে। তোমাকে আমি কিছু পড়াব মনে করেছি। আজই ইনচার্জ অফিসারকে বলে প্রয়োজনীয় বই, কাগজ, কলম আর কখানা সংবাদপত্র আনার ব্যবস্থা করতে হবে। এখন হাতমুখ ধুয়ে কিছুক্ষণ ব্যায়াম কর। তারপর স্নান, সন্ধ্যা আহ্নিক সেরে জলখাবার আর চা কর। অপর সমস্ত কাজ আমি করব। দুজনের কাপড় কাচা, বাসন মাজা, ঘর সাফ করা এ সমস্ত কাজ আমি করব, এতে তুমি হাত দেবে না।

বক্তৃতা করা ও গান গাওয়ার ক্ষমতা যেমন ভগবানের দান, তেমনি অপরের ওপরে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতাও ভগবানের দান। স্বজন, আশ্রিত, বেতনভোগী ভৃত্য, এরা কর্তার ইচ্ছানুযায়ী চলে। সে ক্ষেত্রে প্রায়ই ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু এমন লোকও আছেন, যাঁর আদেশ পালন করতে চেনা, জানা, বিচার, বিবেচনা, কিছুরই প্রয়োজন

বোধ হয় না। অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, এ প্রকার ব্যক্তি দৃঢ়চরিত্র, আত্মত্যাগী, পরোপকারী, স্বার্থবোধশূন্য, দেশপ্রেমিক। এঁরাই দেশের, জাতির প্রকৃত নেতা হন। সকলেই নির্বিচারে তাঁর আদেশ পালন করে স্বদেশকে করে সমৃদ্ধ, জাতিকে করে উন্নত, গৌরবান্বিত। পরাধীন লাঞ্ছিত জাতির মুক্তির জন্যে এই প্রকার নেতারই প্রয়োজন, তা তাঁকে আধুনিক ভাষায় ডিক্টেটর বলে যতই গালাগালি দেওয়া হোক না কেন।

আমার মনে হয় এই কালীশঙ্কর ব্রহ্মচারীও সেই শ্রেণীর মানুষ। প্রথম দেখা হওয়ার সাথে সাথেই তিনি আমার অভিভাবক হয়ে গেলেন, আমার দিক থেকে কোনও কথাই উঠল না। সমস্ত ভাল-মন্দ, কর্তব্য-অকর্তব্যের ভার তাঁর হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি কেবল আদেশ পালন করেই নিশ্চিন্ত ও সুখী।

দাদার নির্দেশমত সমস্ত করলাম। এমন কি প্রায় ভুলে যাওয়া সন্ধ্যাটাও করতে হল। যে মন্ত্রগুলি একেবারেই ভুলেছিলাম সেগুলি দাদা লিখে দিলেন, একদিনের মধ্যে সব মুখস্থও করতে হয়েছিল। সন্ধ্যা-আহ্নিক করে খাবার ও চা তৈরী করতে বসলে দাদাও কাছে এসে বসলেন।

আমি বললাম,—আপনি যে আমাকে পড়াতে চাচ্ছেন, আমি যদি এম, এ, পড়তে চাই, আপনি পড়াবেন?

দাদা উত্তর দিলেন,—তোমার দিক থেকে এ প্রশ্ন উঠে না। তুমি বি, এ, পাশ করনি। তবে আমরা দুজনে একত্রে যদি তিন-চার বছর থাকতে পারি তবে তোমাকে এম, এ, পাশ করাতে পারতাম। তবে তা সম্ভব হবে না। কারণ ও লাইনে পড়া তোমার ভাগ্যে আর নেই। তোমার সম্মুখের যাত্রাপথ অতি বিচিত্র। সে পথ এমনই পরিবর্তনশীল যে, তাতে যেটা ছেড়ে যাবে তার সাথে যেটা গ্রহণ করবে তার কোনও মিল থাকবে না। আমি এমন কিছু তোমাকে পড়াব, যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

আপনি জ্যোতিষী না কি?

যে বলে আমি জ্যোতিষী, সে বোধহয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের সম্যক পরিচয়ই পায়নি। আমি ও শাস্ত্রটা কিছু পড়েছি। তোমাকেও কিছু পড়াব। তোমার জীবনে এমন একটা সময় আসবে যখন ও বিদ্যাটা কিছুদিনের জন্যে কাজে লাগবে।

আপনি আমার কোষ্ঠীও দেখেননি, হাতও দেখেননি। অথচ আমার ভবিষ্যৎ বলতে আরম্ভ করেছেন! আপনি কাকচরিত্র জানেন নাকি?

কাকচরিত্র জ্যোতিষ কেমন, তা আমি জানি নে। সাধারণত লোকে যে বিদ্যে দেখে কাকচরিত্র বলে, অর্থাৎ জ্যোতিষীর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ামাত্র তার নাম-ধাম, গত জীবনের ঘটনা, কি জন্যে এসেছে, ইত্যাদি হড়্‌হড়্‌ করে জ্যোতিষী বলে যান, সে বিদ্যে কাক-চরিত্রও নয়, জ্যোতিষও নয়। ওটা হঠযোগের ক্ষুদ্র একটা সাধনমাত্র, যাকে 'মনঃ-সমীক্ষা' বলে। ইংরেজীতে ওকে বলে থট্‌ রীডিং। ও বিদ্যায় যা তোমার মনে আছে তাই বলা যায়, যা তোমার মনে নেই তা বলা যায় না, ভবিষ্যৎও বলা যায় না। আমি তোমার সম্বন্ধে যা বলছি তা তোমার মাথা, কপাল, হাত দেখেই বলছি।

আপনি আমাকে থট্‌ রীডিং শিখাবেন?

না, ও বিদ্যে যার জানা আছে সে সংসারে সুখী হতে পারে না। আমাদের মনের কথা যার যার অন্তরে ভগবান গোপন করে রেখেছেন বলে আত্মীয়স্বজন নিয়ে একত্রে বাস করতে পারি। নচেৎ মানব-সমাজ ধ্বংস হয়ে যেত। লক্ষ্য করে দেখো, যারা ভাল থট্‌ রীডিং জানে তারা শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসী হয়, অথবা ঘোর নেশাখোর হয়ে সব ভুলতে চায়।

চা খাওয়া শেষ হতেই মফিজুদ্দিন সাহেব নিয়মিত খানাতল্লাসীর জন্যে এলেন। দাদা নিয়মমাফিক আবেদন পত্র তাঁর হাতে দিলেন। তাতে থাকল, ইংলিশম্যান ও স্টেট্‌সম্যান দুখানা সংবাদ-পত্র, দর্শন, উপনিষদ, জ্যোতিষ প্রভৃতি অনেকগুলো বইয়ের তালিকা।

মফিজুদ্দিন সাহেব ফর্দটা দেখে হাসি মুখে বললেন,—আপনি তা-

হলে একজন বড় জ্যোতিষী। দয়া করে আমার হাতটা দেখে বলুন তো, আমার বরাতে এ দুর্ভোগ আর কতকাল আছে?

দাদা বললেন, আপনাদের আবার দুর্ভোগ কিসে হল?

বলেন কি ঠাকুর মশাই! গান্ধীজীর মাথা থেকে এই যে এক অদ্ভুত আন্দোলন বেরিয়েছে, এর অহিংস নামটা শুনে ওপর তলার বড় কর্তারা বেশ নিশ্চিন্ত আছেন। বিপদ হয়েছে আমাদের, বিশেষ করে এই আমাদের শ্রেণীর অফিসারদের। থানা পুলিসের ঝামেলা দশে পাঁচে একদিন, আমাদের হয়েছে নিত্য ব্যাপার। এই কংগ্রেসীরা মারামারিও করবে না, আমাদের নিয়ম-কানুন মেনেও চলবে না। যদি জোর করে নিয়ম-কানুন মানাতে যাই, তবে অনশন-সত্যাগ্রহ আরম্ভ করবে। সাথে সাথে আপনাদের সংবাদ-পত্রগুলো বড় বড় হেডিং দিয়ে ছাপাবে, 'অহিংস সত্যাগ্রহী কংগ্রেসীদের উপরে অমানুষিক অত্যাচার। সুসভ্য ইংরেজ সরকারের বন্দীশালায় অহিংস নিরীহ কংগ্রেসী বন্দীদের প্রতি বর্বর ব্যবহার!' তারপরই সুসভ্য ইংরেজ বড় কর্তারা আমাদের কৈফিয়তের ওপর কৈফিয়ৎ তলব করে পাগল করে তোলেন। যদি এ প্রকার আরও কিছুকাল চলে তবে বড় কর্তাদের মোহ-ভঙ্গের জন্যে হয়তো আমাদেরই নন্-কোঅপারেশন সত্যাগ্রহ করতে হবে।

আপনি কি জানতে চান?

আমি ছুটির জন্যে দরখাস্ত করেছি। দেখুন তো সেটার কি হবে?

আপনি অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ছুটি পাবেন। সেই ছুটিই আপনার চাকরিরও ছুটি বলে মনে হচ্ছে।

আল্লার দোয়ায় যেন তাই হয় ঠাকুরমশাই। আমার পেনসন হতে আর এক বছর বাকী আছে। একবার তিন মাসের ছুটি পেলেই ও ন'মাস একপ্রকারে কাটিয়ে পেনসন নেব। আর এ ঝামেলায় আসছিনে। ঠাকুরমশাই, আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন শেষ জীবনটা নিশ্চিন্তে শান্তিতে কাটাতে পারি।

শুনে দাদা মৃদু হাসলেন। মফিজুদ্দিন সাহেব বেশ খুশি মনে চলে গেলেন।

দু-সপ্তাহের মধ্যেই বই, কাগজ অনেকগুল এসে গেল। আমার পড়াশুনাও নিয়মিত ভাবে চলল।

• দাদা আসার পর হতেই আমার কাজ একমাত্র রান্নার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়েছে। আমার জামাকাপড়ও দাদা কাচেন। দিন বেশ আনন্দেই কাটে। আমি যে বন্দী, তা প্রায় মনেই পড়ত না। মধ্যে মধ্যে বাড়ির কথা মনে পড়ে একটু ব্যাকুল যে না হতাম তা নয়। সে ব্যাকুলতার মূল কারণটা বুঝে দাদা একদিন সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,—

একটা প্রচলিত কথা আছে, 'মুখ দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।' এজন্যে তুমি ভেব না। দারিদ্র্য দু-প্রকার, পাপজ দারিদ্র্য, আর ভগবানের দান দারিদ্র্য। পাপজ দারিদ্র্য মানুষকে করে হিংস্র নরপিশাচ, অথবা উদ্যমহীন অলস। সে নরপিশাচ চলে মানব সমাজের নর্দমা দিয়ে, দুষ্কর্মের নোংরা বোঝা বয়ে। এই পিশাচের মধ্যে কতকগুলো, পাপার্জিত ধনে ধনী ব্যক্তিদের আজ্ঞাবহ হয়ে দেশে ও সমাজে করে বিভীষিকা সৃষ্টি।

যে দারিদ্র্য ভগবানের দান, সে দারিদ্র্যের অগ্নিপরীক্ষায় মানুষ হয় মহান কর্মী। সমব্যথীর প্রতি মমতাভরা হৃদয় নিয়ে সে চলে কর্মক্ষেত্রের পথে ভগবানের দিকে এগিয়ে। তার সে যাত্রাপথের দু-ধারে বহু আর্ত মানুষের চোখের জল মুছিয়ে দেখায় সে আশার আলো। তাকে কাছে পেয়ে হতাশ পায় আশা, ভয়াতুর হয় নির্ভয়। এ জগতে পথহারা মানুষের পথপ্রদর্শক হয় সেই দরিদ্র নির্লোভ বীর কর্মী।

দাদা আসার এক মাসের মধ্যেই একদিন মফিজুদ্দিন সাহেব এসে জানালেন, তাঁর তিন মাসের ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যেই নতুন অফিসার এলে তাঁকে চার্জ বুঝে দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় গ্রামের বাড়িতে যাবেন।

ছুটি পেয়ে মফিজুদ্দিন সাহেব আনন্দিত হয়েছেন, আমরা কিন্তু দুঃখিত হলাম। প্রায় চারমাস তাঁর হেপাজতে আমি ছিলাম, এর

মধ্যে কোনও দিন দুর্ব্যবহার পাইনি। বেশ শান্ত ভদ্র, কয়েদীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন অফিসার।

কয়েক দিনের মধ্যেই নতুন অফিসার মিঃ রায় এলেন। মফিজুদ্দিন সাহেব মিঃ রায়ের সাথে এসে আমাদের পরিচয় করে দিলেন। প্রথম দিনের আলাপেই বুঝা গেল ইনিও ভাললোক, উচ্চশিক্ষিত এবং কৌতূহলী।

বিদায়ের দিনে মফিজুদ্দিন সাহেব শেষ দেখা করতে এলেন। সেদিন আর ইউনিফর্ম পরে আসেননি, মুর্শিদাবাদী ভদ্র-বাঙ্গালী মুসলমানের মতই ধুতি পাঞ্জাবি ফেজ টুপি পরে এসেছেন। সাথে এনেছেন হিন্দু সিপাই দিয়ে এক হাঁড়ি রসগোল্লা আর চারটে ভাল আম। শুনলাম সবকটা বিপ্লবী বন্দী শিবিরেই আম আর মিষ্টি পাঠানো হয়েছে।

বৃদ্ধ অফিসার মফিজুদ্দিন সাহেব অহিংস অসহযোগীদের দুঃসহ যোগাযোগ হতে মুক্তি পেয়ে তাঁর পল্লীভবনে বাস করতে চলেছেন। আমরা তাঁর সুখশান্তি, শুভকামনা জানিয়ে বন্ধুর মতই বিদায় দিলাম।

কালীশঙ্কর ব্রহ্মচারী

কালীশঙ্কর ব্রহ্মচারীর সাথে একত্রে বক্সা ডিটেনসন ক্যাম্পে প্রায় এক বৎসর তিনমাস ছিলাম। তাঁর জন্মস্থান কোথায়, সংসারে কে কে আছেন, তাঁর অন্য কোনও নাম আছে কি না, এ সব কিছুই সঠিক জানতে পারিনি। আমার দিক থেকে দলগত নীতি হিসেবে কারও পরিচয় জানতে চেষ্টা করা নিষিদ্ধ ছিল। ব্রহ্মচারীদাদাও বিশেষ কিছু বলেননি।

তাঁর মুখের ভাষা শুনে কোন্ জেলায় জন্মস্থান তা নির্ণয় করা যায় না। সাধারণত কলকাতার ভদ্র চলতি ভাষায়ই কথা বলতেন। তা ছাড়া চাটগাঁ-পাহাড়-তলীর ভাষা, ঢাকা-চকবাজারী কুট্টিভাষা, যশুরে

ভাষা, বর্ধমানী পল্লী ভাষাও তাঁর মুখে নিখুঁত শুনেছি। হিন্দী, উর্দু, ওড়িয়া ভাষায়ও বিশেষ অধিকার ছিল। কথাপ্রসঙ্গে কর্মজীবন সম্পর্কে যেটুকু জানতে পেরেছিলাম তাতে, তিনি পশ্চিমে কোনও কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক পদে কিছুকাল থাকার পর ভারতের আদিবাসীদের সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্যে নানাস্থানে তাদের মধ্যে কিছুকাল বাস করেন। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলে বাঙ্গালী সৈন্য সংগ্রহের জন্যে রিক্রুটিং অফিসারের কাজ করেন। শেষে ১৯১৬ সালে নিজেই সমর বিভাগে যোগ দিয়ে আরবে যান। যুদ্ধ থামলে মিশর, আরব, পারস্য ঘুরে দেশে আসেন। তারপর ১৯২১ সালে হাঁটাপথে আফগানীস্থানের ভিতর দিয়ে ককেসাস পর্বতের পশ্চিম-উত্তরে আর্যজাতির প্রাচীন বাসভূমি দেখতে যান। ফেরার পথে কাস্পিয়ান সাগর ঘুরে কাজাকীস্থান দিয়ে চীন দেশে যেয়ে এক বৎসর কাটিয়ে তিব্বতের ভিতর দিয়ে নেপালে পৌঁছুলে ইংরেজ সরকারের গুপ্তচর পিছন লাগে।

আমি বক্সা ক্যাম্পে কালীশঙ্কর দাদার সাথে যে এক বছর তিন মাস ছিলাম সে সময়ে ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কথাই তাঁর মুখে শুনেছিলাম। এখন তার অনেক কথাই ভুলে গেছি। আমি যে আবার এই নিয়ে কিছু লিখবো, সে লেখা আবার ছাপার অক্ষরে বেরোবে এতো আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। আজ এই ১৯৬১ সালে আমার স্মৃতির পুরনো পাতায় অস্পষ্ট লেখার পাঠোদ্ধার করে কিছু লিখতে চেষ্টা করছি মাত্র। সমাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও তার ইতিহাস সম্পর্কে যা তিনি আমাকে শুনিয়েছিলেন, তা সচরাচর কোথাও শোনা যায় না। হয়তো তার মধ্যে অনেক ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে, হয় তো আমার দিক থেকে শোনা বা বোঝার ভুল হয়েছে, তথাপি আজ মনে হয় তাঁর কথাগুলো বিশেষ করে ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। একথা কেন লিখছি তার কারণ সেই ১৯২৪-২৫ সালে ব্রহ্মচারী দাদা আমাদের আন্দোলন, স্বাধীনতা প্রাপ্তি, সে স্বাধীনতার স্বরূপ, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, অস্পৃশ্যতা

প্রভৃতি সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলেছিলেন ও ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। যা এখনও (১৯৬১) ফলেনি তার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, হিন্দুদের মধ্যে যে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা আছে (১৯২৪) তা দূর করতে বেশী বেগ পেতে হবে না। কিন্তু এ নিয়ে কোনও উৎকট সমাজ হিতৈষী যদি বাড়াবাড়ি করেন তবে অবস্থা ভিন্নরূপ গ্রহণ করে বিপদ ঘটাতে পারে। হিন্দু সমাজব্যবস্থা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান চিরকালই প্রয়োজনমত পরিবর্তন, পরিবর্জন, পরিবর্ধনশীল। এই গুণের অধিকারী বলেই হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম এই পরিবর্তনশীল জগতের প্রয়োজনের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে কোন্ সুদূর কাল হতে আজও টিকে আছে। আর শুধু টিকে থাকাই নয়, সগৌরবেই টিকে আছে।

হিন্দুদের জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা নিয়ে ঘরে-বাইরে অনেকেই বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। যাঁরা এই সমস্ত প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন, আমাদের সেই পূর্বপুরুষদের বিরুদ্ধেও নানাপ্রকার বিরূপ মন্তব্য করা হয়। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, এ-প্রথা এককালে হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা করেছে। এমন কি এর কোনও কোনও ব্যবস্থার প্রয়োজন এখনও ফুরোয়নি।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, যখনই কোনও জাতি, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিদেশী কর্তৃক পরাজিত হয়ে শাসিত হয়েছে, তখনই সে জাতি অতি অল্প দিনের মধ্যেই নিজের সব কিছু হারিয়ে বিজেতার ধর্ম ও কৃষ্টি গ্রহণ করেছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ব্যাপার এক ভারত ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্র ঘটেছে। একমাত্র ভারতেই এর ব্যতিক্রম দেখা যায়।

পাঁচ-শ' বছর ভারত শাসন করেছে বিদেশী মুসলমান রাজশক্তি। দেড়-শ' বছর শাসন করল খ্রীষ্টান ইংরেজ। তাদের ধর্ম, কৃষ্টি, জাতীয়তা প্রচার করার জন্যে কালোপযোগী কোনও উপায় অবলম্বন করতে ত্রুটি করেনি। তথাপি মুসলমান ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, খ্রীষ্টান তো খুঁজে বের করতে হয়। আবার সেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের

পৃথক স্বার্থরক্ষার জন্যে চেঁচামেচিরও অন্ত নেই, যেন হিন্দুসমাজ তাদের গিলে ফেলার জন্যে সব সময়ই হাঁ করে বসে আছে।

এদের এই আশঙ্কা কি একেবারেই অমূলক? আকবর বাদশার রাজত্বকাল থেকে আরম্ভ করে ইংরেজ লর্ড মিণ্টো ও মেকলের শাসন-কাল পর্যন্ত ভারতের ধর্ম ও সমাজ-জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ঘটনাচক্রে যদিও বহু হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়েছে, তথাপি বিদেশাগত অহিন্দু ও ধর্মান্তরিত অহিন্দু সম্প্রদায়গুলি ধীরে ধীরে সামগ্রিকভাবে হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে উঠছিল। হিন্দুসমাজ তার উন্নত বিজ্ঞানসম্মত আচার-ব্যবহার ও উৎসবাদির চমৎকারিতায় পার্শ্ববর্তী অহিন্দু সমাজকে বেশ অভিভূত করে চলছিল। শিক্ষিত চিন্তাশীল অহিন্দু অতি উচ্চস্তরের হিন্দুসাহিত্য, দর্শন, সঙ্গীত, শিল্পকলায় মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল।

হিন্দুজাতি ও ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায় তরবারির সাহায্যে বা উৎকোচ দিয়ে বিধর্মীকে হিন্দু করা তো দূরের কথা, 'তুমি হিন্দুধর্ম গ্রহণ কর' এমন কথা সে কাউকে বলে না। হিন্দুর ব্যবস্থা-শাস্ত্রে বিধর্মীকে হিন্দু করার কোন ব্যবস্থাও নেই। অধিকন্তু একমাত্র হিন্দুধর্মশাস্ত্রেই দেখা যায় আধ্যাত্মিক ধর্মাচরণে 'যত মত তত পথ'।

তথাপি বহু প্রাচীনকাল হতেই হিন্দু বহু বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মান্তরিত করে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করেছে।

এই ধর্মান্তরিতকরণ বাইরের কোনও অনুষ্ঠানে নয়, এ ধর্মান্তরিতকরণ চলে বিধর্মীর রসপিপাসু মনে, আর দার্শনিক চিন্তাজগতে।

এ প্রকার ধর্মান্তরিতকরণ ভারতে ইংরেজ আমলের প্রথমার্ধ পর্যন্ত পূর্ণোদ্যমেই চলছিল। যদি লর্ড কার্জন ও লর্ড মেকলে ভারত শাসনে সাম্প্রদায়িক স্বার্থবাদী ভেদনীতি প্রবর্তন না করতেন, তবে এই দ্রুত গতির যুগে এতদিনে যে কি ঘটত, তা ভাবার বিষয়।

প্রত্যেক জাতির উত্থান ও পতনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় জাতীয় অর্থনীতি ও নারীসমাজের রক্ষণশীল মনোবৃত্তিই জাতির মেরুদণ্ড। প্রাচীনকাল হতেই ভিন্নধর্মী বিদেশী এদেশ আক্রমণ

করে বহু প্রদেশ দখল করেছে। উৎপীড়ন, অত্যাচার, নানাপ্রকার প্রলোভনও যথেষ্ট চলেছে। তথাপি হিন্দুর মেরুদণ্ড ভাঙ্গতে পারেনি। তার প্রধান কারণ হিন্দুজাতির অর্থনৈতিক বৃত্তিগত জাতিভেদ প্রথা ও কঠোর রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন শুদ্ধান্তঃপুরের ছুঁৎমার্গ।

হিন্দুর এই বৃত্তিগত জাতিভেদ প্রথায় চারটি বিশেষ সুবিধা ছিল। কামার, কুমোর, তাঁতী, গোয়ালা নিজস্ব ব্যবসাকৌশল নিজ সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য কাকেও শিক্ষা দিত না। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহাদি সীমাবদ্ধ থাকায় সেদিক থেকেও বাইরের কারও অনুপ্রবেশ সম্ভব হত না। কাজেই বহিরাগতের পক্ষে হিন্দুকে তার বৃত্তিচ্যুত করা সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয়ত,—পুরুষানুক্রমে একটি সম্প্রদায় একই ব্যবসায় বা শিল্পে নিযুক্ত থাকায় সে ব্যবসা ও শিল্প এত উন্নত হয়েছিল যাতে কোনও বিদেশী কোনও দিক থেকেই প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারত না।

তৃতীয়ত,—এই প্রথার ফলে হিন্দুসমাজ বহুকাল যাবৎ সামগ্রিক ভাবে অর্থনৈতিক স্বার্থসংঘর্ষ ও বেকার সমস্যা অনায়াসে এড়িয়ে চলতে পেরেছিল।

চতুর্থত,—অল্প কয়েকখানা গ্রাম নিয়ে এমন এক-একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ গড়ে উঠেছিল, যেখানে সাধারণ মানুষ তাদের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গোয়ালা, তাঁতী, বণিক, মাহিষ্য, হাড়ী, বাগ্দী, সমস্ত সম্প্রদায় নিয়ে পরস্পর একটা মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করে পরস্পরের সুখ-দুঃখের ভাগী হয়ে সন্তুষ্টচিত্তে জীবনযাপন করতে পারত,—যা ভারতের বাইরে কোনও দেশে এপর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

ছুঁৎমার্গ ও অস্পৃশ্যতাও আমাদের যথেষ্ট উপকার করেছে। এর জন্যেই কেনাবেচার ব্যবসা বাণিজ্য হিন্দুর হস্তচ্যুত হয়নি। আরও একটা বড় উপকার হয়েছে এই, অস্পৃশ্যতা ও ছুঁৎমার্গ এ পর্যন্তও হিন্দুর শুদ্ধান্তঃপুরের শুদ্ধিরক্ষা করে চলেছে; যার জন্যে হিন্দুর অন্তঃপুরে জানালাশূন্য দেওয়াল তুলে বোরখা প্রচলন করতে হয়নি।

ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই প্রথায় হিন্দুসমাজ নিরাপদেই

ছিল। বর্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতেই হিন্দুর প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরে। আমাদের নারীসমাজও তাঁদের রক্ষণশীলতা ত্যাগ করে উদার হতে আরম্ভ করেছেন। এই ভাঙ্গনধরা সমাজ হতে উপযুক্ত উপদান সংগ্রহ করে, নারীসমাজের এই উদারতা সুষ্ঠুভাবে সমাজ তথা জাতির সেবায় নিয়োগ করে, যদি নূতন ভাবে কালোপযোগী রক্ষণশীল সমাজ গঠিত হয় তবেই হিন্দু ভবিষ্যৎ সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক দুর্গতি হতে রক্ষা পাবে।

কোনও প্রথাই চিরস্থায়ী নয়। হিন্দুর ব্যবস্থা-শাস্ত্র—স্মৃতি-সংহিতা স্থান-কাল-পাত্রানুযায়ী পরিবর্তন স্বীকার করেই রচিত হয়েছে। সামাজিক মানুষ তার প্রয়োজনেই প্রথা প্রবর্তন করে। প্রয়োজন শেষ হলে অথবা নতুন কোনও অসুবিধে দেখা দিলে সে প্রথা ত্যাগ করে, বা প্রয়োজন মত সংস্কার করে নেয়। এই গতিশীল জগতে নিত্যপরিবর্তনের সাথে তাল রেখে, যে জাতি ও যে ধর্মীয় ব্যবস্থা চলতে পারে, সেই জাতি ও সেই ধর্মই টিকে থাকে। কোন্ সুদূর অজ্ঞাত কাল হতে হিন্দু তার বেদ, পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র অবলম্বনে প্রতিভাবলে দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেই সমস্ত বিপদ কাটিয়ে টিকে অছে।

মুসলমান আগমনের পূর্বেও ভিন্নধর্মাবিলম্বী বিদেশী শক্, হূণ, মঙ্গোলীয়ান, গ্রীক প্রভৃতি বহু জাতি ভারতে এসেছে, আক্রমণ করে লুণ্ঠন করেছে, জয় করে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে, সে সাম্রাজ্যে তাদের ধর্মও প্রচার করেছিল। আজ কোথায় গেল তাদের সেই লুণ্ঠিত ধনরত্ন? কোথায় গেল তাদের সে জাতীয়তা? আর কোথায় বা গেল তাদের সেই ধর্ম? প্রাথমিক উত্তেজনা প্রশমিত হলে বৈদিক হিন্দুভারত তার আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ব্যবহারিক সভ্যতা দ্বারা প্রথম অভিভূত করেছে তাদের মন, তারপর সামগ্রিকভাবে করেছে আত্মসাৎ, যেমন সমুদ্র করে নদীকে আত্মসাৎ। এ আত্মসাৎকরণে হিন্দুর ধর্ম, শাস্ত্র ও সমাজব্যবস্থা কোনও বাধা সৃষ্টি করেনি।

এই ভিন্নধর্মাবলম্বী বিদেশীকে আত্মসাৎ করা ব্যাপারে হিন্দু কিন্তু কোনও কালেই প্রচারবিভাগ খুলে প্রচারক রাখেনি, বা

আইন প্রণয়নও করেনি। এ ব্যাপার ঘটেছে ধীরে ধীরে অতি স্বাভাবিকভাবে।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন এই ভারতেই তো অহিন্দু আদিবাসী বহু আছে। তাদের তো হিন্দুরা আত্মসাৎ করতে পারেনি।

এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে,—আদিমকাল থেকেই এই আদিবাসীরা হিন্দুদের চাইতেও বেশী নিষ্ঠাসহকারে জাতিভেদ প্রথা ও ছুঁৎমার্গ মেনে চলেছে। আদিবাসী নারীসমাজও অতিশয় রক্ষণশীল। এ বিষয়ে একটা সত্য ঘটনা লিখছি—

১৯২২ সাল। হিন্দুদের সর্বনাশের একমাত্র কারণ জাতিভেদ ও ছুঁৎমার্গ দূর করার জন্যে গান্ধীজী তথা কংগ্রেস উঠেপড়ে লেগেছেন। পণ্ডিত ব্রাহ্মণ-প্রধান নবদ্বীপেও সে ঢেউ পৌঁচেছে। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ-বর্ণের অনেকগুলি শিক্ষিত ভদ্রলোক নানা জায়গায় সভা-সমিতি করে, হাড়ী, ডোম, কাওড়া, মুচি, মেথরদের পরিবেশিত সন্দেশ রসগোল্লা পেট ভরে খেয়ে অস্পৃশ্য পতিতদের উদ্ধার করছেন। শেষ নিমন্ত্রণ পেলেন তাঁরা কৃষ্ণনগরে। কৃষ্ণনগরের মেথর ধাঙরদের উদ্ধার করতে হবে।

কৃষ্ণনগরে বিরাট আয়োজনে সভা হল। আয়োজনের বিরাটত্বটা অবশ্য কৃষ্ণনগরের নামকরা সরভাজা সরপুরিয়ার পরিমাণ দিয়েই বুঝতে হবে। সভায় আবেগময়ী হৃদয়ভেদী বক্তৃতা ও হাততালি খুব চলল। সভান্তে পতিতোদ্ধারণেরা মেথর ও ধাঙরদের দেওয়া মিঠাইয়ের ডিস খেয়ে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের জাতিভেদ ভেঙ্গে চুরমার করে, ছুঁৎমার্গ অস্পৃশ্যতা খ'ড়ের* জলে ভাসিয়ে দিয়ে, যখন বাড়ি ফেরার যোগাড় করছেন, তখন মেথর ও ধাঙরদের দুজন সর্দার এসে বিনীতভাবে অনুরোধ করে বলল,—

বাবু, মিঠাই অনেক বেঁচেছে। দোকানে ওগুলো ফেরৎ নেবে না। আপনারা নিয়ে যান, বাড়িতে খোকাবাবুরা খাবে।

প্রস্তাবটা শুনে অনেক বাবুই বোধহয় পুলকিত হলেন। কিন্তু

*খ'ড়ে—জলঙ্গী নদী

তাঁদের সে পুলকে বাদ সাধলেন এক বেকুব বাবু। তিনি বললেন,—

কেন? তোমরা সকলে খাও। আর যদি সব না খেতে পার তবে বাড়ি নিয়ে যাও, পরে খেও।

সর্দার উত্তর দিল,—আমরা ও সব খেতে পারব না। বাড়িতেও নেওয়া চলবে না।

কেন খেতে পারবে না?

আপনাদের ছোঁয়া মিষ্টি খেলে আমাদের জাত যাবে।

কেন, আমাদের বাড়িতে ব্যাপার-বিষয় হলে তোরা তো এঁটো পাতের কুড়োন ভাত নিয়ে খাস?

হ্যাঁ বাবু, তা আমরা খাই। আপনারা বড় জাত, আপনাদের পাত কুড়নো ভাত খেলে আমাদের জাত যায় না। কিন্তু এখন তো আপনারা মুচি ডোমের হাতেও খেয়ে বেড়াচ্ছেন। এখন আপনাদের ছোঁয়া খাবার খেলে আমাদের জাত যাবে, বউ ঘরে উঠতে দেবে না।

তবে তোরা এত টাকা খরচ করে একাণ্ড করলি কেন?

বাবু, আমরা কি এসব করেছি? আমরা অপনাদের জাত মারতে আসব কেন? এখানকার বড় বড় কংগ্রেসী বাবুরা আমাদের টেনে এনেছেন। টাকা তাঁরাই দিয়েছেন। আমরা তাঁদের পেড়াপীড়িতে সামান্য কিছু দিয়েছি মাত্র। দেখছেন না, আমাদের বাল-বাচ্চা একটাও আসেনি।

সর্দারের কথা শুনে পতিতোদ্ধারণ বাবুদের তো চক্ষু চড়কগাছ। এর পর ঐ দলের কোনও বাবুই আর পতিতোদ্ধার করতে বেরোননি। ঐ দলের এক পণ্ডিতমশাই একেবারে ডিগবাজী খেয়ে গোঁড়া সনাতনী হিন্দু হয়ে বর্তমানেও (১৯৬১) বেশ চড়ে বড়ে খাচ্ছেন।

হিন্দুসমাজের বাইরে এই আদিবাসীদের অধিকাংশ জাতিরই বেশ একটা সুদৃঢ় জাতীয়তা ও কৃষ্টি আছে। ধর্মও তাদের আছে। এই ধর্মীয় ব্যাপারে এমন সমস্ত অলৌকিক কাণ্ড ঘটে থাকে, যা বর্তমান বৈজ্ঞানিক সভ্যজগতে হয়তো কেবলমাত্র শুনে বিশ্বাস করবে না। ব্রহ্মচারী দাদা তাঁর নিজের দেখা অনেকগুলো ঘটনা আমাকে

শুনিয়েছিলেন। তার দুটো কাহিনী এখানে লিখছি। শেষেরটা আমি নিজেও দেখেছি।

দাদা তখন উড়িষ্যায় সম্বলপুরের নিকটে মহানদীর তীরে এক সাধুর আশ্রমে কিছুদিন ছিলেন। নিকটেই অনেকগুলি গোণ্ড ও মুণ্ডাপল্লী ছিল। কৌতূহলী ব্রহ্মচারী দাদা প্রত্যহ দুবেলা ঐ সমস্ত আদিবাসী-পল্লীতে যেয়ে তাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সম্পর্কে কিছু জ্ঞান সঞ্চয়ের চেষ্টা করতেন।

আদিবাসীদের মধ্যে বহু বদ লোক আছে। তারা কিন্তু কোনও আদিবাসীর ঘরে চুরি, ডাকাতি, বদমাইসী করতে সাহস করে না। তার কারণ এদের সমাজে এমন সমস্ত মন্ত্র-তন্ত্র জানা গুণী ওঝা আছে, যারা বমাল সমেত অপরাধী ধরে দেয়।

একদিন দাদা সন্ধ্যাবেলা এক গোণ্ড সর্দারের বাড়ি বসে গল্প করছেন। এমন সময় ঐ পল্লীর একজন এসে জানাল,—তার একটা শুয়োর দুপুরের পর থেকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। যতদূর খোঁজ পাওয়া গিয়েছে তাতে, দু-মাইল দূরের বনের ধারে শুয়োরটা শেষ দেখা গিয়েছিল। বন খুঁজেও সেটা পাওয়া যায়নি।

সর্দার বলল,—যদি কেউ শুয়োরটা ধরে রেখে থাকে তবে কাল পাওয়া যাবে। আর যদি মেরে খায় তবে আজ রাত্রেই ব্যবস্থা হবে।

শুয়োরের মালিক এর জন্যে নিয়মমাফিক এক হাঁড়ি হাঁড়ীয়া মদ আর নগদ পাঁচসিকে হাজত অর্থাৎ দক্ষিণা সর্দারকে আগাম দিয়ে গেল।

দাদা পরদিন প্রাতে যেয়ে শুনলেন,—রাত্রেই সমস্ত মীমাংসা হয়ে গেছে। পাঁচ মাইল দূরের এক মুণ্ডাপল্লীর কয়েকটি যুবক শুয়োরটাকে বন্য মনে করে ধরে। রাত্রে পল্লীর সমস্ত যুবক-যুবতী মিলে পরমানন্দে ভোজ লাগায়। ভোজ শেষে হাঁড়ীয়া খেয়ে মাদল বাজিয়ে যখন নাচ চলছিল, তখন হঠাৎ একযোগে সকলের বমি আরম্ভ হওয়ায় বোঝা গেল, শুয়োরটা বন্যও নয়, বেওয়ারীশও নয়। তখন সেই মুণ্ডাপল্লীর সর্দার

রাত্রেই শুয়োরের মালিক খোঁজ করে তাকে সাথে নিয়ে গোণ্ড সর্দারের বাড়ি আসে। তারপর শুয়োরের দাম একুশ টাকা আর গোণ্ড সর্দারের সম্মান এক হাঁড়ি হাঁড়ীয়া দিয়ে মুণ্ডা যুবক-যুবতীদের বেওয়ারীশ শুয়োর খাওয়ার ঝক্‌মারি থেকে রেহাই দেয়।

ময়মনসিং জেলার উত্তরে গারো পাহাড়ের দক্ষিণে মান্দাই নামে এক উপজাতি আছে। এদের 'দেওপূজা' এক আশ্চর্য ব্যাপার। কোনও খোলা জায়গায় একটা বেদী নির্মাণ করে পূজো আরম্ভ হয়। পূজক বেদীর সম্মুখে বসে অনুচ্চ কণ্ঠে মন্ত্র পাঠ করে, আর ঢাক বাজে। কিছুকাল পরেই একজনের ওপরে 'দেও ভর' হয়। যার ওপরে দেও ভর হয়, সে প্রথমে পাগলের মত খুব খানিক নাচে। তারপর নাচতে নাচতে যেয়ে পূজার বেদীর ওপরে রক্ষিত মন্ত্রপূত রামদা নিয়ে বাঁশঝাড় থেকে একটা নিখুঁত সরল বাঁশ এক কোপে কেটে এনে বেদীর পিছনে কিছু দূরে পুঁতে দেয়। এদিকে পূজক অবিরাম মন্ত্র আবৃত্তি করতে থাকে। কিছুকাল পরে, এমন কি কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিশ-তিরিশ ঘণ্টা পরে ঐ বাঁশের আগা বাঁকা হয়ে ইংরেজী U-এর মত বেদী স্পর্শ করে। তখন শুয়োর, ছাগল, মুরগী, কবুতর বলি দিয়ে বেদীর ওপরে রক্ত ঢেলে দেয়। সেই সাথে মদ, দুধ, চিড়ে, খই, নানাপ্রকার ফলও দেয়। ভোগ দেওয়া শেষ হলে বাঁশটা আবার আগের মত সোজা হয়ে যায়। এই পূজায় পূজক প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত একাসনে বসে গানের মত সুর করে অবিরাম মন্ত্র পাঠ করে। সে মন্ত্রের ভাষা ও অর্থ পূজকও জানে না। ঐ ভাষায় এখনও কোনও জাতি কথা বলে কিনা, তা অনুসন্ধানের বিষয়। বিদেশী পাদ্রী সাহেবরা এদের এই সমস্ত কাণ্ড অনেক দেখে থাকেন। বিলেতী কাগজে দু-চারটে ঘটনা বেরিয়েও থাকে।

ভারতের আদিবাসীদের সম্পর্কে দেশ-বিদেশে দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ ছাপা হয়। এদেশে যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তার বেশীর ভাগই বিদেশে প্রকাশিত প্রবন্ধের ছায়া অবলম্বনে লিখিত। আর যে সমস্ত লেখক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এদের মধ্যে গিয়েছেন, তাঁরাও হয় সরকারী কর্মোপলক্ষে, অথবা সখের ভ্রমণে গিয়ে দু-পাঁচদিন

সরকারী ডাকবাংলোয় থেকে, এদের দেখে, ফটো তুলে, এক বিরাট প্রবন্ধ লিখে ফেলেন। সে লেখা এদের সম্পর্কে বহু অবাস্তব ও অতিরঞ্জিত তথ্যে ভরা।

প্রকৃতপক্ষে আদিবাসী ও পার্বত্য জাতিগুলি সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছুই জানিনে। কারণ, এদের ভাল করে জানা ও বোঝার জন্যে এ পর্যন্তও কোনও সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা আমাদের দিক থেকে হয়নি। যেটুকু আমরা জানি, তার ভিত্তি হচ্ছে বিদেশীদের লেখা বই ও প্রবন্ধ। যদি সত্যই কেউ এদের জানতে-বুঝতে আগ্রহী হন, তবে তাঁকে যেতে হবে এদের বাসস্থান পাহাড়-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে। বাস করতে হবে এদের পল্লীতে বছরের পর বছর। শিখতে হবে এদের ভাষা। তারপর এদের আন্তরিক বিশ্বাস অর্জন করে দেখতে হবে এদের আচার-ব্যবহার। তবে এই অদ্ভুত আদিবাসীদের প্রকৃত পরিচয় কিছু জানা যাবে। আর তাতে মূল্যবান গবেষণার জন্যে বহু উপাদান পাওয়ার সম্ভাবনাও আছে।

হিন্দুসমাজে আদিবাসীরা সাধারণত অস্পৃশ্য। এই অস্পৃশ্যতার কারণ,—সেই আদিমকাল থেকে তারা যে ধর্ম ও আচার-ব্যবহার অবলম্বন করে চলছে, সে আচার-ব্যবহার ও ধর্ম, হিন্দুর বৈদিক ও স্মার্ত আচার-ব্যবহারের অত্যন্ত বিরোধী।

আদিবাসী ও পার্বত্যজাতি ছাড়া হিন্দুজাতির মধ্যেই কতকগুলি সম্প্রদায়কে তথাকথিত অস্পৃশ্য বা 'অনাচরণী' বলা হয়। এঁদের অস্পৃশ্য বলাই ভুল। কারণ, এঁদের স্পর্শে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কোনও দিনই নিজেদের অপবিত্র মনে করেন না। আচার-ব্যবহার ধর্মাচরণে উচ্চবর্ণ হিন্দু ও এঁরা একই প্রকার। সাধারণ দেবমন্দিরে প্রবেশ ও পূজা-অর্চনার অধিকার, উচ্চবর্ণের কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতিরও যে প্রকার, এঁদেরও সেই প্রকার। তবে বিশেষ এই যে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এঁদের ছোঁয়া জল খেত না। এই অনাচরণীয়ত্বের কারণ ঐতিহাসিক।

বৌদ্ধ যুগে ভারতের কৃষক, বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলি প্রায় সকলেই বৌদ্ধ মত ও আচার গ্রহণ করে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের

আবির্ভাবকাল থেকে আরম্ভ করে ভারতে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ঐ সমস্ত বৌদ্ধ আচার গ্রহণকারা হিন্দুরা ধীরে ধীরে পূর্বের বৈদিক আচার গ্রহণ করতে থাকে। মুসলমান রাজত্বের প্রথম দিকে প্রায় দু'শ বছর এই বৈদিক আচারের প্রচার-স্রোত রুদ্ধ থাকে। তখন ঐ বৌদ্ধরা একতরফা মুসলমান হয়ে যায়। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে দুজন দুঃসাহসী বাঙ্গালী সন্ন্যাসী সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করে আবার সেই বৈদিক আচার স্রোত প্রবাহিত করেন। এই সন্ন্যাসী দুজন হচ্ছেন শ্রীমন্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী। শ্রীমন্ গৌরাঙ্গদেবের কর্মক্ষেত্র ছিল বাংলা, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ প্রদেশ। শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীর কর্মক্ষেত্র ছিল অবশিষ্ট ভারত।

মুসলমান রাজত্বের প্রথম দিকে প্রায় দু'শ বছর হিন্দুর বৈদিক আচারের প্রচার বন্ধ থাকার পর আবার যখন আরম্ভ হল, তখন যাঁরা বৌদ্ধ আচার ত্যাগ করে হিন্দু আচার গ্রহণ করেছেন তাঁরাই হিন্দু সমাজে অনাচরণী সম্প্রদায় বলে গণ্য হয়েছেন। এ যেন কলকাতার লোকাল ট্রেনের অবস্থা, যারা আগে উঠেছে তারা বসতে পেরেছে, যারা পরে এল তারা দাঁড়িয়ে আছে অথবা গাড়ির বাইরে ডাণ্ডা ধরে ঝুলছে।

আমাদের দেশে কিছুকাল যাবৎ একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা, সাহিত্যিক ও কবি তাঁদের বক্তৃতায়, লেখায় ও কবিতায় এই অস্পৃশ্যতা নিয়ে হৃদয়ভেদী আর্তনাদ সহকারে উচ্চবর্ণের হিন্দু, বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজকে দায়ী করে বহু ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কটূক্তি করে থাকেন। তাঁদের সমীপে বিনীত নিবেদন,—পরের মুখে ঝাল না খেয়ে নিজেরা একটু অনুসন্ধান করে দেখুন ব্যাপারটা কি।

আদিবাসীদের বেশীর ভাগই কৃষিজীবী ও শ্রমিক। তাদের আর্থিক অবস্থা হিন্দু কৃষক-শ্রমিকদের সমান। কয়েকটা সম্প্রদায় আছে যাদের দারিদ্র্য অতিশয় শোচনীয়। এই শোচনীয় অবস্থার কারণ তাদের অদ্ভুত কর্মবিমুখতা ও খেয়াল। ঘরে যতক্ষণ সামান্য

কিছু সম্বল থাকবে ততক্ষণ উপার্জনের চেষ্টা করবে না। একটা শুয়োর বেচে যদি বিশ টাকা পায়, সেই দিনই পাড়াসুদ্ধ লোক একত্র করে মদ খেয়ে স্ফূর্তি করে উড়িয়ে দেবে। হয় তো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ঘরের চালে খড় নেই, পরনে কাপড় নেই।

অনুসন্ধান করলে জানা যাবে, একাল পর্যন্ত বহু হিন্দু মহাপুরুষ, মনীষী, রাজা, জমিদার, ধনী, সমাজসেবী আদিবাসীদের উন্নতির জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। মুসলমান রাজত্বকালে মোল্লা-মৌলবীরাও সফল হতে পারেননি। বর্তমানে খ্রীষ্টান রাজশক্তি (১৯২৪) ও বিদেশী ধনকুবেরদের সহায়তায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করে খ্রীষ্টান মিশনারীরা প্রতি রবিবারে কিছুটা সফল হলেও সে সাফল্যের স্থায়ী মূল্য কতখানি সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে।

যে সমস্ত সমালোচক বলেন,—উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এই সমস্ত আদিবাসীদের সামাজিক অধিকার কেড়ে নিয়ে ধর্মে, শিক্ষায়, সভ্যতায় বঞ্চিত করেছে, তাদের 'সর্বহারা করে পদদলিত করছে'—সেই সমস্ত দরদীরা সত্যের মারাত্মক অপলাপ করেন। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও যারা কোনও কালেই হিন্দু সমাজের আচার, ব্যবহার, সমাজব্যবস্থা, ধর্ম মেনে নেয়নি, তাদের সেই দিক থেকে বঞ্চিত করা, সর্বহারা করা, পদদলিত করার কথাই উঠতে পারে না।

হিন্দুর মধ্যে যাঁরা তথাকথিত অস্পৃশ্য বা অনাচরণী বলে কথিত হন অথচ হিন্দু আচার নিয়ম মেনে চলেন তাঁদের অবস্থা কোনও দিক থেকেই উচ্চবর্ণের হিন্দু অপেক্ষা হীন নয়। বাংলা দেশে তো তাঁরাই ধন-সম্পদে শ্রেষ্ঠ। অতএব এঁদের সম্পর্কেও 'বঞ্চনা করা হয়েছে, পদদলিত করা হয়েছে'—এ কথা বলা চলে না।

পৃথিবীতে এমন একটা জাতিও নেই যাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদপ্রথা ও অস্পৃশ্যতা কোনও না কোনও আকারে নেই। হিন্দুর মধ্যে যে জাতিভেদ দেখা যায় তা হিন্দুধর্মের বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে নয়, অথবা ব্যক্তিগত কাঞ্চনকৌলিন্য বা পদমর্যাদার ওপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। (এখন এই ১৯৬১ সালে শুনছি, স্বাধীনতা পাওয়ার পর শাসন ক্ষমতা-

প্রাপ্ত আমাদের নেতারা নিউ দিল্লীতে কাঞ্চনকৌলিন্য ও পদমর্যাদার ভিত্তিতে জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। আশা করা যায় অপরাপর স্থানেও শীঘ্রই এ প্রথা বিস্তার লাভ করবে, এবং একে অবলম্বন করে অস্পৃশ্যতাও প্রতিষ্ঠিত হবে।)

বেদাদি শাস্ত্র অবলম্বনে উপাস্য ও উপাসনা পদ্ধতির বিভিন্নতার স্বীকৃতি হিন্দু চিরকালই দিয়ে চলেছে। ফলে, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, রামাইত, সাকারবাদী, নিরাকারবাদী প্রভৃতি বহু মতাবলম্বী বহু সম্প্রদায় হিন্দুজাতির বুকে গড়ে উঠেছে; এখনও উঠছে। যার যার মতবাদ সমর্থন করে তর্কযুদ্ধও চলছে। কিন্তু এই ধর্মীয় মতভেদ নিয়ে হিন্দুদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে না, বা বিরুদ্ধ সমালোচনাকারীর বুকে অতর্কিতে ছোরা বসিয়ে দিয়ে প্রভূত পুণ্য সঞ্চয়ের চিন্তা কারও মনে জাগে না। বরং শৈবতীর্থ কাশীধামে শাক্ত, বৈষ্ণব, সাকারবাদী, নিরাকারবাদী সকলেই একসাথে বাবা বিশ্বনাথের মাথায় ফুল-বেলপাতা গঙ্গাজল ঢালেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দিরে, আযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থানে সকলেই সমান শ্রদ্ধা সহকারে হাত-জোড় করেন। সামাজিক বিবাহাদি ব্যাপারেও ধর্মমত কোনও বাধা সৃষ্টি করে না।

যে জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িক পৃথক স্বার্থবাদ ভবিষ্যৎ ভারতের পক্ষে ভয়ঙ্কর বিপদ, সেটা সম্পর্কে আমাদের নেতৃগোষ্ঠী, সাহিত্যিক ও সমাজ সেবীরা কোনও চিন্তা করেন কি না সন্দেহ। যাঁরা সে বিষয়ে দু'চার কথা বলেন, তাঁদের সে কথায় বুঝা যায় ব্যাপারটার গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁরা সম্যক অবহিত নন। এই জাতিভেদ ও পৃথক স্বার্থবাদ সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে এ আকারে ছিল না। সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনাবলী লক্ষ্য করে সুচতুর ইংরেজ তাদের সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে অতি সুকৌশলে এই ভেদবাদ কাজে লাগিয়েছে।

যাঁরা রক্তে ভারতীয় হিন্দু অথবা বহু শতাব্দী ভারতে বাস করার পর এখনও নিজেদের ভারতীয় বলে না ভেবে বহু দূরবর্তী দেশের ইতিহাস, কৃষ্টি, সভ্যতাকেই আপন বলে মনে করেন, ভারতের জাতীয় গৌরব,

কৃষ্টি, ইতিহাস, কোনও কিছুর ওপরেই যাঁদের মমত্ববোধ নেই, যাঁরা ভারতের নিজস্ব সব কিছু থেকেই নিজেদের পৃথক করে সরিয়ে রাখতে ব্যস্ত,—তাঁদের সেই বিজাতীয় পৃথক স্বার্থবাদ ভারতের স্বাধীনতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির ক্ষেত্রে মারাত্মক বিপদ।

আর এক প্রকার জাতিভেদ ইংরেজের কৃপায় এদেশে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। এটা হচ্ছে প্রাদেশিক জাতিভেদ ; যেমন বাঙ্গালী, বিহারী, উড়ীয়া ইত্যাদি। এক হিন্দু ছাড়া মুসলমান, খ্রীষ্টানদের মধ্যে কিন্তু এ ভেদ নেই। এই প্রাদেশিক ভেদ প্রথার ভাল-মন্দ তুটো দিক আছে। জাতীয় নেতা যদি সচ্চরিত্র দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন নিরপেক্ষ দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ হন, তবে এই প্রাদেশিক মনোভাব সুস্থ প্রতি-যোগিতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আশাতীত সুফল পেতে পারেন। ইংরেজ তার সামরিক বিভাগে এ প্রথা চালু করে সুফল পাচ্ছে। তারা এক একটা প্রদেশের অধিবাসী সৈনিক নিয়ে সেই প্রদেশের নামে রেজিমেণ্ট তৈরী করেছে। যুদ্ধের সময় দেখা যায় নিজের প্রদেশের যাতে কোনও প্রকার অপযশ না হয়, তার জন্যে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ পায়। ভারতে কিন্তু এক সামরিক বিভাগ ছাড়া আর সমস্ত ক্ষেত্রেই এই প্রাদেশিক স্বার্থবোধ বিপথে পরিচালিত হচ্ছে।

এই তু-প্রকার পৃথক স্বার্থবাদ সম্পর্কে এখন হতেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে, আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হবে। যদি এই সমস্ত পৃথক স্বার্থবাদীদের সাথে চুক্তির গোঁজামিল দিয়ে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে হয়তো শান্তির সময়ে এদের নিয়ে বেশী কিছু অসুবিধে নাও হতে পারে। কিন্তু যদি কোনও বৈদেশিক রাষ্ট্রের সাথে বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে এরা দেশের মধ্যে বিভীষণের ভূমিকা গ্রহণ করে, ভারতের সর্বনাশ ঘটাবে।

আমাদের জাতীয়নেতা, সাহিত্যিক, কবি, সমাজসেবী এঁরা কেউই এই মারাত্মক রোগ সম্পর্কে সাহস করে কিছু করছেন না, কিছু বলছেনও না। তাঁরা কেবল হিন্দু সমাজে যে জাতিভেদ, ছুঁৎমার্গ আছে, তাই নিয়ে হাহাকার তুলে, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের তিরস্কার ও উপদেশামৃত

বর্ষণ করতেই ব্যস্ত। বোধহয় তাঁরা মনে করেন কোনও প্রকারে স্বাধীনতা লাভ হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এ ধারণা তাঁদের সম্পূর্ণ ভুল। ইংরেজ এদেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে, এমন কিছু করে যাবে, যাতে ভারত স্বাধীন হয়েও শক্তিশালী না হতে পারে। বোধহয় সেইজন্যেই ধর্মাবলম্বনে পৃথক জাতীয় স্বার্থবাদ ও হিন্দুদের মধ্যে পৃথক প্রাদেশিক স্বার্থবাদ নানা প্রকারে পরিপুষ্ট করা হচ্ছে। আর আমাদের নেতারা একচক্ষু হরিণের মত বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করছেন। পেটের মধ্যে যার বিষফোড়া, সে যদি গায়ের ঘামাচি সারাতেই ব্যস্ত থাকে, তবে সে অতিবড় নির্বোধ।

(এই কথাগুলি কালীশঙ্কর ব্রহ্মচারী ১৯২৪-২৫ সালে বক্‌সা ক্যাম্পে আমাকে বলেছিলেন—লেখক)

বক্‌সায় শেষের ক'দিন

কালীশঙ্কর ব্রহ্মচারী ও আমি প্রায় এক বৎসর তিন মাস বক্‌সা ক্যাম্পে একত্রে ছিলাম। অনেক কথাই তাঁর মুখে শুনেছি, তার মধ্যে এখন যা মনে পড়ল তাই কিছু লিখলাম। পরে লেখবার মত কিছু মনে হলে লিখব।

ইনচার্জ অফিসার মিঃ রায় খানাতল্লাসী করতে রোজই আসেন। রায়ের খানাতল্লাসী মফিজুদ্দিন সাহেবের তল্লাসীর মত উনুনের ছাই হাতড়ানো নয়। রিভলভারটাও বেল্টের খাপেই থাকে।

মিঃ রায়ের সাথে ব্রহ্মচারী দাদার বেশ আলাপ জমে গেল। আধঘণ্টার বেশী থাকার সময় তাঁর ছিল না। সে সময় দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা হত। দাদার কথামত মিঃ রায় অনেক বই কিনেছিলেন। এই বই কেনা আরম্ভ হয় একদিন আলোচনাকালে দাদার কিছু তীব্র মন্তব্যের ফলে।

মিঃ রায় বোধ হয় দর্শন শাস্ত্রের এম, এ, ছিলেন। তা ছাড়া

নিজের চেষ্টায় বহু দর্শনের বই পড়েছেন। সে বই সবই ইংরেজী, ভারতীয় দর্শন যা পড়েছেন তাও ইংরেজী অনুবাদ, অথবা টীকা-টিপ্পনী সাহেবদের লেখা ইংরেজী। ফলে দাদা যা বলেন তার সাথে মিঃ রায় যা বুঝে রেখেছেন তার মিল হয় না। দাদা একদিন একটু বিরক্ত হয়ে বললেন—

দেখুন মিঃ রায়, আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রে যে বিদ্যে লাভ করেছেন, ও বিদ্যে আমিও একটু চেখে দেখেছি। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় দর্শন ঐ প্রকারে পড়াও হয় না, বুঝাও যায় না। আপনাদের দর্শন শাস্ত্রের ডাক্তাররাও টোলে পড়া তৃতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতদের নিকটে কিছু নন। অবশ্য একথা আমি বলছি সেই সমস্ত ডক্টরদের সম্বন্ধে যাঁরা ভারতীয় টোলের ধারায় শিক্ষালাভ করেননি। আর যে সমস্ত পণ্ডিত উপাধির জোরেই পণ্ডিত তাঁরাও আমার লক্ষ্য নন। আপনি যদি সত্যই আমাদের দর্শন শাস্ত্রে কিছু জ্ঞান লাভ করতে চান তবে ভারতীয় পণ্ডিতদের লেখা টীকা-টিপ্পনীসমেত মূল বই পড়ুন। আর সুযোগ পেলেই ঐ টিকিওয়ালা টুলো পণ্ডিতদের সাথে আলোচনা করে বুঝতে চেষ্টা করুন।

এই উপদেশের ফলেই দাদার নির্দেশ মত বই কেনা আরম্ভ হয়।

আইনের বাধার জন্যে মিঃ রায় তাঁর বাসায় আমাদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে পারতেন না। কিন্তু ভাল জিনিষ পেলেই আমাদের জন্যে পাঠিয়ে দিতেন। পাল-পার্বণে তাঁর বাসায় তৈরী নানাপ্রকার খাবার পাঠাতেন। আমাদের যেমন দিতেন তেমনি অপর বিপ্লবীবন্দী শিবিরেও দিতেন। আমরা তাঁকে আর জেল দারোগা বা জেলার সাহেব মনে করতাম না। বন্ধু যেমন বন্ধুর আগমন প্রতীক্ষা করে, আমরাও তেমনি তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করতাম।

ক্রমে ক্রমে বক্সা ক্যাম্পে আমার এক বছর পাঁচ মাস কেটে গেল। ওদিকে কংগ্রেসী ক্যাম্পের জয়ধ্বনির শব্দঝঙ্কার অনেক নেমে এসেছে, বারেও কমে গেছে। শুনলাম নতুন আমদানী বন্ধ, পুরনোদের উৎসাহে ভাটা পড়েছে। মিঃ রায় এক মাস যাবৎ দু'বেলাই

আসেন, এসেও অনেকক্ষণ থাকেন। কংগ্রেসী ক্যাম্প খালি হতে চলেছে, বিপ্লবী ক্যাম্পের ওদিকেও ধোঁয়া উঠতে দেখিনে।

একদিন মিঃ রায় বললেন—বক্সা ক্যাম্প শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যাবে। বোধহয় আর দু-তিন সপ্তাহ পরেই আপনাদেরই এদিকটার আদিম অধিবাসী উদ্বাস্তু বাঘ-ভালুক তাদের জন্মভূমিতে ফিরে আসতে পারবে।

কথাটা শুনে চিন্তিত হলাম। বক্সার আদিবাসীরা উদ্বাস্তু হয়ে বিদেশে কষ্টে আছে। তারা তাদের স্বদেশে এসে মনের আনন্দে বাস করবে, এতো সকলেরই আনন্দের কথা! কিন্তু বৃটিশ-চিড়িয়াখানার বন্দী-চিড়িয়া আমরা, আমরা কোথায় যাব? এখানে কাঁটাতারের খাঁচায় বেশ আছি। খাঁচাটা এমন মজবুত যে উদ্বাস্তুরাও হামলা করতে সাহস পায় না। তারা বরং বাইরে রাইফেলওয়ালা খইনী-সেবীদের সেবা করাই সহজসাধ্য মনে করে। তারপর ব্রহ্মচারী দাদার মত সঙ্গী পেয়েছি। যে দুজন অফিসার আমাদের দেখাশোনা করলেন তাঁদের নিকটেও সদ্ব্যবহার পেয়েছি। জায়গাটাও বেশ স্বাস্থ্যকর, এতদিনের মধ্যে একদিন মাথাটাও ধরেনি। প্রাকৃতিক দৃশ্যও মনোরম।

আরও কয়েকদিন পরে মিঃ রায় এসে জানালেন—তিনি বোধহয় আর দু'সপ্তাহ এখানে আছেন। তারপর অন্যলোক আসবে।

কথাটা শুনে নীরবে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে, হেসে বললেন—আপনাদের ফেলে যাচ্ছি মনে করে দুঃখিত হচ্ছেন দেখছি। কিন্তু আমাকে এখানে রেখে আপনারাই আগে চলে যাবেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—বলতে পারেন, আমাদের কোথায় পাঠাবে?

আপনাদের বাড়িতেই পাঠাব, দুজনেরই ছেড়ে দেবার আদেশ এসেছে। দু'তিন দিনের মধ্যেই জলপাইগুড়ী থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এসে যাবে।

একটা প্রবাদ আছে, মানুষে নাকি দাঁত থাকতে দাঁতের কদর বোঝে না। প্রবাদটা বোধহয় ভালবাসার ক্ষেত্রে পুরোপুরি খাটে।

বক্‌সায় থাকাকালে রোজ হিমালয় দেখতাম। তাকে দেখতে দেখতে যে আমি ভালবেসে ফেলেছি তা বুঝলাম তাকে ছেড়ে যেতে হবে এই সংবাদ পেয়ে।

হিমালয়ের ভাবগম্ভীর সৌন্দর্য অবলম্বনে কল্পনা-সাহিত্য সৃষ্টি করার মত ভাষাজ্ঞান আমার নেই, তা পূর্বেই বলেছি। আর সে প্রকার মানসিক অবস্থাও তখন আমার ছিল না।

তবে কি হিমালয় চিন্তা করার মত কিছুই আমাকে দিতেন না? না, একথা বললে আমার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাবে। হিমালয় আমাকেও বঞ্চিত করেননি। তিনি মহান্, তিনি কি কাউকে বঞ্চিত করতে পারেন! যে, যে প্রকার যোগ্য তাকে সেই প্রকারেই তিনি কৃতার্থ করেন। হিমালয়ের ভাণ্ডারে সব আছে। আমি যে প্রকার চিন্তার যোগ্য, হিমালয় আমাকে সেই প্রকার চিন্তার খোরাক দিয়েছেন।

আমি সংসারী মানুষ। মা, বউ, সব নিয়ে আমার সংসার। সে সংসারে সব কিছুরই অভাব। যে, যে বিষয়ে অভাবী, তার কথায় ও চিন্তায় ফুটে ওঠে অন্তরের অভাবের রূপ। তা না উঠে যদি অন্য কিছু ওঠে তবে বুঝতে হবে ওটা আত্মবঞ্চনা বা অভিনয়। অবশ্য একথা আমি স্বভাবকবি ও বিশ্বপ্রেমিকদের বাদ দিয়েই বলছি।

হিমালয় দেখে আমি ভাবতাম—এই হিমালয়ের মধ্যেই কৈলাস। কৈলাসে হিমালয়রাজের জামাই-মেয়ের সংসার। রাজার জামাই শিবঠাকুর, তাঁর ধন ভাণ্ডারের বড়কর্তা কুবের। এ হেন শিবঠাকুর বাস করেন বেলগাছতলায়, শুয়ে ঘুমান বাঘছালে! কেন? একখানা ভালো বাংলো তৈরী করলে কি ক্ষতি হত? খান সাতেক খাট, কয়েকখানা টেবিল, ড্রেসিং টেবিল, পনরো-বিশখানা চেয়ার, আর্ম-চেয়ার, সোফা ইত্যাদি দিয়ে বাংলোটা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলে দু'দুটো সুন্দরী মেয়ে নিয়ে মা দুর্গাকে তো বেশী ঝামেলা পোহাতে হত না। এতে দোষই বা এমন কি হত? শিবঠাকুর তো গৃহীসাধু, অনেক সন্ন্যাসীবাবাদের মঠে, আশ্রমে, তপোবনে এর চাইতেও অনেক কিছু দেখা যায়।

আচ্ছা, জামাই নারায়ণঠাকুর এলে মা তাঁর দুই কুঁদুলী মেয়ে নিয়ে রাত্রে কি ব্যবস্থা করতেন?

গণেশঠাকুর কি জন্যে গদীয়ানদের ট্রিপ্‌ল একাউন্টের খাতা লেখেন? ফী পান কত? নিশ্চয়ই সাধারণ কেরানীদের চাইতে অনেক বেশী। কারণ এ সমস্ত হিসেব-নিকেশের আবিষ্কারক তিনি নিজে বলেই তো হালখাতার দিনেই গদীয়ানরা তাঁকে আদর যত্ন করে গদীতে বসায়। আমাদের চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টরা পাঁচ-সাত বছরেই কলকাতায় বাড়ি, গাড়ি, সব কিছু করে ফেলেন। গণেশঠাকুর এ সমস্ত হিসেবের আবিষ্কারক হয়েও এ পর্যন্ত কিছু করতে পারলেন না কেন? তাঁর ভক্তরা রাতারাতি বড়লোক হওয়ার জন্যে শেষে তাঁকেই উল্‌টিয়ে বসায় বলে কি? গণেশের অংশাবতার আমাদের চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টদের কারা উল্টাবে?

আচ্ছা, গণেশঠাকুরের কাজ তো হিসেবের খাতা লেখা, তাতে নেংটি ইঁদুর পুষতে হয় কেন? ইন্‌কাম ট্যাক্সের উকিলবাবুদের কাজের সুবিধের জন্যে দরকার মত খাতাগুলোর জায়গায় জায়গায় একটু কেটে রাখার জন্যে কি?

অমন ফুলবাবু কার্তিক, তাঁকে কোনও মেয়ে বিয়ে করতে চায় না কেন? বাপের টাকা তো যথেষ্ট আছে!

এই রকম অনেক কথাই ভাবতাম। ভাবার মত মনের অবস্থা থাকলে হিমালয়কে অবলম্বন করে অনেক কিছুই ভাবা যায়। হিমালয়ে উপাদানের অভাব নেই। যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ আছে, ম্যাডাম ব্লাভাস্কীর 'জ্ঞানগুহা' আছে, মানস সরোবর, এভারেস্ট, কত কি আছে। সর্বোপরি আছে কুবেরের ভাণ্ডার। কত রহস্যময়, কত ভীষণ, কত সুন্দর, কি বিরাট এই হিমালয়। যুগ যুগ ধরে মহিমা তার আকর্ষণ করেছে কত তপস্বী, কত কবি, কত দুঃসাহসী অভিযাত্রীকে। যে এসেছে মহান্ হিমালয়ের কোলে, সেই তাঁকে ভালবেসেছে।

প্রায় দেড় বছর ধরে তাঁকে দেখতে দেখতে আমিও যে আকৃষ্ট

হয়েছিলাম, ভালবেসেছিলাম, তা বুঝলাম তাঁকে ছেড়ে যেতে হবে, এই সংবাদ পেয়ে।

বিদায়ের দিনে মিঃ রায় তাঁর বাসায় আমাদের তুজনকে খাওয়ালেন। স্টেশন পর্যন্ত এসে তুখানা ইন্টার ক্লাস পাস ভাঙ্গিয়ে টিকিট করে দিয়ে দাদাকে প্রণাম করে বিদায় নিয়ে গেলেন।

আমাদের দেশের পুলিসের কথা উঠলেই অনেকে বিরূপ মন্তব্য করেন। কিন্তু একটু নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে এঁদের অবস্থাটা খোঁজ করলে জানা যাবে, এঁরা সকলেই আমাদের সমাজের মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত সন্তান। কর্মক্ষেত্রে যাদের নিয়ে কাজকারবার, তাদের ব্যবহারের ফলেই এই সমস্ত অফিসারদের তুর্নামের ভাগী হতে হয়। চোর বদমাশরা এঁদের বেশী ক্ষতি করতে পারে না। ক্ষতি করে তারাই বেশী, যারা নিজেদের কাজ উদ্ধারের জন্যে পুলিসের কাছে যায়। তারাই পুলিস কর্মচারীদের অসৎ করে তোলে। এই সমস্ত লোকে কেউ যায় আগে থেকেই ঘুষ দিয়ে কাজ উদ্ধারের জন্যে, কেউ বা ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিলের মৎলবে। আবার অনেকে আছে পুলিসের সাথে গায় পড়ে আলাপ জমিয়ে, বন্ধুত্ব করে নিজের অসতুদ্দেশ্য সাধনে ব্যস্ত। ন্যায্য কাজের জন্যে প্রকৃত সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে খুব কম লোকই পুলিসের কাছে যায়। আর তার জন্যেই আমাদের দেশে পুলিসের এত তুর্নাম।

তুর্ভাগ্য

মিঃ রায় যখন আমাদের টিকিট এনে দিলেন তখন জানতে পেলাম ব্রহ্মচারী দাদা গৌহাটি যাচ্ছেন। আমার ধারণা ছিল, দাদা এখন কলকাতা যাবেন। গৌহাটি যাবেন শুনে ব্যাকুল হয়ে পড়লাম। মিঃ রায় চলে গেলে, জিজ্ঞাসা করলাম—

দাদা, আপনি গৌহাটি যাবেন কেন ?

কামাখ্যা মায়ের দর্শনে যাব।

তারপর কোথায় যাবেন?

'যদি বাধা না পাই তবে মণিপুর দিয়ে হাঁটাপথে ব্রহ্মদেশে যাব। তারপর সুযোগ পেলে আরও পূবে যাওয়ার ইচ্ছে আছে।

ও দেশে কি উদ্দেশ্যে যাবেন?

ঐ সমস্ত দেশের অধিবাসীদের জানতে চাই, বুঝতে চাই। অনেক দিন হতেই মনে এ আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, এ পর্যন্ত সুযোগ করে উঠতে পারিনি। দেখি এবার মা কামাখ্যাদেবী কি করেন।

গাড়ি ছাড়লে দাদা ঐ দেশে যাওয়ার জন্যে কেন তাঁর আগ্রহ তা কিছু কিছু আমাকে বললেন।—

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপগুলির অধিবাসীদের মধ্যে এককালে হিন্দুধর্মের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। হিন্দুধর্মের আওতায় থেকেই তারা সব বিষয়ে উন্নতি লাভ করে তাদের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করেছিল। ভারতে মুসলমান রাজত্বকালে ঐ সমস্ত দেশের সাথে ভারতীয় হিন্দুদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়। তারপর তাদের অধিকাংশই মুসলমান হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় মুসলমান হয়েও তারা তাদের পূর্বপুরুষের কথা ভুলে যায়নি। প্রাচীন হিন্দুমন্দিরগুলি এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে এবং সে সমস্ত মন্দির নিয়ে তারা গৌরব বোধ করে। এখনও সেই রামায়ণ, মহাভারত, বেহুলার কাহিনী আদর করে পড়ে ও শোনে। হিন্দুপুরাণের কাহিনী আবলম্বনে নাটক রচনা করে অভিনয় করে। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, উৎসব, নৃত্য-গীত, শিল্পকলা সব-তাতেই সেই প্রাচীন হিন্দুরীতি বজায় আছে। ছেলেমেয়ের নামও সেই প্রাচীন হিন্দুপৌরাণিক নামের সাথে মিলিয়ে রাখে। এতোতেও ওদেশে নাকি মুসলমান ধর্মের কোনও অপমান বা ক্ষতি হয় না। এমনটা কি করে সম্ভব হল তাই বুঝতে দাদা ও দেশে যাবেন।

প্রসঙ্গত ব্রহ্মচারী দাদা, মিশর, আরব, তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতি দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও বললেন। ঐ সমস্ত দেশে ইসলাম গ্রহণের প্রথম দিকে নানা কারণে অমুসলমান যুগের কীর্তিকলাপ কিছু কিছু

ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু ভয় ও উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার পরই তারা আবার জাতীয়সম্বিত ফিরে পেয়ে সেগুলি পুনর্নির্মাণ বা সংস্কার করেছে। ঐ সমস্ত দেশের পৃথক পৃথক জাতীয়তা, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, প্রাচীন ইতিহাস, তাদের গৌরবের বস্তু। বাপ মায় সন্তানের নাম-করণেও নিজ নিজ জাতির ও দেশের পরিচয়ই দেন।

গাড়ি আলিপুরদুয়ার এলে আমি দাদাকে প্রশ্ন করলাম—

আপনি পূর্বাঞ্চলে যেয়ে কি কেবল সে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সামাজিক অবস্থাই অনুসন্ধান করবেন, না আরও কিছু উদ্দেশ্য আছে ?

দাদা উত্তর দিলেন—দেশের জন্যে আমার কাজ তোমাদের থেকে পৃথক ধরনের। সে কাজের ক্ষেত্র এখন আর ভারতে নেই তুমি বোধহয় লক্ষ্য করেছ, বর্তমান কংগ্রেসী আন্দোলন ও কংগ্রেসের কার্যকলাপ নিয়ে তোমার সাথে কোনও আলোচনা আমি করিনি। আমার মনে হয় কংগ্রেসের এই আন্দোলনের ফলে দেশের জনসাধারণের অন্তরে বিদেশীর শাসন হতে মুক্তিলাভের যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগেছে তারই ফলে স্বাধীনতা এসে যাবে। কিন্তু সে স্বাধীনতা কি প্রকার হবে তাই ভাবছি।

আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে প্রশ্ন করলাম—স্বাধীনতার আবার রকম-ফের আছে নাকি ?

দাদা অতিশয় গম্ভীর হয়ে ধীরে ধীরে বললেন—হ্যাঁ, আছে। বিদেশী শাসনই হোক, আর স্বদেশী অত্যাচারী রাজতন্ত্র, বা যে কোনও অত্যাচারী শাসনতন্ত্রই হোক, তাকে উৎখাত করে প্রকৃত জনহিতকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে যে আন্দোলন বা বিদ্রোহ হয়, তাতে শাসক-শক্তির পক্ষে থাকে দেশের রাজা, জমিদার, ধনী ও বড় বড় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। বিদ্রোহীপক্ষে থাকে দেশের বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শিক্ষিত যুবক ও ছাত্রসম্প্রদায়, আর তাদের পিছনে থাকে দেশের শ্রমিক ও কৃষকসম্প্রদায়। সেই বিদ্রোহের ফলে দেশের মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক, কৃষকসমাজের হিতকর গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

বর্তমানে কংগ্রেসী আন্দোলনে দেখা যাচ্ছে, শ্রমিক, কৃষক, ধনী-দরিদ্র, জমিদার, প্রজা, পুঁজিপতি, বড় বড় ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, সকলেই ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। বড় বড় রাজা, জমিদার, ব্যবসায়ী, ধনী, খেতাবধারী বৃদ্ধ, আন্দোলন সফল করার জন্যে অকাতরে টাকা ঢালছেন, হাসিমুখে জেলেও যাচ্ছেন। প্রকৃত গণস্বাধীনতার পক্ষে এটা খুবই দুর্লক্ষণ।

আমি বললাম—তবে কেন আপনি দেশবাসীকে এ কথা না বুঝিয়ে অন্যত্র যাচ্ছেন? দেশে তো এখন আপনার মত নেতার প্রয়োজনই বেশী।

এখন আমার কথা এদেশের জনসাধারণ শুনবে না, কারণ তারা নেতা অর্থে বোঝে বড়লোক—বিরাট ধনী। বেকার হয়ে দেশে ঘুরে বেড়ানোর চাইতে বিদেশে যেয়ে দেখি কোনও কাজ পাই কি না।

আপনি কোন্ পথে, কি প্রকারে যাবেন?

মণিপুর সীমান্ত অথবা কক্সবাজার হয়ে হঁটাপথে যাব। কারণ তাতে আমার কাজের সুবিধা হবে। আমি পুলিসের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে চাইনে, তাতে নানা অসুবিধে হতে পারে। আমি জানি এক সন্দেহ ছাড়া আমার বিরুদ্ধে পুলিসের হাতে কোনও প্রমাণ নেই। কলকাতা ও আসামে এমন পরিচিত লোক আছে যাদের চেষ্টায় এই সন্দেহটা কাটিয়ে উঠতে পারব।

আপনি হাঁটা পথে যাবেন কেন?

মনে কর এটা আমার খেয়াল। ভারতের উত্তর ও পশ্চিমের অনেক পথই আমার পরিচিত। এবার পূবে দু-একটা পথের পরিচয় নেব।

আমাদের গাড়ি কুচবেহার পৌঁছলে কামরাটায় ভিড় হয়ে গেল। আর কোনও কথা হল না। লালমণিরহাট জংসন যতই নিকটবর্তী হতে চলল, আমার মনে ততই কেমন একটা অসহায় অভাবের ব্যথা ঘনীভূত হতে লাগল। এ জাতীয় অনুভূতি আমার জীবনে সেই

লালমণিরহাটে গাড়ি থামলে দাদা তখনই নেমে গেলেন না, কিন্তু কোন কথাও হল না। আমিও একটা অপূর্ব ভাবে অভিভূত হয়ে কিছুই বলতে পারলাম না।

ডাউন আসাম মেল এলে আমাদের বগীটা তাতে জুড়ে দিল। দাদা আমার হাত ধরে প্লাটফর্মে নেমে স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন—

ভাই, তোমাকে আমার শেষ কথা কটা বলি, তুমি এই সমস্ত দলে আর যোগ দিও না। তোমার সংসারে অনেকগুলি পোষ্য। তারা সকলেই তোমার মুখাপেক্ষী। তাদের মুখ চেয়ে উপার্জনের চেষ্টা কর, সংসারী হও। দেশ সেবা বহু প্রকারেই করা যায়। তোমাকে বহু বিষয়েই বলেছি, আবার বহু কথাই বলার সময় পেলাম না। তথাপি যা শুনেছ তা মনে রেখে আরও জানতে চেষ্টা কর। যদি শোনানর মত লোক পাও শুনিও। তাতে যদি একটা লোকও কাজে নামে, তবে দেশের অনেক উপকার হবে। এই পত্রখানা রাখ। এক সপ্তাহ পরে কলকাতা যেয়ে ঠিকানা মত পত্রখানা দেবে। ঐ ঠিকানায় আমার কিছু টাকা আছে। আমি ছাড়া আর কেউ ও টাকা ভোগ করার নেই। তুমি নিঃসঙ্কোচে ও টাকা তোমার মনে করবে। আমি গৌহাটি যেয়ে কলকাতায় পত্র লিখে সমস্ত ব্যবস্থা করে দেব।

এই বলে দাদা পত্রখানা আমার হাতে দেওয়ামাত্র,—কি জানি কেন তা বলতে পারিনে,—সেখানা খাম সমেত ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লাম। গাড়ি ছেড়ে দিল।

জানলা দিয়ে মাথা গলিয়ে দেখলাম দাদা ছেঁড়া পত্রখানা কুড়োচ্ছেন। কুড়িয়ে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। গাড়িতে বেগ দিল। নিকটে আসা সম্ভব হল না। কানে ভেসে এল, দাদা বলছেন—

ভাই, তুমি ভুল বুঝলে। বউমাদের কথা চিন্তা করে, তোমাকে—।

ইঞ্জিন বিকট হুইস্‌ল দিল, আর শুনতে পেলাম না। গাড়ি প্লাটফর্ম ছাড়ল, আর দেখতে পেলাম না।

অভিজ্ঞ ব্রহ্মচারী দাদা আমার জন্যে বাঙ্কের ওপরে কম্বল পেতে বিছানা করে রেখে ছিলেন। সেই বাঙ্কেই উঠতে হল। কুচবেহারে এক ভদ্রলোক সপরিবারে গাড়িতে উঠেছেন। পরিবারে ছ' সাতটি ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী আর মা। তার সাথে ছোট বড় গোটা দশেক মাল। নীচের ছুটো বেঞ্চ আর মেঝেটা দখল করে তাঁদের মালপত্র দিয়ে দরজা ছুটো এমন সুরক্ষিত করলেন যে পথে আর বহিরাক্রমণের ভয় থাকল না।

বাঙ্কে উঠে শুয়ে পড়লাম বটে, কিন্তু সে ঘুমানর জন্যে নয়, ভাবার জন্যে। আজ এই সুদীর্ঘ কাল পরেও সে রাত্রের সেই অদ্ভুত অনুভূতির সাথে এলোমেলো চিন্তার অনেক কিছুই মনে আছে।

প্রথমেই মনে জাগল, আজ এই শেষ বিদায়ে দাদাকে একটা প্রণামও করলাম না! এক বছর তিন মাস একসাথে কাটালাম, তার মধ্যে মাত্র গত বিজয়ার সন্ধ্যায় মিঃ রায়ের দেখাদেখি একটা প্রণাম করেছিলাম। আর আজ এই শেষ বিদায়ক্ষণে প্রণাম তো দূরের কথা, তাঁর অবাধ্য হয়ে হঠকারিতা দেখিয়ে এলাম! দাদা অতি বিচক্ষণ। অনেকবার দেখেছি আমার মনোভাবের তাৎপর্য—যা আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারিনে, তা তিনি ধরে ফেলেন। আজও আমার মানসিক অবস্থা বুঝে দাদা নিশ্চয়ই স্নেহ-আশীর্বাদই করবেন। তথাপি আমারও তো একটা কর্তব্য ছিল।

আসাম মেল তিস্তা জংসন পার হল।

দাদার শেষ কথাটা হতভাগা ইঞ্জিন শুনতে দিল না। যেটুকু শুনলাম তার মানে কি? গত পনরো মাসে বোধ হয় বার তিনেক তাঁর সাথে আমার পারিবারিক অবস্থা নিয়ে সামান্য কিছু আলোচনা হয়েছিল। লক্ষ্য করেছি বাড়ির কথা উঠে যাতে আমার মন খারাপ না হয় তার জন্যে দাদা বিশেষ সতর্ক থাকতেন। সেই জন্যেই কি তিনি অর্থ সাহায্য করতে চেয়েছিলেন? তা যদি হয় তবে সে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে ভালই করেছি। আমার মত লোকের পিছনে টাকা খরচ না করে ও টাকা তিনি অনেক ভাল কাজে লাগাতে পারবেন।

কথাটা ভেবে বেশ একটু গর্ব ও আনন্দ বোধ করলাম।

আসাম মেল তিস্তা ব্রীজে উঠছে।

দাদা একদিন বলেছিলেন, এ জগতে কোনও ঘটনাই নিরর্থক নয়। এই যে তোমাতে আমাতে একত্র হওয়া, এরও একটা তাৎপর্য আছে। ভগবান হয়তো এই মিলনের পরিণতি দিয়ে একটা বিশেষ ঘটনা ঘটাতে চান। হয়তো আমি যা ভেবেছি মাত্র, তুমি তা কার্যকরী করবে।

আমি দাদার কোন্ উদ্দেশ্য কার্যকরী করতে পারি? দেশের কাজে বিপ্লবী দলে যোগ দিতে নিষেধ করেছেন। কংগ্রেসের বর্তমান অবস্থা তিনি সমর্থন করেন বলে মনে হয় না।

আসাম মেল ব্রীজ পার হয়ে কাউনীয়া জংসনের দিকে ছুটছে।

আমি যদি দাদার কথিত বিষয়গুলি নিয়ে পড়াশুনা করি, যদি চেষ্টা করে চিন্তাশীল শিক্ষিত সমাজে মিশে তাঁদের সাথে আলোচনা করি, তবে হয়তো কিছু কাজ হলেও হতে পারে। কিন্তু আমার যা সাংসারিক অবস্থা, তাতে দু-বেলা দু-মুঠো 'অন্ন চিন্তাই চমৎকার'। এ অবস্থায় পড়াশুনা চালাব কি করে? আর যদিই বা কোনও প্রকারে পড়াশুনা চালাই, আমার কথা শুনবে কে? যে দেশে ধন-গৌরবে বিদ্যা-গৌরব প্রাপ্ত হয়, যে দেশে ধন-সম্পদ হচ্ছে সব বিষয়ে নেতৃত্বের মাপকাঠি, সে দেশে আমার মুখে কালীশঙ্কর ব্রহ্মচারীর কথা শুনবে কে?

তবে কি এই জন্যেই দাদা অর্থ সাহায্য করতে চেয়েছিলেন? বোধ হয় অভিপ্রায় তাই ছিল। তাঁর বউমাদের খাওয়া পড়ার চিন্তা হতে আমাকে মুক্ত করে এই কাজেই লাগাতে চেয়েছিলেন। হায় হায়, হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেললাম! নিশ্চয়ই চিঠির মধ্যে তাঁর ঠিকানা ছিল। এখন কি উপায় করি? মনের ভুলে গৌহাটির ঠিকানাটাও তো জেনে রাখিনি!

কাউনীয়া জংসনে আপ আসাম মেল এসে ডাউন আসাম মেলের পাশে দাঁড়িয়েছে। আপ মেল ছাড়ার ঘণ্টা হল।

হঠাৎ মনে হল, লালমণির হাটে এই আপ মেলেই তো দাদা উঠবেন।

এক লাফে নীচে নেমে আর এক লাফে জানলা দিয়ে প্লাটফর্মে পড়লাম। প্যাসেঞ্জার বগীর শেষ হ্যাণ্ডেলটা ধরেও ধরতে পারলাম না। শেষের তুটো লগেজ ভ্যান ; হ্যাণ্ডেল, ফুটবোর্ড, কিছুই নেই।

আপ আসাম মেল আমার শেষ মুহূর্তের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে, রক্ত চক্ষু দেখাতে দেখাতে আমার দাদাকে কামাখ্যামায়ের চরণে পৌঁছে দিতে চলে গেল।

শ্রীশ্রীডাণ্ডা ব্রহ্ম

নবদ্বীপ বাসায় এসে দেখলাম, অবস্থা একই প্রকার চলছে। প্রাচীনকালে কোন এক ঋষি বলেছিলেন,—'স্বচ্ছন্দ বনজাতেন শাকেন সম্প্রপূর্যতে। ইমং দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্যাৎ পাতকং মহৎ'॥ এই উক্তি বা উপদেশ যে কালের, সে কালে বোধহয় ভারতের জনসংখ্যা কোটি পাঁচ-সাত ছিল। অথবা বক্তা উত্তর বঙ্গের তরাই অঞ্চলে, বা আসামের ঢেকুয়া শাকের বনে বসে বলেছিলেন। এ অঞ্চলে অনেকেরই একটা দগ্ধোদর থাকা সত্ত্বেও উদরের অগ্নি নির্বাপণের জন্যে শাক কোথাও স্বচ্ছন্দে জন্মায় না। রেল লাইনের ধারে কিছু কিছু বুনো-কচু আর বাঘা ওলের ডাঁটা দেখা যায় বটে, তবে ওগুলো স্বচ্ছন্দে জন্মালেও স্বচ্ছন্দে কেটে আনা যায় না। রেল গুমটির পাহারাদার তার মা, বউ, ছেলেমেয়ে নিয়ে তাদের প্রধান আয়ের ফসল ঐ ডাঁটাগুলো দিনরাত পাহারা দেয়।

মা'র মুখে শুনলাম, শিষ্যদের মধ্যে অনেকে নাকি আমার দর্শন পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। গুরুগিরি আমার পোষায় না, তার কারণ আমরা জাতগোঁসাই নই। যাঁরা জাতগোঁসাই, তাঁরা কানে তুলো গুঁজে, মনের ওপরে উদারতার প্লাস্টার লাগিয়ে, সব অবস্থায় হেসে গুরুগিরি করতে পারেন। আমার পক্ষে তা অসম্ভব। তথাপি মার কথামত আর প্রয়োজনের তাগিদে, ব্যাকুল ভক্তদের কৃতার্থ করার জন্যে যেতে হল।

পূর্ববঙ্গে পদ্মানদীর ধারে প্রথম যার বাড়িতে উপস্থিত হলাম, সে আমার দর্শনের জন্যে কতটা ব্যাকুল হয়েছে সে খোঁজ না করে, তাকে দেখে আমিই ব্যাকুল হলাম। লোকটির বিছানা থেকে ওঠার সামর্থ্য নেই। সারা গায়, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। হাড়ভাঙ্গা মার খেয়েছে।

শিষ্যটি জাতিতে জেলে। ও অঞ্চলে সে একজন প্রধান ব্যক্তি। পদ্মায় তার বেড় জালই সর্বাপেক্ষা নামকরা। আমার গুরুগিরির সে দ্বিতীয় শিষ্য। তাকে আন্তরিক ভালও বাসি।

ঘটনা শুনলাম,—পদ্মানদীতে ইলিস মাছ ধরা ব্যাপারে জমিদারদের একটা খুঁটোগাড়ী প্রথা আছে। জলার জমিদাররা জেলেদের মাথা-পিছু, জাল-পিছু ও নৌকা-পিছু দফায় দফায় খাজনা, নজর-সেলামী ইত্যাদি আদায় তো করেনই, অধিকন্তু বড় বড় জালে ধরা মাছ জমিদার কর্তৃক নির্দিষ্ট দালালের আড়তে বিক্রী করতে বাধ্য করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে জেলেরা মাছের ন্যায্য দামের অর্দ্ধেকও পায় না।

জমিদারের নির্দিষ্ট দালাল যেখানে আড়ৎ খোলে, সেই আড়তের ঘাট খুঁটোগাড়ীর ঘাট নামে পরিচিত। জলার জমিদারীর অংশীদার প্রত্যেক জমিদারের পৃথক পৃথক নায়েব, গোমস্তা ও আট-দশজন লাঠিয়াল-পেয়াদা সমেত বড় বড় পানসী নৌকা পদ্মায় ঘোরাফেরা করে। এই সমস্ত পানসীর নির্দিষ্ট ঘাটিও ঐ খুঁটোগাড়ীর ঘাট।

জেলেরা এই খুঁটোগাড়ী প্রথা তুলে দেওয়ার জন্যে তিন বছর যাবৎ বিদ্রোহ করেছে। মারামারি, দাঙ্গা, মামলা মোকদ্দমা বহু চলছে। তারই এক দাঙ্গায় আমার শিষ্যটি মার খেয়েছে।

রাত্রে আরও অনেকে এসে জমল। তার মধ্যে চার পাঁচজন মৎস্য ব্যবসায়ী মুসলমান নিকারী ছিল। এই নিকারী সম্প্রদায়ও জেলেদের মত নিরীহ। খুঁটোগাড়ী প্রথায় নিকারীদেরও যথেষ্ট অসুবিধে হয়েছে।

তাদের মুখে শুনলাম মারামারি, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় মারটা জেলেরাই বেশী খায়। ফৌজদারী মামলার আসামীও সব জেলেরাই। তাদের পক্ষে ফৌজদারী মামলা করার বিশেষ কোনও সুবিধে নেই। মার খেয়ে

থানায় এজাহার দিতে গেলে দারোগা সাহেব তখনই তাদের হাজতে পোরেন। সোজা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের দরবারে গেলে, তিনি দেন সার্কেল অফিসারের ওপরে তদন্তের ভার। সে তদন্তের রিপোর্টে সমস্ত দোষ জেলেদের বলে লেখা থাকে। জমিদারদের বিরুদ্ধে জেলেরা যে দেওয়ানী মামলা চালাচ্ছে, তার গতি-প্রকৃতি শুনে বুঝলাম, সে মামলা শেষ হতে দু-চার পুরুষ শেষ হবে।

জেলেদের এক পরম হিতৈষী জুটেছেন। তিনি এক সাধুবাবা। সাধুবাবার সাকরেদরাই জেলেদের পক্ষে মামলা মোকদ্দমা সব পরিচালনা করছেন। এই সুযোগে তিন বছরে কি পরিমাণ টাকা সাধুবাবার গহ্বরে ঢুকেছে সেটা বুঝতে হলে হিসেব করতে হবে যে, প্রায় পঞ্চাশ হাজার জেলে এই ব্যাপারে জড়িত, আর তারা প্রতি বৎসর মথাপিছু অন্তত পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়েছে।

সমস্ত শুনে মন খুবই চঞ্চল হয়ে উঠল। এদের জন্যে একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু কি করি? মামলা করে কোনও ফল হবে না, কারণ সরকারী নীচতলা থেকে ওপরতলার অনেক দূর পর্যন্ত জমিদারদেরই প্রভাব প্রতিপত্তি। তারপর এরা কোর্টে দাঁড়িয়ে উকীলের তাড়া খেলে সত্য কথাও ভুলে যায়। বর্তমান অবস্থায় কোনও আপোষ মীমাংসাও সম্ভব নয়। কারণ স্বয়ং জমিদারের মন যদি বা একটু নরম হয়, কর্মচারীরা আপোষ হতে দেবে না। জলার জমিদারীতে জমিদার অপেক্ষা তাঁদের কর্মচারীদের উপার্জন বেশী। এ অবস্থায় কি করা যায়?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ব্রহ্মচারী দাদার ডাণ্ডাব্রহ্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা মনে পড়ে গেল। কথাটা উঠেছিল মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতি নিয়ে। দাদা বলেছিলেন—

বর্তমানে দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী অহিংস অসহযোগ-আন্দোলন উপযোগী। কারণ এদেশের মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া আর সকলেই রাজনৈতিক চেতনাহীন, ও স্বাধীনতার জন্যে জীবনপণ করতে কুণ্ঠিত। এ অবস্থায় এই আন্দোলনে দেশের সর্বস্তরে একটা সাড়া জেগেছে,

এবং প্রায় সকলেই কোনও না কোনও প্রকারে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। এই অহিংস নীতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীনতা আন্দোলন কিন্তু একমাত্র সুসভ্য আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধেই চলতে পারে, অন্যত্র এ নীতি অচল। রাষ্ট্র পরিচালনায় অহিংস নীতি একেবারে 'সোনার পাথুরে বাটি'। তবে যদি কেউ আমাদের একশ্রেণীর বৈষ্ণবীয় অহিংসার মত করে নীতিটি প্রয়োগ করতে পারেন, তবে সেটা যে কার্যকরী হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম,—বৈষ্ণবীয় অহিংস নীতি আবার কেমন?

দাদা বললেন—একটা গল্প শোন।—এক ধনীর বাড়িতে সন্ধ্যারাত্রে এক চোর ধরা পড়ে খুব মার খাচ্ছে। বাড়ির কর্তা গোঁড়া বৈষ্ণব; ওপরতলায় ঘরে বসে মালা জপ করছিলেন। গোলমাল শুনে, গায়ে নামাবলী জড়িয়ে, মালার থলে হাতে, কর্তা নীচে নেমে এসে মার থামিয়ে বললেন,—আহা-হাঃ, শ্রীকৃষ্ণের জীবকে কি এমন করেই মারতে হয়! আর একটু হলে যে আমানি হয়ে যেত, লালকষ বেরিয়ে বাড়িটাই অপবিত্র করত। তোরা ওকে হাত-পা-মুখ বেঁধে, একটা বড় চটের থলেয় পুরে, নদীতে গভীর জলে ফেলে দিয়ে আয়। থলেটার সাথে দশখানা থান ইট শক্ত করে বেঁধে দিস, যেন ভেসে না ওঠে।

এই বৈষ্ণবকর্তার মত অহিংস নীতি যদি কেউ রাজনীতিতে চালাতে পারেন তবে সেটা চমৎকার। আমাদের শাস্ত্রেও আছে।

আমি দাদার কথায় বাধা দিয়ে বললাম—আপনি 'আমানি' আর 'লালকষ' দুটো শব্দ ব্যবহার করলেন। ও দুটোর অর্থ তো পরিষ্কার বুঝলাম না।

আরে, তুমি না বৈষ্ণব গোসাঁই! তুমি তোমাদের পেটেণ্ট ভাষা জান না? এই অতি আধুনিক কালে, একশ্রেণীর উৎকট বৈষ্ণব তাঁদের 'ধম্ম' বাঁচানর জন্যে প্রচলিত অনেকগুলো শব্দের বিকল্প তৈরী করেছেন। কাটা, কোটা, রক্ত, বিল্বপত্র, মা-কালী, এ সমস্ত শব্দ উচ্চারণ করা তো দূরের কথা, যদি অপর কারও মুখে শোনেন, তবে

কানে আঙ্গুল দিয়ে বলেন,—'গৌরহরি, এও শোনালে'। আমি একবার পূর্ববঙ্গে এক গোস্বামী প্রভুর বাড়ি যেয়ে বিব্রত হয়েছিলাম। গোসাঁই তরকারি কুটছিলেন। আমি কি একটা কথা নিয়ে 'তরকারি কোটা' বলে ফেলি। ফলে গোসাঁই তাঁর কোটা, অকোটা সমস্ত তরকারি ফেলে দিয়ে ঝুড়ি, বঁটি ধুতে লেগে গেলেন। এঁরা কাটা-কোটাকে বলেন আমানিকরা। রক্ত হচ্ছে লালকষ। মা কালীর নাম যদি নিতান্তই উচ্চারণ করতে হয় তবে বলেন হাতি শুঁড়োর মা। বেলপাতার নাম তিফড়্কে। এ প্রকার অনেক শব্দ আছে। যে মনোবৃত্তি হতে এই শব্দগুলির উৎপত্তি, সেটা কিন্তু আদৌ হিন্দু শাস্ত্রোক্ত অহিংস মনোবৃত্তি নয়, ওটা বৌদ্ধ অহিংসার বিকৃত রূপ। এই বিকৃত অহিংসার মুখোস পরে স্বার্থপর ধূর্তেরা জনসাধারণকে প্রতারণা করে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করে। তারা জনসাধারণকে শোনায় শান্তির বাণী, উপদেশ করে সর্ববিষয়ে অহিংস হতে। কিন্তু নিজের মৎলব হাসিল করতে যদি প্রয়োজন হয়, তবে অতি ঘৃণিত হিংসা আচরণ করতেও কুণ্ঠিত হয় না।

এখন শোন যা বলতে চাচ্ছিলাম,—আমাদের শাস্ত্রেও আছে 'অহিংসা পরম ধর্ম'। কিন্তু সে অহিংসার তাৎপর্য যদি অত্যাচারী আক্রমণকারীর করুণা উদ্রেকের আশায় পড়ে মার খাওয়া হয়, তবে সে অহিংসা হিন্দুশাস্ত্রসম্মত নয়। হিন্দুশাস্ত্রসম্মত অহিংসার স্বরূপ বুঝতে হবে শ্রীভগবান নারায়ণের শ্রীমূর্তি দেখে।

দেব-শ্রেষ্ঠ নারায়ণ, তাঁর চার হাত। চার হাতের মধ্যে একখানা খালি হাত অপূর্ব ভঙ্গীতে সম্মুখে প্রসারিত, যেন হ্যাণ্ড-সেক করতে চাচ্ছেন। ও হাতের তাৎপর্য হচ্ছে,—এস ভাই, আর গণ্ডগোল করে কি হবে। এস, আমরা পরস্পর আপোষে বিবাদ মীমাংসা করি।

এ আহ্বানে যদি বিপক্ষ সাড়া না দেয়, তবে দ্বিতীয় হাতে আছে শঙ্খ। অর্থাৎ সভাসমিতি করে এমন বক্তৃতা ঝাড়ব, আর বড় বড় মিছিল করে এমন জোরালো শ্লোগান দেব যে, বিপক্ষের কানের তালা ফেটে হৃৎকম্প উপস্থিত হবে।

নারায়ণের এই দুখানা হাত হচ্ছে অহিংস। তাঁর এই দুখানা অহিংস হাতের প্রকৃত শক্তি যোগাচ্ছে আর দুখানা হাত। সে দুখানায় আছে গদা আর চক্র।

তাঁর তৃতীয় হস্তে গদা, যাকে আমরা বলি মুগুর। এই মুগুরে হাতের তাৎপর্য,—দেখ, আমার আবেদন-নিবেদন, মিছিল-শ্লোগানেও যদি তোমাদের চৈতন্য না হয়, তবে এই মুগুর দিয়ে এমন অহিংস পেটান পিটব যে লালরক্ত বেরোবে না বটে, কিন্তু হাড় চুর চুর হয়ে যাবে।

তারপর শেষ ও চরম হাতে আছে সুদর্শন চক্র। একগুঁয়ে বিপক্ষ যদি ঐ তিন প্রকার উপায়েও বাগে না আসে, তবে কাঁধের ওপর থেকে মাথাটা সরিয়ে দিলে লালরক্ত কিছু বেরোবে সত্য, কিন্তু তার ফল হবে একেবারে সুদর্শন। কোনও সমস্যার মীমাংসায় কোনও অসুবিধে ঘটবে না।

পরম বুদ্ধিমান নারায়ণ ঠাকুর তাঁর চার হাতের চারটি ব্যবস্থা, বিপক্ষের সম্মুখে এক যোগেই উপস্থিত করেন বলেই তাঁর অহিংস নীতি কার্যকরী হয়।

আরও লক্ষ্য করে দেখ, আমাদের সমস্ত দেব-দেবীই সশস্ত্র। এমন যে শিবঠাকুর, তিনিও মহাযোদ্ধা। যোগ সাধন করতে বসেও হাতের কাছেই ত্রিশূলটা রাখেন। শিব ঠাকুরের গিন্নী তো মা-রণরঙ্গিণী। তবে তাঁর দুটো মেয়ে নিয়ে একটু আপত্তি উঠতে পারে বটে, কিন্তু তার একটার মীমাংসা কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ করেছেন, 'লক্ষ্মী খোঁজে শুধু বলীর বাহু, চাহে না ধর্মের পানে।' আর দেবী সরস্বতী সম্পর্কে, বেত থামালে, তো ছেলে উচ্ছন্নে দিলে, এই প্রবাদ বাক্যটি যে কত বড় সত্য, তা আর এখন বলে বুঝানোর দরকার করে না।

বিকৃত অহিংস নীতি এবং বিকৃত ধর্মবোধের স্বরূপ ও তার পরিণতি, ব্যাসদেব মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডব-চরিত্রে সুন্দর করে দেখিয়েছেন। পঞ্চপাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মহা ধার্মিক ও শান্তিপ্রিয়। সমস্ত বিবাদ-বিসম্বাদ তিনি অহিংস নীতি অবলম্বনে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অপর পক্ষে অন্ধ অক্ষম সম্রাট ধৃতরাষ্ট্রের

দুর্যোধনাদি শত পুত্র বাল্যকাল হতেই ছলে বলে কৌশলে তাদের ন্যায্য অংশীদার পঞ্চপাণ্ডবের অনিষ্ট সাধনে সচেষ্ট। তাদের সে অপচেষ্টায় শান্তিকামী অহিংস যুধিষ্ঠির উত্তেজিত হন না, তাঁর কনিষ্ঠ দুই ভাই মহাবীর ভীম ও অর্জুনকেও সহিংস উপায়ে কোনও প্রতিকার করতে দেন না। যুধিষ্ঠিরের এ ক্লীব নীতির চরম পরিণতি হল, দুর্যোধনের নির্দেশে পাণ্ডব কুলবধূ সুন্দরী দ্রৌপদীর চুল ধরে টেনে এনে কুরুরাজসভায় সর্বসমক্ষে উলঙ্গ করার চেষ্টা।

সে রাজসভায় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁর অহিংস নীতি আঁকড়ে ধরে বসে আছেন। যুধিষ্ঠিরের আনুগত্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মহাবীর ভীম ও অর্জুন তাঁদের মহাগদা ও ধনুঃশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব, অক্ষয় তূণীর পাশেই ফেলে রেখে, দেখছেন আক্রান্ত দ্রৌপদীর আত্মরক্ষার নিষ্ফল চেষ্টা, শুনছেন তার করুণ বিলাপ, আর নরপশুদের অশ্লীল উপহাস!

সেদিন এই ঘটনা বর্ণনা করতে যেয়ে ব্রহ্মচারী দাদা অতিশয় উত্তেজিত কণ্ঠে বলেছিলেন—আমি জানিনে এ ঘটনা সত্য কি না। যদি সত্য হয়, তবে বুঝতে হবে, সে সভায় এই ঘটনার সম্মুখে যাঁরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন, তাঁরা ঐ নরপশুগুলোর চাইতেও অধম; তা সে ধর্মরাজ উপাধিপ্রাপ্ত যুধিষ্ঠিরই হন, আর শান্তিপর্বের ধর্মবক্তা ভীষ্মদেবই হন।

আর যদি বিকৃত ধার্মিকতা এবং উৎকট অহিংসার স্বরূপ ও তার পরিণতি দেখানোর জন্যে ব্যাসদেব এ চিত্র এঁকে থাকেন, তবে সার্থক তাঁর এ অঙ্কন।

অত্যাচারী আক্রমণকারীর নির্যাতনের সম্মুখে অহিংস হয়ে পড়ে থেকে নির্যাতন সহ্য করলে, ন্যায়-নীতি ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন তৃতীয় পক্ষ এসে অত্যাচারীকে বাধা দেবে, অথবা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে জনমত গঠিত হবে, এ ধারণাও যে কতবড় ভুল, তাও ব্যাসদেব ভাল করেই দেখিয়েছেন। সে সভায় ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামার মত মহাবীর মহারথীরা সব উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা কেউই অহিংস শান্তিকামী ধার্মিক পাণ্ডবদের কুলবধূর এই লাঞ্ছনা চোখের ওপরে

দেখেও তাঁকে রক্ষা করতে উঠে দাঁড়াননি। এর যে কৈফিয়ৎ আমরা মহাভারতে দেখতে পাই, সে কৈফিয়ৎ অতি তুচ্ছ হলেও শিক্ষাপ্রদ। উৎকট শান্তিবাদ ও অহিংস নীতি অবলম্বনে ক্লীবত্বপ্রাপ্ত পাণ্ডবদের প্রতি কারও কোনও সহানুভূতি নেই, সমর্থনও নেই। এই মনোভাব আরও সুস্পষ্ট হয়েছে, কুরুক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সৈন্য সমাবেশে। তাতে দেখা যায়, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টা সত্ত্বেও তৎকালের যোদ্ধা বীর রাজন্যবর্গ কাপুরুষ ধার্মিক যুধিষ্ঠিরের পক্ষ সমর্থন করা অপেক্ষা, বীর অধার্মিক দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দেওয়াই শ্রেয় মনে করেছিলেন।

এই প্রকার শান্তিবাদ ও অহিংসনীতির আর একটা মারাত্মক কুফল হচ্ছে, এই বাদ ও নীতির অবলম্বনকারী ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে ও তার মনোবল নিঃশেষ হয়ে যায়। মুখে সে যত আস্ফালনই করুক না কেন, প্রবলের সাথে প্রকৃত সংঘর্ষের ক্ষেত্রে, তার ক্লীবত্ব প্রকাশ পায়। তখন সে ধর্মের দোহাই, নীতির দোহাই, ঐতিহ্যের দোহাই, অনেক কিছুর দোহাই দিয়ে তার নিজের কাপুরুষত্ব ও ক্লীবত্ব ঢাকতে চায়। এরও চমৎকার দৃষ্টান্ত, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে, মহাবীর অর্জুনের কাপুরুষোচিত ভয়। যার জন্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ক্লীব বলে তিরস্কার করেছেন।

শান্তিকামী অহিংস যুধিষ্ঠিরের ভাই মহাবীর ভীমার্জুন অব্যবহৃত মরচে ধরা তলোয়ারের মত পড়েছিলেন। বাস্তববাদী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ অকার্যকরী নীতিগুলি দূর করে ভীমার্জুন তরবারিতে গীতার উপদেশরূপ শান দিয়ে, যখন যথোপযুক্ত প্রয়োগ করলেন, তখনই প্রকৃত ন্যায়নীতি ও ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হল। ব্রহ্ম-কৃষ্ণ ও ডাণ্ডা-ভীমার্জুনই তৎকালে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার দূর করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

তবে এই ডাণ্ডাব্রহ্মের প্রয়োগটা সেযুগে কুরু-পাণ্ডবের ব্যাপারে একেবারে শেষের দিকে হয়েছিল। ফলে ভারত বীরশূন্য হয়ে গেল। আর তার সাথে সাথে ভারতীয় অস্ত্র-শস্ত্র এবং যুদ্ধবিদ্যাও লোপ হয়ে গেল। যদি কুরুপাণ্ডব-ব্যাপারের প্রথম দিকেই ডাণ্ডাব্রহ্ম মীমাংসায় অগ্রসর হতেন, তবে আজ ভারত বিদেশীর পদানত হত না। যে কোনও

কাজ সময়মত না করে 'দেখি কি হয়' নীতি অবলম্বনের ফল ভাল হয় না। ডাণ্ডাব্রহ্মের প্রয়োগক্ষেত্রে এটা অতি প্রয়োজনীয় নীতি হওয়া উচিত। স্বভাবদুষ্টকে সময় ও সুযোগ দেওয়া ঠিক নয়।

যাই হোক গীতার শেষ বাণীটিই অত্যাচারিত প্রবঞ্চিত শোষিত জনসমাজের প্রকৃত কার্যকরী বাস্তব পথনির্দেশক।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীঃ বিজয়ঃ ভূতিঃ ধ্রুবা নীতিঃ মতির্মম॥

কালীশঙ্কর ব্রহ্মচারী দাদার এই কথাগুলি মনে পড়তেই উপায় স্থির হয়ে গেল। দুদিনের চেষ্টায় অনেকগুলো মাতব্বর একত্র হল। নিতান্ত নিরীহ জাত, অনেক করে বুঝানোর পর সম্মত হল। দশ দিনের মধ্যেই প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ হয়ে গেল। আর সাত দিনের মধ্যেই কুড়িজন ধনুর্ধর পার্থ ও গদাধারী ভীম এসে গেল। তারপর এক শুভ রাত্রে পাঁচখানা নৌকারথে চড়ে পদ্মানদী-কুরুক্ষেত্রে অভিযান করা হল।

পদ্মানদীর উজানে দুদিন আর ভাটিতে দুদিন অভিযানেই দুর্যোধন-দের পানসী-রথ পদ্মা-কুরুক্ষেত্রে অদৃশ্য হয়ে গেল। দুর্যোধনদের সৈন্য-সামন্ত মেরধা-লাঠিয়ালের দল সূচনাতেই লাঠি-সড়কি ফেলে নদীতীরের ঝাউবনে বা পাটক্ষেতে মাথা দিল, দুর্যোধনদের কি হবে, সে চিন্তাই তাদের মনে জাগল না। এ প্রকার অবস্থায় 'চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা' নীতিই তাদের পক্ষে কার্যকরী। দুর্যোধনেরা হাতের বন্দুক ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পদ্মায়। প্রাণের দায়ে ভাঙ্গা হাত পায় কোনও প্রকারে পৌঁছে গেলেন তাঁরা অন্ধ সম্রাট ধৃতরাষ্ট্রের পদতলে।

পুলিস খুব হৈ-চৈ আরম্ভ করল। ভীমার্জুনেরা ঠিক সময়মত হাসিমুখে দেশে চলে গেছে। পুলিসে তাদের ছায়ার সন্ধানও পেল না। অনেকগুলো নিরীহ জেলে চালান হয়ে গেল, কিন্তু কোনও সাক্ষী পাওয়া গেল না। যা দু-চারজন মিথ্যে সাক্ষি দিতে কোর্টে উপস্থিত হল, তারাও জেলেদের পক্ষের বাঘা বাঘা উকীল-মোক্তারের জেরার গুঁতোয় ঘায়েল হয়ে গেল। সমস্ত আসামী বেকসুর খালাস পেতে লাগল।

এই অভিযানের পর তিন মাস যেতে না যেতেই জমিদার-পক্ষ হতে আপোষ-আলোচনার নিমন্ত্রণ এল। জেলে ও নিকারীদের দাবী-অনুযায়ী সরাসারি জমিদারদের সাথেই আলোচনা হল। শেষ মীমাংসা হতে মোটেই সময় লাগল না। আশ্চর্য্যের বিষয় জমিদারেরা তাঁদের জলার জমিদারীতে জেলে প্রজাদের ওপরে অত্যাচারের স্বরূপটা যে কি, তাই জানতেন না। সমস্ত শুনে, সব জমিদারই জেলেদের জন্যে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে জেলে ও নিকারীদের আইন-সঙ্গত ন্যায্য দাবীগুলি সব মেনে নিয়ে আপোষ করলেন।

জমিদারদের সাথে এই আলোচনায় তাঁদের কর্মচারীরা কোনও বাধা দিল না। নীতিবাক্য আছে "সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজন্তি পণ্ডিতাঃ।" এই কর্মচারী গোষ্ঠী সে অর্ধরক্ষার চেষ্টাও করল না। তাদের মনোভাব বোধ হয় 'চাকরিটা টিকে থাকলেই বাঁচি।'

আদালতের মামলা কতকগুলি চুক্তি অনুযায়ী আপোষ হল। কতকগুলো উভয় পক্ষের অনুপস্থিতির জন্যে কয়েকবার মুলতুবী থেকে খারিজ হয়ে গেল।

এত বড় একটা কামধেনু হাত থেকে ছুটে যাওয়ায় পুলিস ও কতকগুলো উকীল মোক্তার আপসোসে আঙ্গুল চষতে লাগলেন। তবে সব চাইতে বুকফাটা দুঃখ হল জেলেদের পরম হিতৈষী সাধুবাবার, আর তাঁর সাকরেদদের।

সাধুবাবা প্রথম ভয় দেখালেন। তারপর তীব্র ভাষায় নিন্দা করলেন। শেষে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। অনেকের নিকটে নাকি বলেছেন, হ্যাঁ, জেলেদের জন্যে এই প্রকার একটা কিছু করার কথা প্রথম আমারই মনে জেগে ছিল। কিন্তু শ্রীভগবানের কোনও সাক্ষাৎ নির্দেশ না পাওয়ায় আমি আর ঐ ঘৃণিত হিংসার পথ অবলম্বন করিনি।

জমিদারের সাথে আপোষ হয়ে গেলে সাধুবাবার চেলারা দলে দলে জেলে মহলে খুব ঘোরাফেরা আরম্ভ করলেন। জেলেরা যে, তিন দফা খাজনা দেয়, এটাও বে-আইনী জুলুম। মামলা করলেই এ জুলুম

বন্ধ হবে। সে মামলায় জেলেদের মোটেই কোনও বেগ পেতে হবে না। সব ব্যবস্থা সাধুবাবা ও তাঁর অনুচরেরাই করবেন। মাতব্বরেরা কেবল কয়েকখানা কাগজে টিপসই দিলেই চলবে। তারপর জেলে ও নিকারীদের একটা নিজস্ব ব্যাঙ্ক ও একটা সোসাইটি করা নিতান্ত প্রয়োজন। ব্যাঙ্ক ও সোসাইটি হলে, জালের সুতো, আলকাতরা সমস্ত অর্ধেক মূল্যে পাওয়া যাবে। এই সমস্ত লাভজনক সৎ-পরামর্শ সাধুবাবা ও চেলারা শোনাতে আরম্ভ করলেন। ব্যাপার ঘোরালো বুঝে আরও কিছুদিন জেলেদের মধ্যে থেকে গেলাম।

শেষ পর্যন্ত চেলাবাবাজীরা যখন বুঝলেন নির্বোধ জেলেগুলো তাঁদের সুপরামর্শ আদৌ বুঝতে চায় না, জেলেদের নৌকায় গেলে, রান্নার সময় টাঁই মাছের পেটীর পরিবর্তে ইলিস মাছের পিছে আসে, তখন বাধ্য হয়ে জেলেদের হিতাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে অভিসম্পাত করতে করতে "মনের দুঃখে তপোবনে গেলেন, রইল না আর কেউ"।

আমিও কালীশঙ্কর দাদার ডাণ্ডাব্রহ্মের অপার মহিমা প্রত্যক্ষ দর্শন, শ্রবণ ও অনুভব করে পরম পুলকিত হয়ে মুগ্ধ চিত্তে চারমাস পরে নবদ্বীপ চললাম।

চাকরির সন্ধানে

নবদ্বীপ বাসায় এসে আবার প্রাইভেট টিউশনি খুঁজতে লেগে গেলাম। মাসখানেক চেষ্টা করে একটা ছাত্রও জুটল না। ইস্কুলে যাঁরা মাষ্টারী করেন তাঁরাই এক অদ্ভুত কোচিং ক্লাসের ব্যবসা খুলেছেন। এক এক মাষ্টারমশাই প্রত্যহ তিন-চার দফায় ত্রিশ থেকে পঞ্চাশটি ছাত্র পড়ান। এ ব্যবসায় তাঁদের ইস্কুলের মাইনের চাইতে অনেক বেশী আয় হয়। যে সমস্ত ছাত্রের বাপের টাকা আছে, তারা পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্নপত্র সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান প্রাপ্তির আশায়, ঐ সমস্ত কোচিং ক্লাস-হট্টমন্দিরেই ভর্তি হয়।

তারপর আমি যে একজন রাজনৈতিক সন্দেহভাজন ব্যক্তি, তাও প্রচার হয়েছে।

অনেক ভেবেচিন্তে মা'র পরামর্শমত চাকরির সন্ধানে কলকাতা গেলাম। কলকাতা যেয়ে বেলা ন'টা হতে পাঁচটা পর্যন্ত অফিসে অফিসে ঘুরি। প্রায় সব অফিসেই 'নো ভেকেন্সী—চাকরি খালি নাই' নোটিস টাঙ্গানো দেখি। যেখানে নোটিস নেই, সেখানে কোথায় কার নিকটে চাকরির উমেদারী করতে হবে, তা বুঝতে পারিনে। যার কাছে যাই, সেই বিরক্ত হয়।

চার-পাঁচখানা সংবাদপত্রে চাকরির বিজ্ঞাপন খুঁজি। বিজ্ঞাপন পাইও। তদনুযায়ী দরখাস্ত লিখে নিয়ে দেখা করি। কেউ বলেন,—আপনার আসার পূর্বেই লোক ভর্তি হয়ে গিয়েছে। কেউ আমার দরখাস্তখানা ফাইলে রেখে দিয়ে, সময় মত পত্রদ্বারা জানাবেন বলে বিদায় করেন।

থাকি হ্যারিসন রোডের ওপরে ধর্মশালায়। একটার মেয়াদ ফুরোলে আর একটা খুঁজে নেই। সেকালে হ্যারিসন রোডের ওপরে শিয়ালদহের কাছাকাছি অনেকগুলো পশ্চিমে রুটির দোকান ছিল। এক পোয়া আটার একখানা বড় রুটি, আর খোসাসমেত আস্ত সাদা মটরের ডাল এক হাতা, পাঁচ পয়সায় পাওয়া যেত। দিনের বেলায় পাঁচ পয়সা খরচ করে ঐ ডাল রুটি খেয়ে নিতাম। রাত্রে এক বর্ধমানী ঠাকুরের 'বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণেরহোটেল'-এ তিন আনা দিয়ে কাঁকরমণি চালের ভাত, পুঁইকুমড়োর ঘ্যাঁট, আর কাঁচা কলাই-এর ডাল ধোয়া বিশুদ্ধ জল পেট ভরে খেতাম! তাতেও যে বারো টাকা হাতে করে কলকাতা এসেছিলাম তার অর্ধেক ফুরিয়ে গেল, চাকরির সন্ধান মিলছে না।

চা-বাগানে চাকরি করতে যেয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম, তাতে ভেবেছিলাম,—চাকরি যদি করতেই হয়, তবে সাহেব কোম্পানির দ্বারস্থ হব না। কিন্তু নিদারুণ অভাবের তাড়নায় আমার সে সঙ্কল্প সিকেয় উঠে গেল। কলকাতায় যেয়ে দেখলাম সবই সাহেব! বরং বিলেতী সাদা সাহেবদের অফিসে একটু ভদ্র ব্যবহার পাই। মারোয়াড়ী

সাহেব, ভাটিয়া সাহেব, বোম্বেওয়ালা সাহেব, এই সমস্ত দেশী ট্যাঁস সাহেবদের অফিসে সেটুকুও মেলে না।

সে দিন ক্লাইভ স্ট্রীটের কয়েকটা আফিসে ঘুরে, লাল দিঘির ধারে এসে বসেছি। বড় পোস্ট অফিসের ঘড়িটায় চারটে বাজল। ফিট্‌ফাট্‌ কোট প্যাণ্টপরা এক ভদ্রলোক এসে, আমার বেঞ্চটাতেই বসলেন। মিনিট দুই চুপচাপ থেকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি চাকরি খুঁজছেন ?

আমি উত্তর দিলাম—হঁ্যা। চাকরিই খুঁজছি।

তবে আপনি অফিসে ঢুকে 'নো ভেকেন্সী' নোটিস দেখেই চলে আসেন কেন ? আমিও আজ কদিন ধরে চাকরি খুঁজছি। আপনাকেও ঘুরতে দেখি। কিন্তু আপনার হাবভাব একটু অদ্ভুত মনে হয়, তাই জানতে চাচ্ছি।

সমস্ত অফিসেই তো 'নো ভেকেন্সীর' নোটিশ টাঙ্গানো দেখি ; না ফিরে করি কি বলুন ?

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর তিনি যা বললেন, তার সারমর্ম হচ্ছে—

বিনা মুরুব্বীতে চাকরি পাওয়া, লটারীর টাকা পাওয়ার মতই একটা দৈব ঘটনা। বিলেতী কোম্পানির বড়বাবু, আর দেশী কোম্পানির ম্যানেজারকে মুরুব্বী করতে না পারলে, ভাল চাকরি পাওয়া বা চাকরিতে উন্নতি লাভের কোনও সম্ভাবনা নেই। অফিসে যে 'নো ভেকেন্সী'র নোটিশ দেখা যায়, ওটা অফিসেরই একটা অঙ্গ-বিশেষ। অফিস যতদিন থাকবে ও নোটিসও ততদিন থাকবে। সংবাদপত্রে যে চাকরি খালির বিজ্ঞাপন দেখা যায়, ওগুলোও মামুলী বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন দেওয়ার নিয়ম আছে তাই দেয়, লোক তাদের ঠিক হয়েই আছে। ইণ্টারভিউগুলোরও ঐ একই অবস্থা। অপরিচিত নতুন উমেদারকে অফিসে যেয়ে বড়বাবু বা ম্যানেজারের সাথে দেখা করতে হবে। বড় কর্তার অফিস-ঘরে প্রবেশাধিকার লাভের জন্যে অফিসের বাইরের আরদালী বা চাপরাসীকে কিছু

সেলামী দিতে হয়। তারপর কর্তার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে, কলিংবেল না টেপা পর্যন্ত, যত প্রকার ছলা-কলা-কৌশল জানা আছে, তা সব খাটিয়ে আবেদন-নিবেদন জানাতে হবে। সে আবেদন নিবেদন শুনে কর্তা যদি উমেদারের সাথে কথা বলেন,—সে কথা প্রসন্ন মুখেই হোক বা প্যাঁচা মুখেই হোক, তক্ষুনি চেয়ারের তলায় বসে পড়ে দু'হাতে তাঁর দুই শ্রী·········।

পাক্কা লোক। আত্মপরিচয় যা দিলেন, তাতে তের বছর পূর্বে এন্‌ট্রান্স পাশ করে চাকরির বাজারে নেমেছেন। একটা বড় ভরণ-পোষণ চালাতে হয়। সে জন্যে অল্প মাইনের স্থায়ী চাকরি পোষায় না। এই তের বছরে চারবার চাকরি যোগাড় করে, চারবার ছাঁটাইতে পড়েছেন। এটা তাঁর পঞ্চম অভিযান। এ অভিযানেও যে তিনি সত্বর কৃতকার্য হবেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি যে অকূলে ভাসলাম।

আমার ছাত্রজীবনে বড় বড় বক্তার, বক্তৃতা শুনেছি, সাময়িক পত্রিকায় ভাল ভাল প্রবন্ধ পড়েছি। বক্তা ও লেখকেরা আমাদের চাকরি না করে ব্যবসায় নামতে উপদেশ দেন। আমাদের মানসপটে এঁকে দেন, কেমন করে দরিদ্র কৃষক বালক আলুর ব্যবসায় নেমে ক্রমে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী হলেন, আমাদের দেশের দরিদ্র স্কুলমাষ্টার ব্যবসায় নেমে স্যার আর, এন, হলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ঐ সমস্ত বক্তা ও লেখকেরা, ব্যবসা কেমন করে করতে হয়, ব্যবসার মার কোথায়, তা কিছু আমাদের শোনান না। এর কারণ হচ্ছে, এই বক্তা ও লেখকেরা প্রায় কেউই ব্যবসাদার নন।

আমিও তো স্ত্রীর হাতের রুলী বেচে সত্তর টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসায় নেমে, বারো হাজার টাকার লঙ্কা করেছিলাম। আজ যদি আমার সে ব্যবসা থাকত, তবে আমিই যে কি হতাম তা কে জানে। লঙ্কা ডুবিতে যে মার খেলাম তা'হতে সামলিয়ে ওঠার মত মূলধন আর যোগাড় হল না।

এ-প্রকার যে কেবল আমারই ভাগ্যে ঘটেছে তা নয়। বহু শিক্ষিত

যুবক প্রথম জীবনে ব্যবসায় নেমে, মার খেয়ে সর্বস্বান্ত হয়। যদি ভাগ্যক্রমে কেউ ব্যবসার প্রথম পর্যায়ে লোকসানের ধাক্কা না খেয়ে, ব্যাঙ্কে বেশ কিছু জমিয়ে ফেলতে পারে, তবে সে উৎরে যায়। বাঙ্গালীর ছেলে ব্যবসায় নেমে মার খেলে তাকে বাঁচানর কোনও ব্যবস্থা আজ পর্যন্তও (১৯৬১) বাংলায় নেই। বরং কোনও বাঙ্গালী ব্যবসায়ী যদি মাথা তোলে, তবে তার মাথা ভেঙ্গে দেওয়ার মত বহু লাঠি বাংলার বুকে আমদানি হয়ে প্রস্তুত আছে।

দোকানদারী ব্যবসায়ও বহু শিক্ষণীয় বিষয় আছে। কোনও পাকা দোকানদারের দোকানে বেশ কয়েক বছর শিক্ষানবিশী না করলে, সে শিক্ষা হয় না। কোনও বড় দোকানদারই এ ব্যবসার আঁৎ-ঘাঁৎ, কলা-কৌশল সহজে কাউকে শিখায় না। এই কারণেই দেখা যায়, অনেকে চাকরি জীবন-অবসানে পেনসন বিক্রী করে, অথবা প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের টাকা ভেঙ্গে দোকান খুলে, ফেল পড়ে শেষ জীবন অশেষ দুর্দশায় কাটান।

খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। পকেটে যা আছে তা দিয়ে আরও দিন সাতেক কলকাতায় থেকে ডালরুটি, পুঁইচচ্চড়ি-ভাত খেয়ে, ঘোরা যায় বটে, কিন্তু সে সাত দিনও তো এই ভাবেই যাবে। চাপরাশী, আরদালীদের দু-চার আনা দিয়ে যদিই বা বড় কর্তার দর্শন পাই, কিন্তু কলিংবেল না টেপা পর্যন্ত ঘ্যানর ঘ্যানর করা, তারপর সুবিধেমত কর্তার চরণতলে বসে পড়া, একেবারে অসম্ভব।

আশ্বিনের সন্ধ্যা সাড়ে-পাঁচটা। ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট ধরে চলেছি দক্ষিণে। কেন চলেছি জানিনে। বোধহয় চলতে হয় তাই চলেছি। এতবড় জনকোলাহল-মুখরিত রাজপথে আমি নিঃসঙ্গ, নির্জন, নিস্তব্ধ। পা-দুটো তাদের সুবিধে মত পথ বেছে নিয়ে চলেছে। চোখ-দুটো তাদের নিজ স্বার্থেই পায়ের সাথে ভয়ে ভয়ে সহযোগিতা করছে। আমি আর আমার মন একাকার হয়ে দেহরথে বসে আছি মাত্র।

হঠাৎ হাতে একটা ঝাঁকুনি খেয়ে বাস্তব জগতে ফিরে এলাম।

বড় লোকের আরদালীর পোষাক পরা একটা লোক আমার চৈতন্য সম্পাদন করে বলছে—

হুজুর আপনাকে ডাকছেন।

হুজুর কোথায় ?

ঐ যে, গাড়িতে।

এগিয়ে গেলাম। হুজুরটিকে চিনলাম, জেলেদের সেই জলার এক জমিদার। জেলেদের বিবাদের শেষ মীমাংসা এঁদের বাড়ির সদর কাছারিতে বসেই হয়েছিল। তখন দূরে দূরে এঁকে দেখেছি। একজন উদীয়মান কংগ্রেসী নেতা হিসাবে সংবাদপত্রে প্রায়ই এঁর নাম বেরোয়।

গাড়ির নিকটে যেতেই হুজুর বললেন—আপনি বোধ হয় আমাকে চিনতে পেরেছেন! যদি আপনার কোনও অসুবিধে না হয় তবে গাড়িতে আসুন না। আপনার সাথে কিছু কথা আছে।

অসুবিধে আমার কিছুই নেই। গাড়িতে উঠে পাশেই বসলাম। হুজুর প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন—এখন কি করছেন? চাকরির যোগাড় হল কি না? আপনার আবার অভাব কিসের! আপনার হাতে তো পঞ্চাশ হাজার জেলে আছে। ঐ জেলেদের টাকায় অমুক সাধুবাবা বড় লোক হয়ে গেলেন। ইত্যাদি।

আমি যথাযোগ্য সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলাম। জেলেদের টাকার কথায় জানালাম—আমি গরিব গৃহস্থ, অতএব পেটরোগা মানুষ। জমিদার ও সাধুবাবাদের মত হজম-শক্তি আমার নেই। কাজেই জেলেদের অত টাকা আমার পেটে সহ্য হবে না।

সমস্ত শুনে জমিদার প্রস্তাব করলেন, আমি যদি তাঁর জলার জমিদারীতে নায়েবী পদ গ্রহণ করি, তবে তিনি সে পদে আমাকে বহাল করতে পারেন।

জমিদারের গাড়ি তখন গড়ের মাঠে পড়েছে।

প্রস্তাব শোনার সাথে সাথেই মনে ভেসে উঠল জেলেদের ওপরে জলার জমিদারের নায়েব-গোমস্তাদের উৎপীড়ন কাহিনী। কিন্তু সে অতি অল্পক্ষণের জন্যে।

তারপরেই মনশ্চক্ষুতে ভেসে উঠল আমার সংসারের নিদারুণ অভাব-দৃশ্য। দিনের পর দিন রাত্রে অন্ন জোটে না। দিনেও বোধ হয় পেট ভরে খেতে পায় না। ভাতের পরিমাণ কম করে শস্তা শাক তরকারি দিয়ে পেট ভরানোর চেষ্টা করতে হয়। দুধের অভাবে ছেলেটা খায় ভাতের মাড়। বৃদ্ধা পিসীমা রাত্রে একটু আটা জলে গুলে লবণ দিয়ে খান। ছেঁড়া কাপড় জোড়া দিয়ে আরও দু'মাস চালাতে হয়। গৃহদেবতার পাল-পার্বণ সব বন্ধ।

এই বাস্তব দৃশ্যের পাশে কল্পনানেত্রে ফুটে উঠল ভবিষ্যৎ-দৃশ্য: আমি জেলার বড় জমিদারের দুর্ধর্ষ নায়েব, বসে আছি বড় পানসীতে তাকিয়া ঠেঁস দিয়ে। লেঠেল মেরধা পাঠিয়ে ধরে আনছি জেলেদের। আদায় করছি মাথা-পিছু দু'টাকা ন'আনা তিন পাই খাজনা, আর নজর সেলামী পাঁচ টাকা থেকে পঁচিশ টাকা। জমিদারের সদরে পাঠালাম উনিশ হাজার সাত'শ তিপ্পান্ন টাকা তের আনা তিন পাই, আর আমার বাড়িতে পাঠাচ্ছি একশখানা শতকে নোট। দুধ-ঘি খেতে খেতে সওয়ামনী বউ সাড়ে-তিনমনী হয়ে, ডাক্তারের পরামর্শে স্কিপিং করতে যেয়ে, গলার তিরিশ ভরির হার ছিঁড়ে হাজার টাকার লকেটটা হারিয়ে ফেলেছে।

গাড়ি গড়ের মাঠ পার হয়ে আলিপুরের ভিতর দিয়ে কালীঘাট এসে গেল। বুদ্ধিমান জমিদার আমাকে বেশ কিছুক্ষণ ভাবার সময় দিয়েছেন। কালীঘাট ট্রাম ডিপোর কাছে এসে জানতে চাইলেন আমার মতামত কি।

আমি তখনই কোনও মতামত না জানিয়ে একরাত্রি সময় চাইলাম। জমিদার সম্মত হয়ে তাঁর কলকাতার বাড়ির ঠিকানা লেখা কার্ড একখানা দিয়ে, পরদিন বেলা আটটা-ন'টার মধ্যে দেখা করতে বললেন। আমি ট্রাম ডিপোর সম্মুখে নেমে মায়ের মন্দিরে চললাম।

রাত্রি ন'টা না বাজতেই ধর্মশালায় এসে শুয়ে পড়লাম। সে রাত্রে আর বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের হোটেলে গেলাম না, খিদেও ছিল না। রাতটা চিন্তা-ভাবনায় জেগেই কেটে গেল। সে চিন্তা-ভাবনার প্রায়

সবখানি জুড়েছিল,—জলার নায়েব হয়ে কি করে জেলেদের শোষণ করব, তারই ফন্দি-ফিকির বের করায়।

এই ঘটনার পর বহুবার ভেবেছি, এখনও ভাবি, যে আমি একমাস পূর্বে জেলেদের কৃতজ্ঞতার দান অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করে এসেছি, সেই আমি!! সেই জেলেদের ওপরে অপরাপর নায়েবদের মত,—এমন কি তাদের চাইতেও বেশী জুলুমবাজী চালিয়ে কেমন করে ধনী হব, তারই উপায় উদ্ভাবন-চেষ্টায় সারারাত জেগে কাটালাম!!

এ তো কেবলমাত্র আমার দারিদ্র্যের প্রতিক্রিয়া নয়। সে দারিদ্র্য তো ছ-বছর ধরেই চলছিল। কালীশঙ্কর দাদার উপদেশে, দারিদ্র্য ভগবানের দান বলেই ভেবেছিলাম। তবে কি এটা চাকরির উমেদার হয়ে অফিসে অফিসে ব্যর্থ ঘোরাঘুরির ফল? অথবা সেই অভিজ্ঞ উমেদারের উপদেশের সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া? বোধহয় তিনটেই।

যদি তাই হয় তবে বুঝতে হবে সমাজের মস্তিষ্ক নিম্ন-মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের বেকার সমস্যার মত সাংঘাতিক সামাজিক বিপদ আর নেই। এরা যদি বেকার হয়ে অন্নাভাবের সম্মুখীন হয়, তবে এদের মস্তিষ্ক, শিক্ষা এবং কর্মকুশলতা একদিন যে পথ বেছে নেবে, সে পথের দুধারে, উচ্চস্তরের পেট মোটা গদীয়ান ও তাদের দালাল মিথ্যা বক্তৃতাবাগীশের দল, আর নিম্নস্তরের কৃষক-মজদুর-দরদী শ্লোগানওয়ালারা ও তাদের সর্বহারা (?) কৃষক-মজদুর কেউই রেহাই পাবে না।

আমার মনিব

পরদিন সময়মত জমিদার মনিবের সাথে দেখা করলাম। আলোচনার সময় তাঁর ম্যানেজারও উপস্থিত ছিলেন। কথায় বুঝলাম আমার অনেক সংবাদ তাঁরা সংগ্রহ করেছেন। জমিদারবাবু প্রকাশ করলেন

যে, গোয়ালন্দঘাটে ব্ল্যাকমুর সাহেব ঘটিত ঘটনাই আমার প্রতি তাঁর আকর্ষণের বিশেষ হেতু। আমি বুঝলাম—জেলেদের পেছন থেকে আমাকে সরিয়ে জমিদারপক্ষভুক্ত করাই তাঁর আসল মৎলব।

ম্যানেজার বললেন,—তৎকালে কোনও নায়েবী পদ খালি নেই। অদূর ভবিষ্যতেও খালি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না। এ অবস্থায় আমার জন্যে নতুন পদ সৃষ্টি করতে হবে। সেরেস্তার কাগজপত্র ভাগ করে, নতুন মহল ভাগ করে, সব ঠিক করতে প্রায় ছ'মাস লাগবে। কাজেই ছ'মাসের মধ্যে জলার নায়েব হয়ে বড় পানসীতে তাকিয়া ঠেঁস দিয়ে বসার সুবিধে হবে না।

ম্যানেজারের কথা শুনে আমার মনের ভাব মুখে যা প্রকাশ পেয়েছিল তাই দেখেই হোক, অথবা জমিদার ও ম্যানেজারের পূর্ব-পরামর্শ মতই হোক, জমিদার বললেন—

দেখুন, যতদিন আপনাকে নায়েবী পদে বহাল না করা যাচ্ছে ততদিন আপনি ইচ্ছে করলে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে কাজ করতে পারেন। কংগ্রেসের কাজে আমাকে বহু চিঠিপত্র আদান প্রদান করতে হয়, বহু দেশ ঘুরতে হয়। আপনি আমার এই কংগ্রেসী সেরেস্তার কাজ করবেন, আমার সাথেই থাকবেন। থাকা, খাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা আমার এখানেই হবে। আপনার হাত খরচ বাবদ মাসে পঞ্চাশ টাকা আমি দেব। এতে আপনার মত কি?

আমার আর অমত কিসের? এ তো হাতে স্বর্গ পাওয়া। তখনই রাজী হয়ে গেলাম। অগ্রিম পঞ্চাশ টাকা ও তিন দিনের ছুটি নিয়ে একবার নবদ্বীপবাসা ঘুরে যেয়ে কাজে যোগ দিলাম।

জমিদার বাড়িতেই থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। যে দিন কাজে যোগ দিলাম সেইদিনই বিকালে বাজার-সরকার একটা বড় প্যাকেট দিয়ে গেল। সেটা খুলে দেখলাম দুই প্রস্থ খদ্দরের পোষাক, ধুতি, চাদর, জামা ইত্যাদি।

সন্ধ্যার পর মনিবের সাথে দেখা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার খদ্দরের পোষাক দু'সেট পেয়েছেন কি?

হ্যাঁ, পেয়েছি।

যখন আমার সাথে কংগ্রেসের কাজে যাবেন তখন ওগুলো পরবেন। আমার বাড়িতে কোনও কংগ্রেসী নেতা এলে তখনও খদ্দর পরবেন। সাধারণ ব্যবহারের জন্যে আপনার জামা কাপড় যা কিছু প্রয়োজন তার একটা লিস্ট করে বাজার-সরকারকে দেবেন, সে সব এনে দেবে। আপনি কোনও বিষয়ে আমার নিকটে সঙ্কোচ বোধ করবেন না। আমার সাথে সহকর্মী বন্ধুর মত ব্যবহার করবেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তা হলে সব সময় আমাকে খদ্দর পরতে হবে না, কেবল কংগ্রেসী ব্যাপারে পরতে হবে, এই কি?

হ্যাঁ। সব সময় ওগুলো পরতে হবে না। ওটাকে কংগ্রেসী ব্যাজ বলেই মনে করবেন। এই বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিক যুগে এ এক অদ্ভুত খেয়াল। এ পর্যন্ত দেশের যে টাকা চরকার পেছনে নষ্ট হয়েছে, তা দিয়ে অন্তত একটা বড় কাপড়ের মিল হত। আর যে পরিমাণ তুলো নষ্ট হয়েছে তাতে মিলের কাপড় করলে সারা ভারতে ছ'মাসের চাহিদা মিটত (১৯২৫)।

যখন আপনারা এটা বোঝেন, তখন এ খেয়ালের প্রতিবাদ করেন না কেন?

এই তো রহস্য। যদিও অধিকাংশ নেতাই আমারই মত, তথাপি ব্যাপারটা এমনি দাঁড়িয়েছে যে, আজ যদি আমি এই খেয়ালের প্রতিবাদ করতে যাই, তবে আমাকে সমর্থন তো কেউ করবেই না, অধিকন্তু সকলে একজোট হয়ে কংগ্রেস হতে আমাকে তাড়িয়ে দেবে।

আচ্ছা, লোকে চরকা কাটতে চায় না কেন? আমি আচার্য প্রফুল্ল রায়ের লেখা প্রবন্ধ পড়েছি। তিনি হিসেব করে দেখিয়েছেন, আমাদের দেশের মেয়ে-পুরুষে যদি রোজ দু'ঘণ্টা করে চরকায় সুতো কাটে, তবে দেশের অভাব মিটিয়ে বছরে কয়েক কোটি টাকার মোটা কাপড় বিদেশে রপ্তানী করতে পারে। তা সত্ত্বেও চরকা কাটায় এমন কি নিতান্ত দরিদ্রেরও প্রবৃত্তি নেই কেন?

দেখুন, এটা যান্ত্রিক যুগ। এ যুগের যে মনোবৃত্তি তাতে আমরা

আধুনিক বড় বড় যন্ত্রেরই সম্মান দিই। আমার বাড়িতে ঘোড়ার গাড়ি ও মটরকার দুই-ই আছে। আমার মটরকারের ড্রাইভারবাবু যদি উপস্থিত না থাকেন তবে কারটা আমি নিজেই চালাই, কিন্তু সহিস-কোচম্যান বেটারা কেউ নেই, ফিটন গাড়িটা আমি নিজেই হাঁকাচ্ছি এ আপনি কল্পনা করতে পারেন? ব্যাপার তো দুটোই এক। যে মনোবৃত্তির ফলে মটরকার চালালে সম্মান নষ্ট হয় না, কিন্তু ঘোড়ার গাড়ি চালাতে সঙ্কোচ আসে, ছোটলোকমী হয়—সেই মনোবৃত্তিরই রকম ফেরে সেকেলে চরকা এই যান্ত্রিক যুগে কেউ কাটতে চায় না। তারপর এ যুগে মানুষ অল্প সময়ে অধিক উৎপাদন করতে চায়। বড় বড় যন্ত্রপাতি ছাড়া তা সম্ভব নয়। বর্তমানে যে দেশে বৃহৎ যন্ত্রশিল্প যত বেশী সে দেশ তত উন্নত। এই সমস্ত কারণেই চরকা প্রচলন চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

আপনি যে কথা বলছেন, তাতে তো দেশে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে পুঁজিপতিদের পুঁজি বৃদ্ধি হবে মাত্র। দেশের জনসাধারণ অধিকাংশই বেকার হয়ে নিঃস্ব হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, যদি দেশের শাসন ক্ষমতা পুঁজিপতিদের হাতে পড়ে, তবে তাই হবে। কিন্তু তাই বলে তো আর কালের হাওয়া রোধ করা যাবে না।

তা হলে জন সাধারণের স্বার্থ রক্ষার উপায় কি?

সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন? আমি তো জমিদার পুঁজিপতি। আমি কংগ্রেসে ঢুকেছি ইংরেজ তাড়িয়ে দেশের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করে ভালভাবে আপনাদের শোষণ করার সুবিধে লাভের জন্যে। আমার মুখে যদি আপনাদের স্বার্থরক্ষার বক্তৃতা শোনেন, তবে জানবেন ওটা আপনাদের জন্যে ঘুমপাড়ানী গান। আর যদি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বলতে শোনেন, তবে বুঝবেন ওটা নিছক ধাপ্পাবাজী।

আচ্ছা, আপনার কথা মত যদি কেউ চরকায় সুতো নাই কাটে তবে এত খদ্দর বাজারে আসে কোথা থেকে?

একেবারেই কেউ চরকা কাটে না একথা আমি বলিনি। এমন কতকগুলো অতিভক্ত আছেন যাঁরা সত্যিই চরকায় সুতো কাটেন। কিন্তু তাঁদের কাটা সুতোয় তাঁদের নিজের প্রয়োজন মেটে কিনা সন্দেহ। বাজারে খদ্দর নামে যা বিক্রী হচ্ছে ওগুলো মিলের কাপড়। এই খদ্দর আন্দোলনে কয়েকটা কাপড়ের মিলওয়ালার সুবিধে হয়েছে। তারা কম দামের বাজে তুলো দিয়ে মোটা কাপড় তৈরী করে, খদ্দর নাম দিয়ে, ভাল কাপড়ের চাইতে বেশী দরে বাজারে বিক্রী করছে।

এ ব্যাপারটা কি বড় বড় নেতারা জানেন না?

না জানার তো কোনও হেতু দেখিনে।

তবে তাঁরা এর প্রতিকার করেন না কেন?

আপনার এ প্রশ্নের উত্তরটা আমার মুখে নাই বা শুনলেন।

কংগ্রেসী জমিদার মনিবের আশ্রয়ে দিনগুলো ভালই কাটতে লাগল। কংগ্রেসের কাজে মনিবের সাথে বাংলা দেশে ও বাংলার বাইরে বহু জায়গায় যাই। বড় বড় নেতার দর্শন পাই। তাঁদের বক্তৃতা শুনি। আমার মনিব বক্তৃতা খুব কমই করেন, যা করেন তাতে দৃঢ়তা ও যুক্তি থাকে। কিছু দিনের মধ্যেই বুঝলাম জমিদারত্ব ও কংগ্রেসীত্ব বাদ দিয়ে তাঁর মধ্যে এমন একটা মনুষ্যত্ব ও নেতৃত্ব আছে, যার কাছে ঘেঁষতে বড় বড় নেতারাও ভয় পান।

সে কালের মির্জাপুর পার্ক, যাকে এখন শ্রদ্ধানন্দ পার্ক বলা হয় সেখানে স্বদেশী মেলা হল। মেলায় শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, শরৎ ঘোষ, মৌলবী আফ্‌সারউদ্দিন প্রভৃতি বড় বড় বক্তার বক্তৃতা শুনলাম। রাত্রে শুনি মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রা। দেশের অগণিত মূক জনসাধারণ নানা প্রকারে অত্যাচারিত হচ্ছে। সে অত্যাচার অবিচারের প্রতিকার করার জন্যে দেশের জাগ্রত যুবশক্তিকে সক্রিয় হওয়ার আহ্বান সকলেই বক্তৃতায় গানে জানালেন। চাকরির প্রথম দিনেই আমার মনিবের মুখে সহজ সরল স্পষ্ট কথাগুলো শোনার পর এই সমস্ত বক্তৃতা ও

গান শুনে আমার মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি জমাট হতে আরম্ভ করল। জলার নায়েবীর রঙিন নেশা ক্রমে ফিকে হতে চলল।

মাদ্রাজে কংগ্রেসের সভা বসেছে। মনিবের সাথে আমিও উপস্থিত ছিলাম। সভায় নানা বিষয় নিয়ে বক্তৃতা হল। বড় বড় নেতারা নানা প্রকার বক্তব্যের সাথে মাদক বর্জন ও খদ্দর প্রচলন সম্পর্কেও আবেগময়ী ভাষায় চমৎকার বক্তৃতা করলেন। আমার মনিবের বক্তৃতা হল সামান্য দশ মিনিটে। সে বক্তৃতায় দেখলাম মাদক বর্জন ও খদ্দর প্রসঙ্গের কোনও উল্লেখই হল না। বোধ হয় মনিব একটু নিয়মিত পানাসক্ত বলে মাদক বর্জন সম্পর্কে বক্তৃতা করাও বর্জন করলেন।

সভার কাজ শেষ হলে নেতারা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর রিজার্ভ বার্থে দেশে চলেছেন। আমার মনিব চেষ্টা করেও মেল ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর বার্থ জোগাড় করতে পারেন নি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে দুটো বার্থ পাওয়া গিয়েছে। গাড়িতে উঠে ওপরের বার্থে আমার বিছানা করে নিলাম, নীচের বার্থে থাকলেন মনিব। গাড়ির আর তিনটে বার্থের যাত্রী তিনজনও এসে গেলেন। তিনজনই মনিবের পরিচিত অবাঙ্গালী।

রাত্রে সকলেই ডাইনিং কারে বসে খেয়ে নিলেন। মাছ, মাংস, ডিমে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী কারও কোনও অরুচি দেখলাম না। খেয়ে এসে মনিব তাঁর বাক্স খুলে চারটে গ্লাস ও একটা বোতল বের করলেন। এক বোতলে চার গ্লাস চলবে না বলে একটা স্লিপ নিয়ে আমাকে ডাইনিং কারে যেতে হল। স্লিপ পেয়ে বাটলার আর একটা বোতল, কয়েকটা সোডা ও জিঞ্জার্ড দিয়ে গেল।

কলকাতা এসে পরদিন মনিবকে জানালাম, আমি আর চাকরি করব না। তিন দিন পরে চলে যাব।

মনিব যেন একটু বিস্মিত হয়ে বললেন,—কেন, আপনার নায়েবী চাকরির ব্যবস্থা তো প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, আর বোধহয় এক মাস পরেই আপনাকে জলায় পাঠানো যাবে।

ও কাজও আমি করব না।

আমার এখানে কি আপনার কোনও অসুবিধে হয়েছে ?

মোটেই না। আপনার এখানে আমি সব সময় সব সুবিধে পেয়েছি। আমি অকপটে বলছি, আপনার সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পূর্বে যে মনোভাব আমার ছিল, তা আপনি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিয়েছেন। আপনি বহু বিষয়ে আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। এ কথা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন যে, আমি আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান করি।

আপনি কি এখন আবার জেলেদের নিয়ে কোনও আন্দোলন আরম্ভ করতে যাচ্ছেন ?

না। পদ্মানদীতে আপনাদের যে আপোষ মীমাংসা হয়েছে তা যদি জমিদার পক্ষ মেনে চলেন, তবে ও ব্যাপারে আর জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে আমার নেই।

তবে আমার কাজ ছেড়ে এখন কি করতে চান ?

কি যে করব তা এখনও ভাবিনি। শুধু আপনার কংগ্রেসী সেরেস্তা ও জলার জমিদারী সেরেস্তার কাজ যে করব না, তাই ভেবেছি।

বেশ, আপনাকেও আমি চিনেছি, সেই জন্যে আরও কয়টা কথা আপনাকে বলি—

এই জমিদারী প্রথা আর বেশীদিন থাকবে না। তাই বলে যদি মনে করেন সমস্ত জমিদারী প্রথা উঠে গেলে প্রজা-সাধারণের খুব সুখ সুবিধে হবে, তবে সেটা নিতান্ত ভুল। জমিদারী প্রথা উঠে গেলেও দেশে পুঁজিবাদ থেকে যাবে। জমিদারী প্রথা সর্বত্রই এক প্রকার, এবং তাকে চিনতে বা বুঝতে কোনও অসুবিধে নেই। পুঁজিবাদ কিন্তু বহুরূপী, বাইরে থেকে আঘাত পেলেই রূপ বদলিয়ে আত্মরক্ষা করে। এই পরিবর্তিত রূপে প্রথম দিকে তাকে চেনাই যায় না, মনে হয় অতিশয় হিতকর বা নিতান্ত নিরীহ ব্যাপার।

দক্ষিণ আমেরিকায় এক শ্রেণীর বাদুর জাতীয় জীব আছে, ইংরেজীতে তাকে বলে ভ্যাম্পায়ার। তারা নিদ্রিত জীবের রক্ত চুষে খায়।

ভ্যাম্পায়ারের মুখের লালায় এক প্রকার মাদকতা আছে। ঐ মাদক লালার স্পর্শে ও তার পাখনার হাওয়া খেয়ে, আক্রান্ত জীবটি কিছু বুঝতেও পারে না, জাগেও না। হিংস্র বাঘ-ভালুকের আক্রমণ জীবে বুঝতে পারে। তার জন্যে সতর্ক হয়ে আত্মরক্ষার সাধ্যমত চেষ্টাও করে। ভ্যাম্পায়ারের আক্রমণ জানা যায় না। বরং সুখ-নিদ্রায় অজ্ঞাতসারে আক্রান্ত জীবটি নিঃশেষ হয়ে যায়। এরা বাঘ, ভালুক, কাউকে বাদ দেয় না। সুযোগ পেলে সমস্ত জীবেরই রক্ত চুষে খায়। আমার মনে হয় ভারতে এই ভ্যাম্পায়ারের মত মানুষ জন্মাতে আরম্ভ করেছে।

আপনিই দেখেছেন, ঐ যে সাধুবাবা জেলেদের দরদী সেজে তিন বছর ধরে জেলেদের শোষণ করেছে, মামলা মোকদ্দমায় আমাদেরও বহু অর্থ অপব্যয় করিয়েছে, জেলেরা এবং আমাদের মধ্যেও অনেকে ঐ সাধুবাবার স্বরূপটি বুঝতে পেরেছে কিনা সন্দেহ।

আমি বেশ বুঝতে পারছি,—আর অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই আপনাদের নিন্দিত ধিকৃত আমরা জমিদারগোষ্ঠী লোপ পেয়ে ইতিহাসের বিষয় হয়ে যাব। আমরা লোপ পেলেও সমাজে অত্যাচারী অত্যাচারিত ও অত্যাচার থেকেই যাবে। কারণ ও তিনটে চিরকালই আছে, চিরকালই থাকবে। কিন্তু ঐ তিনটের সুযোগ নিয়ে যদি ঝাঁকে ঝাঁকে নানা আকারের ভ্যাম্পায়ার জন্মায় তবে স্বাধীন ভারতে সমূহ বিপদ দেখা দেবে।

জমিদার ও প্রজা, পুঁজিপতি ও শ্রমিক-কৃষক—আমাদের মধ্যে সহস্র বিরোধ, বাদ-বিসম্বাদ থাকলেও পরস্পরের একটা স্বজাতীয়ত্ব আছে, কারণ আমাদের স্বার্থের ক্ষেত্র এক। এই ভ্যাম্পায়ার-গোষ্ঠীর স্বার্থ কিন্তু আমাদের সকলের স্বার্থ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হবে। তারা জাতিতেও কৃষক, শ্রমিক, পুঁজিপতি, প্রজা, জমিদার কোনও-টাই নয়।

যদি এই বিপদ হতে দেশবাসীকে বাঁচাতে চান, তবে দেশে প্রকৃত অর্থ নৈতিক শিক্ষা প্রচারের চেষ্টা করুন। আর জনসাধারণকে বোঝাতে

চেষ্টা করুন, তারা কতকগুলো অদূরদর্শী নেতার বক্তৃতা শুনে যে, মনে ভাবছে স্বাধীনতা পাওয়া মানে হাতে হাতে স্বর্গ-সুখ পাওয়া, সেটা ভুল। অহিংস অসহযোগের ঠেলায় বিরক্ত হয়ে ইংরেজ যদি আমাদের স্বাধীনতা দান করে যায়, তবে সেই স্বাধীন ভারতে আমাদের অশেষ দুর্গতির সাথে প্রাণপণ লড়াই করতে হবে। আর লক্ষ্য রাখতে হবে, আমাদের অসতর্ক অবস্থায় ভ্যাম্পায়ারের দল যেন আক্রমণ না করে।

এই কথাগুলি আমার মনিব ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে বলেছিলেন।

আবার বেকার

কংগ্রেসী জমিদার মনিবের চাকরি ছেড়ে নবদ্বীপ এলাম। আমার পক্ষে চাকরি করা যে পোষাবে না, সে কথা মা বরাবই বলতেন। মা'র মুখে শুনে শুনে তাঁর বউমার মনটাও ইদানীং বেশ শক্ত হয়ে উঠেছিল। কাজেই চাকরি ছেড়ে বেকার হয়ে বাসায় ফিরলেও কোনও দিক থেকেই ঝড় উঠল না। এমন কি কেন চাকরি ছাড়লাম তার কৈফিয়ংও কেউ চাইল না। আর সত্য কথা বলতে কি, কৈফিয়ৎ দেবার মত কোনও জোরালো যুক্তিও তো আমার পক্ষে ছিল না।

মনিব আমার সাথে যে প্রকার ব্যবহার করেছিলেন সে প্রকার ব্যবহার অতবড় জমিদার তারপর কংগ্রেসী বড়লোকের নিকটে আমার মত দরিদ্র কর্মচারী আশাই করতে পারে না। তিনি অকপটে আমাকে বিশ্বাস করতেন, কংগ্রেসের কাজে সহকর্মীর মত গ্রহণ করেছিলেন। জলার নায়েবী চাকরি না নিয়ে যদি তাঁর সাথে কংগ্রেসের কাজেই লেগে থাকতাম, তা হলে আর্থিক ব্যাপারে যে আমার কোনও অসুবিধে হত না তা ঐ ক'মাসেই বেশ বুঝেছিলাম। অধিকন্তু দেশের কাজ করাও হত, আমার ভবিষ্যতও উজ্জ্বল হত।

আমার মনিব ক্রমে একজন প্রথম শ্রেণীর কংগ্রেস নেতা হয়েছিলেন। আজ (১৯৬১) আর তিনি জীবিত নেই। ভারত ইংরেজ শাসনমুক্ত হওয়ার পরই তিনি পরলোক গমন করেছেন। তথাপি ইংরেজ শাসনমুক্ত ভারতে যে ক'দিন তিনি জীবিত ছিলেন, তার মধ্যেই আমি অনেক কিছু করে নিতে পারতাম। আজ চোখের ওপরে দেখছি, কত বখাটে, অকাট কেবল মাত্র ১৯৪২-এর আগস্ট-হাঙ্গামায় যোগ দিয়ে ক'মাস জেলখাটার গৌরবে খুঁটোর জোরে কেমন সুন্দর 'ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাচ্ছেন'। আমি যদি সেই সময় থেকে আমার মনিবের সাথে কংগ্রেসে লেগে থাকতাম তবে আমার যে ঐতিহ্য ও খুঁটোর জোর হত, তাতে আমি তো হাতি ডিঙিয়ে ধান খেতে পারতাম। কিন্তু সবই ভাগ্য। যার ভাগ্যে আছে বনে বনে ঘুটে কুড়নো, সুযোগ পেলেই কি সে আর রাজতক্তে বসতে পারে।

এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা নাকি মানুষ দেখেই তার স্বভাব, প্রকৃতি সব বুঝে ফেলেন। আমি কিন্তু আমার নিজের স্বভাবটাই এ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারিনি। তবে এইটুকু বুঝেছি যে, আমার মধ্যে একটা বুনো মোষ ঘুমিয়ে আছে। মাঝে মাঝে সে জাগে। যখন জাগে তখন সে, সমস্ত যুক্তি তর্কের জাল ছিঁড়ে ছুটে বেরিয়ে পড়ে, কোনও অনুরোধ-উপরোধের বেড়া মানে না। হয়তো অভাব-অভিযোগের তাড়নায় সে দাঁড়িয়ে হাঁপায়, তাই বলে আর সেই বেলতলায় সুখে ঘুমনোর জন্যে ফিরে যায় না।

নবদ্বীপে এসে বহু খোঁজাখুঁজি করে দুটো টিউশনি পেলাম, কিন্তু এক সপ্তাহ পড়িয়ে দুটোই ছাড়তে হল।

একটি ছাত্রের মস্তিষ্ক একেবারে জমাট সিমেন্ট। মা-সরস্বতীর বীণার তার সে জমাট সিমেন্টে ঢুকনোর উপায় নেই, ওপরে যেটুকু লাগান সম্ভব তা কোচিং ক্লাসের মাষ্টারমশাই লাগিয়েছেন।

দ্বিতীয়টির ধনী বাপ ছেলের উন্নতির জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত। অতএব সে কেন রোজ রোজ সকাল সন্ধ্যায় ঝিঁ ঝিঁ পোকার মত ঝিঁ ঝিঁ করবে। প্রাইভেট মাষ্টার স্কুলের পরীক্ষার কিছু পূর্বে

মাষ্টারমশাইদের নিকট থেকে প্রশ্নপত্র জেনে এসে, তার উত্তর লিখে দিলে, সাত দিনের মধ্যে সে উত্তর মুখস্থ করে পাশ করতে পারবে। স্কুলে সে যায় বন্ধুবান্ধব নিয়ে স্ফূর্তি করতে, আর নানা বিষয় নিয়ে দল পাকাতে। স্কুলের ক্লাসে বসতে কোনও হাঙ্গামা নেই। কোচিং ক্লাসের ব্যবসা চালু হওয়ার পর মাষ্টারমশাইরা স্কুলের ক্লাসে বসে পড়ানো নিয়ে আর বড় বেশী মাথা ঘামান না।

প্রতিদিন নবদ্বীপ লাইব্রেরীতে যাই। সংবাদপত্রে চাকরির বিজ্ঞাপন খুঁজি। যে বিজ্ঞাপনে দরখাস্ত করার নির্দেশ থাকে সেটার ঠিকানামত আবেদনপত্র পাঠাই। যেয়ে সাক্ষাৎ করার নির্দেশ থাকলে যাইনে। পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে, যাতায়াতের খরচটা অপব্যয় হবে মাত্র।

ক' সপ্তাহ যাবৎ শনিবারের বসুমতীতে একটা বিজ্ঞাপন দেখি। কলকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে পরিতোষ ব্যানার্জী একজন গৃহশিক্ষক চাচ্ছেন। আহার ও বাসস্থান পাওয়া যাবে। মাসিক বেতন সাত টাকা। ক্লাস সিক্সের একটি মেয়ে আর ক্লাস থি'র একটি ছেলে পড়াতে হবে এবং তাদের অভিভাবক হয়ে তত্ত্বাবধান করতে হবে। কর্মপ্রার্থী সন্ধ্যা সাতটার পর সাক্ষাৎ আলাপ করুন।

তিন সপ্তাহ বিজ্ঞাপন দেখে একটু বিস্মিত হলাম। ভাবলাম যদি কাজটা পাই, তবে অন্তত বেলা এগারটা হতে চুটো পর্যন্ত ছেলেমেয়ে স্কুলে থাকা কালে নিশ্চয়ই আমার ছুটি থাকবে। ঐ সময়ে ইন্টারভিউয়ের চাকরিগুলো পরীক্ষে করে দেখব। যদি দৈবাৎ সুবিধেমত একটা গেঁথে যায়ই।

সন্ধ্যা সাতটা বাজার সাথে সাথেই বিজ্ঞাপিত ঠিকানায় যেয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছি, বাড়ির সম্মুখে কাউকে দেখছিনে। এমন সময় এক ভদ্রলোক—নিতান্ত মলিন বেশ, চোখমুখ দিয়ে দারুণ শ্রান্তি-ক্লান্তির ভাব ফুটে বেরুচ্ছে,—ছ'হাতে চুটো বাজারের থলে নিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁকে পরিতোষবাবুর কথা বলতেই জানতে পেলাম তিনিই স্বয়ং বসুমতীতে বিজ্ঞাপনদাতা পরিতোষ ব্যানার্জী।

সাথে করে ঘরে এনে বসালেন। ঘরের অবস্থা যা দেখলাম তাতেই সেখানে গৃহশিক্ষকতা করার সখ মিটে গেল। আপাতত সংক্ষেপে পরিতোষবাবুর সে সময়ের অবস্থাটা লিখছি।

দু-মাস হল পরিতোষ বাবুর স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। স্ত্রী পাঁচটি সন্তান রেখে গিয়েছেন বড়টি এগার বছরের মেয়ে চাঁপা, ক্লাস সিক্সের ছাত্রী, প্রতি পরীক্ষায়ই ক্লাসে ফার্স্ট হয়। একেবারে ছোটটি এক বছরের ছেলে। সংসারে তাঁর শ্যালক নরেশ ছিল। সে এই সংসারে থেকেই এম, এ, পাশ করে চাকরি পেয়ে দু-সপ্তাহ হল এলাহাবাদ গিয়েছে।

বহু চেষ্টা করেও ছেলেমেয়ে রাখার মত একটা ঝি পাওয়া যাচ্ছে না। যাদের পাওয়া যায়, তাদের বিপত্নীক পরিতোষবাবু রাখতে সাহস পান না। দেশে তাঁর এক বিধবা সৎ-শাশুড়ী আছেন। তিনি তাঁর নিজের সংসার নিয়েই ব্যস্ত। আর এমন কেউ নেই যিনি এ সময়ে কলকাতা বাসায় এসে তাঁর সংসার তরণীর হাল ধরতে পারেন।

পরিতোষবাবু দশটা থেকে পাঁচটা অফিস করেন, নচেৎ ছ'টা পেটই অচল। ছোট শিশু তিনটির জন্যে বড় মেয়েটার পড়া বন্ধ হয়েছে।

এই সমস্ত কারণে অনেক ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত সর্বক্ষণের জন্যে সর্বকর্মে পারদর্শী একজন গৃহ শিক্ষকের জন্যে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। আমি যদি থাকি তবে মাসে দশ টাকা দেবেন, কারণ এই অল্প সময়ের আলাপেই আমাকে বিশেষভাবে পছন্দ করে ফেলেছেন।

কিছুই বলার নেই, বিপন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র ঘরের বিভ্রান্ত অবস্থা। ছেলেমেয়েগুলি যেন দেবশিশু। এগার বছরের মেয়েটি তার মাতৃস্তন্যহারা ছোট ভাইটিকে মা-ভুলিয়ে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছে। আট বছরের ছেলেটি বই সম্মুখে রেখে করুণ বেদনা ভরা অসহায় চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। গাছ থেকে ছেঁড়া আধ-ফোটা গোলাপের মত দুটি ছেলে মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে খালি মেঝেয় পাশাপাশি ঘুমিয়ে পড়েছে, তখনও তাদের চোখের জল শুকোয় নি। সমস্ত দেখে শুনে আমি নির্বাক।

সে রাত্রিটা থাকার জন্যে পরিতোষবাবু এমনভাবে অনুরোধ করলেন যে, বাধ্য হয়ে থাকতে হল। মুশুরির ডাল, আলু ভাজা, ভাত রান্না করে খাওয়া হল। দুখানা জোড়াচৌকির এক পাশে বিছানা পেতে আমাকে শুতে দিলেন। নিজে পাঁচটি সন্তান ঘুম পাড়িয়ে আমার কাছে বসে তাঁর কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন। প্রথমে সংক্ষেপেই আরম্ভ করেছিলেন। আমাকে মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে মনের আবেগে বর্ণনা বিশদ হয়ে গেল।

পরি—পারু

(১)

পরিতোষবাবুর জন্মস্থান বিক্রমপুরের কোনও গ্রামে। তাঁর ঠাকুরদাদা সর্বস্ব ব্যয় করে বড়লোক কুলীনের ঘরে মেয়ে বিয়ে দিয়ে, একমাত্র ছেলে কালীনাথের মাথাগোঁজার স্থান পাঁচকাঠার এক ভিটের ওপরে একখানা তেচালা খড়ের ঘর রেখে, পরলোক গমন করেন।

পিতা কালীনাথ নিকটবর্তী জমিদার-কাছারিতে সামান্য বেতনে মুহুরীর চাকরি করতেন। যে উপায়ে সেকালে পাঁচ-সাত টাকা বেতনের জমিদার-কর্মচারী বাড়িতে দোতালা দালান তুলতেন, সে উপায়টা কালীনাথবাবু দশবছর চাকরি করেও আয়ত্ব করতে পারলেন না। ফলে এক চৈত্র মাসে কলেরায় দু'ঘণ্টা আগ-পাছ স্বামী-স্ত্রী দুজনেই যখন অজানা জগতে চলে গেলেন, তখন আট বছরের পরিতোষ তাঁর ঠাকুরদাদার সম্পত্তি অবিকৃত অবস্থায় সমস্তই পেলেন। অতিরিক্ত পেলেন, অন্নপ্রাশনের সময় মা, তাঁর নথ ভেঙ্গে চাঁদ গড়িয়ে, ছেলের কোঁকড়া চুলে গেঁথে দিয়ে চাঁদকপালে চাঁদমুখে যে চুমো খেয়েছিলেন, সেই চাঁদখানা।

গ্রামের দশজনে পরামর্শ করে পরিতোষবাবুর পিতামাতার

শ্রাদ্ধাদি করালেন। শ্রাদ্ধান্তে বৃদ্ধ পুরোহিত স্মৃতিরত্ন মশাই, অভিভাবকহীন আট বছরের পরিতোষবাবুর একমাত্র আপনজন পিসীমার বাড়িতে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে, শ্রাদ্ধাবশিষ্ট সম্পত্তির মূল্য কয়েকটা টাকা, খান-দুই পুরনো শাড়ি, আর সেই চাঁদখানা বুঝে দিয়ে গেলেন।

বড়লোক পিসেমশাই ছিলেন অত্যন্ত কৌলীন্যদাম্ভিক গম্ভীর প্রকৃতির লোক। সকলেই তাঁকে এড়িয়ে চলতে চাইত। পিসীমা ছিলেন স্নেহময়ী সরলা প্রকৃতির। সকলেই তাঁর স্নেহসান্নিধ্য চাইত।

পিসীমার বাড়ি যেয়ে পরিতোষবাবু পিসতুতো ভাইবোনদের সাথে মিশে, পিসীমার স্নেহযত্ন, আর পিসেমশাইএর শাসন ও শিক্ষার জন্যে অর্থব্যয়, সমানভাবে ভোগ করেছেন।

(২)

একুশ বছর বয়সে পরিতোষবাবু বি, এ, পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি এসে শুনলেন, তাঁদের পাড়ার চক্রবর্তী বাড়ির মেয়ে পারুলের বিয়ে। পারুল যেমন সুন্দরী তেমনি শান্তশিষ্ট মেয়ে। শিশুকাল হতেই পরিতোষবাবু ওরফে পরিদার অত্যন্ত অনুগত, বয়সে পাঁচ বছরের ছোট।

পারুলের বাবা যেদিন বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ কিনে দিলেন, সেদিন বই হাতে পেয়েই, এলো চুল বাতাসে উড়িয়ে, ছোট্ট শাড়ির আঁচলে সারা পথের ধুলো মাখিয়ে, এক দৌড়ে পরিদার পড়ার ঘরে হাজির। ‘পরিদা আমাকে পড়িয়ে দাও’।

সেদিন সকালবেলাটায় আর পরিদার নিজের পড়া হল না। পাঁচ-সাতটা চড়, দশ-পনরোবার চুলটানা আর অজস্র বাঁদর, গরু, গাধা—গালাগালি খেয়ে, পারুল দু’ঘন্টার মধ্যেই প্রথম বারটা বর্ণের পরিচয় পরীক্ষায় পাস করে গেল। তারপর থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা পরিদা পারুলের মাষ্টারী করতেন।

বার বছর বয়স পর্যন্ত পারুল পরিদার সাথে ছাড়া পূজো দেখা, মেলায় যাওয়া, নিমন্ত্রণ খাওয়া, কোনও কিছু করত না। এ নিয়ে পরিদার সমবয়সী ছেলেরা মুখ টিপে হাসত। তাঁরা দুজনে ও সমস্ত গ্রাহ্যই করতেন না। স্কুলে পরিদা ছিলেন ফার্স্ট বয়। খেলাধুলোতেও ভাল ছিলেন। পুরস্কার বিতরণের সময় অনেকগুলি পুরস্কার পরিদার হাতে আসত। প্রতি বৎসর পুরস্কার-বিতরণী সভায় যেয়ে, পরিদার পাশে পারুলের বসা চাই। একখানা একখানা করে পুরস্কার পেয়ে, প্রথমেই পারুলের হাতে দিতে হবে। পারুল সমস্ত গুছিয়ে নিজে বয়ে বাড়ি আনবে। এ গৌরবের ভার সে কিছুতেই কাউকে দিত না।

ক্রমে পারুলের বয়স তের'র কোঠায় পড়ল। পরিদাও গ্রামের স্কুল হতে এণ্ট্রান্স পাস করে ঢাকায় কলেজে পড়তে গেলেন। ছুটিতে বাড়ি এলে, অন্তত দিনান্তে একবার এসে, পারুল পরিদার বই-খাতাগুলো গুছিয়ে, এলোমেলো ঘরটা সাজিয়ে যেত।

পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় কুলীনের ছেলে। তাঁর পিসেমশাই একেবারে খাঁটি নৈকষ্য। মেয়েবেচা চক্রবর্তী বামুনের ঘরের মেয়ে পারুলের সাথে কুলীন পরিদার বিয়ের কথা, সে যুগে কেউ চিন্তা করতেই পারত না ; এমন কি পরিদাও না, পারুলও না।

সেই পারুলের বিয়ের কথা যখন পরিদার কানে গেল, তখন মনটা হঠাৎ একটা মোচড় খেয়ে অভূতপূর্ব বেদনায় ভরে উঠল। পা-দুটো পারুলদের বাড়ি যাওয়ার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল, তবুও যাওয়া হল না ; কারণ, যাওয়া যায় না। পারুলও এল না, বোধ হয় সেও আসতে পারে না।

পরদিন বেলা ন'টা হবে, পরিদা ঘরে বসে বই নাড়াচাড়া করছেন। পিসীমা চক্রবর্তীবাড়ি পারুলের গায়ে হলুদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে এসে পিসেমশাইকে বলছেন,—'আহাঃ, মেয়ে নয়তো সোনার প্রতিমা ! তাই কিনা গোবিন্দ চক্কোত্তি চার'শ টাকার লোভে, সাত-আটটা ছেলেমেয়ের বাপ এক ষাট বছরের বুড়োর হাতে বেচে দিল ! আহা, গায়ে হলুদের

সময় মেয়েটার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল। মেয়েটার ঃখ……'।

গায়ে হলুদের সময় পারুলের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়েছে! শোনার পর পরিদা আর কিছু শোনার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললেন। কানের মধ্যে শুধু ঐ কথাটাই গর্জন করতে লাগল। উঠতে যেয়ে মাথা ঘুরে গেল, চোখে অন্ধকার দেখলেন। ঘন্টাখানেক বিছানায় শুয়ে থেকে মাথা ও মন স্থির করে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। বৈশাখী বেলা তখন প্রায় এগারটা।

(৩)

বৈশাখ মাসের শেষ। এ সময়ে বাড়ির পাশের আমগাছের দিকে সকলেরই দৃষ্টি থাকে। বাড়ির পিছনের আমগাছে একটা মানুষ দেখে, পারুলের সৎ-মা এগিয়ে গেলেন।

গাছে ও কে? পরি নাকি! তা বাবা, এই দুপুরে গাছে কি খুঁজছিস? বাড়ি কবে এলি?

তিন দিন হল এসেছি পিসীমা। একটা সশীষ আমের পল্লব খুঁজছি, তা কোথাও পাচ্ছিনে; হয় আম ধরেছে, নয় তো মুকুল হয়ে শুকিরে গিয়েছে। পারু কোথায় পিসীমা, পারুর নাকি বিয়ে?

'হাঁ বাবা, কাল পারুর বিয়ে। আজ বিকেলে একবার এস। তোমরাই তো সব করে কর্মে দেবে, বাবা।……' বলতে বলতে সৎ-মা বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। ওদিকে পারুল যে গাছতলায় আসছে, তা তিনি লক্ষ্য করলেন না, বা দেখতে পেলেন না।

পারুলকে দেখেই পরিদা গাছ থেকে নেমে তার সম্মুখে যেয়ে, সোজা প্রশ্ন করলেন,—পারু, তুই গায়ে হলুদের সময় কাঁদছিলি কেন?

প্রশ্নের সাথে সাথেই পারুলের চোখে বান ডাকল। আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে প্রাণপণে কান্না চাপতে চেষ্টা করেও পারছিল না।

পরিদা কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মত থেকে, শেষে বললেন,—পারু, আমি

যদি তোকে বিয়ে করি তবে তুই রাজী আছিস কিনা, আমাকে স্পষ্ট করে বল ?

পারুল মুখের কাপড় সরিয়ে বিস্মিত সজলচোখে পরিদার মুখের পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল,—তা কেমন করে হবে ? তোমরা তো কুলীন—।

নে নে, আবার কুলীন ! তুই রাজী আছিস কিনা, তাই বল ?

সত্যিই তুমি আমাকে বিয়ে করবে ?

সত্যি না তো কি মিথ্যে বলছি ? তোকে যদি বিয়ে না করতে পারি তবে আমি জীবনে আর বিয়েই করব না, এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি।

পরিদা, তুমি প্রতিজ্ঞা করো না। তুমি কুলীন, বিদ্বান, পরম সুন্দর। তোমার ভাল বউ আসবে। আমি গরীব ছোট ঘরের মেয়ে। আমি কাঁদছি কেন তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। তবে এখন আর আমার কোনও দুঃখ নেই। তোমার মুখে যদি আজ এ কথা না শুনতাম তবে, সত্যিই বড় দুঃখ নিয়ে এ সংসার হতে বিদায় নিতে হত। আজ রাত্রে যখন সংবাদ পাবে, তখন আর একবার ছুটে এসে দেখে যেও, তোমার পারু কতবড় গর্ব বুকে নিয়ে কত আনন্দে হাসিমুখে আগুনে পুড়ছে।

এই বলে, পারুল বিস্মিত পরিদাকে গড় হয়ে প্রণাম করে বাড়ির দিকে ফিরতেই, পরিদা ব্যাকুল হয়ে তার হাত দুখানি জড়িয়ে ধরে বললেন—

পারু, তুই আমার এত বড় সর্বনাশ করিসনে। আমি বলছি আজ সন্ধ্যার মধ্যেই তোকে সুসংবাদ দেব। রাত্রি ন'টার মধ্যে আমি নিজে এসে সব জানাব। তুই সন্ধ্যাবেলা একবার নন্তকে আমার খোঁজে পাঠাস। আমি এক্ষুনি বিরাটদার খোঁজে যাচ্ছি।

এই বলে পরিদা ছুটলেন বিরাটদার খোঁজে। পারুল গেল বাড়ির ভেতর। সেই থেকে পারুলকে কেউ আর বিমর্ষ দেখেনি। বরং সব কাজেই তার উৎসাহই দেখা গেল।

(৪)

রাধানাথ চক্রবর্তী ও গোবিন্দ চক্রবর্তী দুই ভাই দরিদ্র গৃহস্থ। শিষ্য ও যজমানের ক্রিয়াকর্ম করে সংসার চলে। বড় ভাই রাধানাথের স্ত্রী সাত বছর স্বামীর ঘর করে, চার বছর বয়সের ছেলে বিরাজমোহনকে রেখে পরলোকের পথে চলে গেলে, বহু টাকা পণ দিয়ে দ্বিতীয়পক্ষ ঘরে আনা সম্ভব হল না। শিষ্য যজমান ও পাড়ার পাঁচজনের কথামত ছোট ভাইবউ ঘরে আনতে হল।

তারপর এক বৎসর গেল। সেই এক বৎসরের প্রতিটি দিনই গৃহিণী-শূন্য গৃহে রাধানাথ ঠাকুরের অন্তরের জ্ঞান-বৈরাগ্য অবাধে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে, গেরুয়া পরালো, চুল-দাড়ি রাখালো, গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা জড়ালো, এমন কি ছোট কল্কে পর্যন্ত ধরালো। কিন্তু কিছুতেই তাঁকে ঘরে রাখা গেল না। একদিন এক কাশী-ফেরৎ সাধুবাবা শুনালেন,—কাশী কল্পতরু, সে কল্পতরুর তলায় গেলে যে যা চায় তাই মেলে। এই উপদেশ পেয়েই তারপর দিনই কাশী যাত্রার আয়োজন হতে লাগল। সাত দিনের মধ্যেই শিষ্য ও যজমানদের প্রণামী সংগ্রহ করে রাধানাথ কাশী-কল্পতরুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পুত্র বিরাজ-মোহনের কি হবে, সে চিন্তা করার মত দুর্যোগ তাঁর হল না, এমনি তীব্র বৈরাগ্য। কিছুদিন পরেই সংবাদ পাওয়া গেল কাশীধামে শ্রীমৎ রাধানাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। সে আশ্রমের যিনি আশ্রম-জননী, তিনি শিষ্য ও ভক্তজনের জননী হলেও, শ্রীমান বিরাজ-মোহনের মুখে মাতৃ-সম্বোধন শুনতে আদৌ প্রস্তুত নন।

শোনা যায় সেকালে নাকি কুলীনের মেয়ে, বউ, সাপেও কাটত না। আর যাদের কন্যা পণ দিয়ে বিয়ে করতে হত তাদের মেয়ে, বউ-এর খোঁজখবর যমরাজা ও তাঁর অনুচরেরা সব সময়ই নিতেন। গোবিন্দ চক্রবর্তীর ভাগ্যেও তাঁর স্ত্রী সুদীর্ঘ সাত বছর সংসার করে, দু'বছরের মেয়ে পারুলকে তার জেঠতুত দাদা বিরাজমোহনের কোলে তুলে দিয়ে, যমরাজের সাথে দেখা করতে চলে গেলেন। বার বছর বয়সের বিরাজমোহন তখন বয়সে বালক হলেও, মাতৃহারা শিশু

বোন পারুলের বিরাটদাদা হয়ে, সেই যে তাকে বিরাট স্নেহে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর আরও পনরোটা বছর সমব্যথার সূত্রে জড়িয়ে, নানা সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে দুজনের কেটে গেছে।

গোবিন্দ চক্রবর্তীর প্রথম পক্ষ শেষ হওয়ার চার মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় পক্ষ ঘরে এলেন। দ্বিতীয় পক্ষ এসেই যথারীতি সংসারের সমস্ত ভার নিজহাতে নিয়ে, কেবল পারুলকে রেখে দিলেন বিরাজমোহনের কোলে। রাত্রে পারুলের বিছানাটাও দাদার পাশেই স্থায়ী ভাবে পাতা হল।

পারুল যতদিন কথা বলতে শেখেনি ততদিন বিরজেমোহনের বিরাজ নামটা বজায় ছিল। পারুলই প্রথম তাঁকে ডাকতে আরম্ভ করে 'বিলাতদা' বলে। সাথে সাথে অপর ছেলেমেয়েরাও আরম্ভ করল বিরাট দা। বয়স্করাও ধরলেন বিরাটচন্দ্র। ধরার কারণও ছিল, বিরাজমোহন তাঁর সমবয়স্কদের চাইতে আকারে, আহারে ও শক্তিতে বেশ কিছু বিরাট ছিলেন।

গ্রামের হাইস্কুলে ক্লাস থ্রী থেকে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পৌছুতে, বিরাটদার চোদ্দ বছর লাগে। তাতে গোবিন্দ চক্রবর্তীর আর্থিক ক্ষতি ছিল না। প্রথম হতেই বিরাটদা স্কুলে ফ্রী ছিলেন। প্রথম তিনটে ক্লাসে তিনি একজন ভাল ছাত্রই ছিলেন। অঙ্কে তাঁর মত ভাল ছেলে আর কেউ ছিল না। ক্লাস সিক্সে উঠে তাঁর আসল যোগ্যতা প্রকাশ পেল। ও রকম সব বিষয়ে ভাল খেলোয়াড় তৎকালে ও-দেশে আর ছিল না। বিশেষ করে ফুটবল খেলায় ব্যাক, আর নৌকা বাইচে মাঝিগিরিতে বিরাটদা স্বনামধন্য।

বছরের ন-টা মাস খেলা আর নৌকা নিয়ে বিরাটদা এতই মেতে গেলেন যে, স্কুলে হেডমাষ্টার মশাই চেষ্টা করেও তিন চার বছরের কমে তাঁকে এক ক্লাস হতে অপর ক্লাসে ঠেলে তুলতে পারতেন না। যেবার প্রথম ফেল করলেন, সেইবারই তাঁর ফ্রীশিপ বাতিল হয়। তখন থেকে আর এগার বছর মাষ্টার মশাইরা ও অবস্থাপন্ন ছাত্রেরা, চাঁদা করে বিরাটদার স্কুলের মাইনে, খাতা, বই সব চালাত। এমন একটা ভাল খেলোয়াড় স্কুলের গৌরব।

বিরাটদার বহু সহপাঠী। তাদের অনেকেই বি, এ, এম, এ, পাস করে নানাদিক দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বিদেশ হতে গ্রামে এসে, সকলেই আগে বিরাটদার খোঁজ করে। নিকটবর্তী কয়েকখানা গ্রামের বালক ও যুবকদের তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা, সকলেরই সব বিষয়ে বিপদ স্থপদের দুঃসাহসী বন্ধু।

বিরাটদার এক মজার বোল ছিল। একটু উত্তেজনার কারণ ঘটলেই তিনি হুঙ্কার ছাড়তেন,—'স্যুট্ দি বল, উইথ্ দি ম্যান'। ফুটবল ম্যাচ খেলায়, বিপক্ষে যারা তাঁকে চিনত, তারা মাঠে নেমেই কাছে এসে হাতজোড় করে বলত,—"বিরাটদা, তুমি স্যুট্ দি বল উইথ দি ম্যানই কর, আর স্যুট্ দি ম্যান উইথ দি বলই কর,—আমাদের পক্ষের বিনীত নিবেদন,—খেলার শেষে আমরা যেন পৈতৃক পায় হেঁটে বাড়ি যেতে পারি।" যারা তা করত না, তাদের এগার জন খেলায় নেমে শেষ পর্যন্ত সাত-আটজনে খেলতে হত।

(৫)

বিরাটদা সেবার ক্লাস নাইনের ছাত্র। ফুটবল ম্যাচে ব্যাক খেলা ও বাইচের নৌকার মাঝিগিরির খ্যাতি ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি বড় বড় জায়গায়ও বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। বড় বড় ফুটবল টীমে তাঁকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছে। বাইচের নৌকার মাঝি হওয়ার নিমন্ত্রণও বহু।

আশ্বিন মাসে পূজোর কয়েকদিন থাকতে বিরাটদা নারায়ণগঞ্জে এক বড় ফুটবল ম্যাচে জিতে, পরদিন স্ফূর্তি করতে করতে রাত্রে বাড়ি ফিরে দেখেন, পারুল বালিসে মুখ লুকিয়ে কাঁদছে। দেখেই তাঁর অভ্যস্ত হুঙ্কার ছাড়লেন,—স্যুট্ দি বল উইথ দি ম্যান, কি হয়েছে পারু ?

তের বছরের পারুল। সে তার দাদার হুঙ্কারের সাথে নিত্য পরিচিত। কাজেই পারুল চমকালো না, বা কিছু বলল না। তার নিয়ম মত তারপিনের শিশিটা বের করে, খেলোয়াড় দাদার পায়ে

মালিশ করতে বসল। বিরাটদা কিন্তু অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। প্রায় ছ-সাত বছরের মধ্যে তিনি, তাঁর স্নেহের বোনের চোখে জল দেখেন নি। সে রাত্রে পারুলের চোখের জল তাঁকে বিহ্বল করে ফেলল। দাদা আর একটা পিলে চমকান ধমক দিয়ে, পারুলের মুখে যা শুনলেন, সেটা ঘটনা হিসেবে অতি সাধারণ হলেও বিরাটদার জীবনে তার গুরুত্ব যথেষ্ট।

পূজোর বাজারে ব্যবসাদার কাপড়ওয়ালারা নানাপ্রকার জামা-কাপড় নিয়ে বাড়ি বাড়ি ফিরি করে বিক্রী করছে। পাড়ার মুখুজ্যে বাড়ীতে এক কাপড়ওয়ালা কাপড় নামায়। অনেকে পছন্দ করে পূজোর জামাকাপড় কিনেছে। পারুল সেখানে উপস্থিত ছিল। মুখুজ্যে বাড়ির রাণী পারুলের সমবয়সী। রাণী একখানা শাড়ি পছন্দ করে। শাড়িখানার দাম চার টাকা বলে তার বাবা অত টাকা দামের শাড়ি কিনতে অমত করেন। কিন্তু রাণীর মা মেয়ের আবদার রক্ষে করে কাপড়খানা কিনে দিয়েছেন।

পারুল বাড়ী এসে দেখে, তার সৎ-মাও এক কাপড়ওয়ালার কাছে জামাকাপড় কিনছেন। সেও মহা উৎসাহে সাড়ে তিন টাকা দামের একখানা শাড়ি পছন্দ করে। বাবা তা কিনে দেননি। উপরন্তু সৎ-মা বলেছেন, 'ধিঙ্গী মেয়ের আবার সখ দেখ!' আজ যদি মা বেঁচে থাকতেন—। এই বলে পারুল আবার নীরবে কাঁদতে লাগল।

মেয়েদের এই বয়সটা রহস্যময়। এ সময়ে তাদের পছন্দমত সাজগোজের আকাঙ্ক্ষা ভিতর থেকেই প্রকাশ পায়। প্রকৃতি দেবী যেমন তাদের দেহ সাজাতে আরম্ভ করেন, তেমনি ভিতরে মনও নানা ভাবে সাজতে থাকে। কাপড়জামায় সাজগোজ ঐ দুটো সাজের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। শিশুকালে মা-হারা পারুল সৎ-মা ও বাবার নিকটে কোনও দিন কিছুর জন্যেই আবদার করেনি। সে দিন তার সমবয়সী রাণীর দেখাদেখি প্রথম আবদার করে বকুনি খেয়েছে। তারপর সে দেখেছে, রাণীর বাবা পছন্দ করা কাপড়খানা কিনে না দিলেও, তার

মা কিনে দিয়েছেন। এই সমস্ত কারণে, সেদিন পারুলের হারানো মায়ের জন্যে মন-প্রাণ হাহাকার করে উঠেছে।

সমস্ত শুনে বিরাটদা আর কিছুই বললেন না। রান্নাঘরে পারুল ভাত বেড়ে দিল। নীরবে খেয়ে, নীরবেই শুয়ে পড়লেন।

পরদিন এক বড় নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতায় বিরাটদার মাঝি হওয়ার কথা ছিল। তারা ডাকতে এলে দাদা জানিয়ে দিলেন, নগদ সাতটি টাকা দক্ষিণা আগাম না দিলে 'পাদমেকং ন গচ্ছামি'।

শুনে সবাই অবাক্, পরে অনেক সাধ্য-সাধনা, বিরাটদা অটল। শেষে সাত টাকা এনে দিলে দাদা নড়লেন।

বাইচটায় ছিল জোর প্রতিযোগিতা। অনেকগুলো নৌকা বাইচে নেমেছিল। বিরাটদা মাঝি হয়ে সে দিন যা হাল চালালেন, তা দেখে সকলেই চমৎকৃত হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত বিরাটদার নৌকাই বাইচ জিতলে, তাঁর নৌকার সকলে তাঁকে কাঁধে করে ধেই ধেই নেচেছে, আর নৌকার মালিক পরমানন্দে আরও তিন টাকা দিয়ে দশ টাকা পূরণ করে দিয়েছে। সাথে সাথে আরও একটা বাইচের দক্ষিণা দশ টাকা অগ্রিম এসে গেল।

রাত্রি দশটায় বাড়ি ফিরে উঠোনে দাঁড়িয়েই বিরাটদা হাঁক দিলেন, স্পট দি বল উইথ দি ম্যান। পারু-উ-উ-উ।

পারুল ঘরের দরজা খুলতেই দাদা ঘরে ঢুকে, মস্ত বড় একটা প্যাকেট তার হাতে দিয়ে হুকুম করলেন,—খোল।

খুলে দেখা গেল চমৎকার একখানা শাড়ি, রাণীর শাড়ি অপেক্ষা অনেক ভাল আর জমকাল। তারপর সেমিজ, ব্লাউজ, আলতা, এসেন্স, চুল বাঁধার ফিতে, আর একটা রঙিন নেকার-বোকার।

নীরবে জিনিসগুলো কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে বিস্ময়োৎফুল্ল মুখে পারুল জিজ্ঞাসা করল,—দাদা, এগুলো কার?

কেন, তোর।

সব আমার? শাড়ি, সেমিজ, এসেন্স, সব আমার?

হাঁ, হাঁ, সবই তোর, বোকা মেয়ে। ঐ নেকার-বোকারটা নস্তর।

আর সব তোর। আজ আমি বাইচ খেলায় জিতে কুড়ি টাকা পেয়েছি। ও সব কিনেও এক টাকা ক' আনা বেঁচেছে, নিয়ে রেখে দে। ক'দিনের মধ্যেই আরও চার পাঁচটা বাইচ হবে। তাতে যে টাকা পাব, তা দিয়ে পূজোর আগেই তোর একজোড়া জুতো আর শীতের জামা করে দেব। আরও ক'খানা শাড়ি ও সেমিজ তোর দরকার।

নাঃ দাদা, তা হবে না। তোমার একটাও ভাল জামা নেই। তুমি কোনও দিন জুতো পায় দাওনি। এবার যে টাকা পাবে, তা সমস্ত আমার হাতে দিতে হবে। আমি টাকা জমিয়ে তোমার একটা শীতের কোট, জুতো, আলোয়ান কিনব, আর আমার আর একটা মোটা সেমিজ করব। সমস্ত টাকা যদি আমার হাতে না দাও, তবে আমি এ সমস্ত কিছুই পরব না।

দাদা বোনটিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। শিশুকালে মাতৃহারা অবজ্ঞাত জেঠতুত খুড়তুত দুটি ভাই বোন নিয়তির বিধানে ঘনিষ্ঠ হয়ে, এমনি করেই অন্তর দিয়ে পরস্পরের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, মান-অভিমান বুঝত। এমনি করেই দুজনে দুজনের অবলম্বন হয়ে জীবন-পথে বেড়ে চলেছিল।

সেবার পূজোর পড়ে স্কুল খুললে বিরাটদাকে আর ক্লাসে দেখা গেল না। খালের ধারে বারোয়ারী কালী বাড়ি হল দিনের বেলায় বিরাটদার স্থায়ী ঠিকানা। পারুল হল গ্রামের মধ্যে কাপড় জামায় সব চাইতে ফ্যাসান-দুরস্ত মেয়ে।

এরপর আরও চারটে বছর নির্বিবাদে কেটে গেল। বিরাটদা তাঁর আদরের বোনটিকে, জামাকাপড়ে সাজিয়ে দেখে আনন্দ-গর্বে ভরপুর। ও দিকে বোনটির মনের কোণে যে, কতবড় একটা রহস্যের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে, ধীরে ধীরে শাখাপল্লব বিস্তার করে, সমগ্র মনটাকেই গ্রাস করেছে, তার সন্ধান বিরাটদা কোনও দিনই পান নি। পরিতোষের সাথে পারুলের মেলামেশাটা একটা সাধারণ ব্যাপার। দরিদ্র ব্রাহ্মণের মেয়ে, অভিভাবক যেখানে বিয়ে দেবে, সেখানেই যেয়ে হাসি মুখে ঘর

সংসার করবে,—এই সনাতন রীতি ছাড়াও মেয়েদের,—এমন কি সাধারণ দরিদ্র গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের মনেও নিজস্ব কিছু থাকতে পারে, তা' বিরাটদাও ভাবতে পারেননি। পারুলের দিক থেকেও গায়ে হলুদের পূর্বে কিছুই প্রকাশ পায়নি। বোধহয় পারুল নিজেও পূর্বে এই জীবন-মরণ সমস্যার গুরুত্ব সম্যক বুঝে উঠিতে পারেনি।

সেই পারুলের বিরাটদা যখন দেখলেন, তাঁর বুকে পিঠে করে মানুষ করা পরম স্নেহের লক্ষ্মী-প্রতিমা বোনটি গায়ে হলুদের সময় নীরবে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে, তখন বিনা মেঘে নিকটে বজ্রপাত হলে মানুষ যেমন চমকায়, তেমনি চমকে গেলেন। দিন-দুপুরে তাঁর চোখে রাতের আঁধার নেমে এল। কোনও প্রকারে টলতে টলতে কালীবাড়ি এসে, মন্দিরে মায়ের আসনের সম্মুখে শুয়ে পড়লেন। মধ্যে মধ্যে বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসের সাথে মুখ হতে বেরিয়ে আসতে লাগল—কোনও উপায় নেই। পারু, কোনও উপায় নেই। আমার কোনও হাত নাই। আমি কি করব ? পারু, আমি কি উপায় করব ? হে মা কালী, তুমি আমাকে পথ দেখাও।

(৬)

বেলা তখন প্রায় বারোটা। বৈশাখী রোদে দিক্-দিগন্ত ঝাঁ ঝাঁ করছে। রোদের তাপে রক্তবর্ণ ঘর্মাক্ত পরিতোষবাবু এসে বসলেন কালীবাড়ী বিরাটদার পাশে। প্রথমত বিরাটদার চোখ-মুখের ভাবভঙ্গী দেখে পরিদা ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু ভয় করলে তো চলবে না, হাতে সময় অল্প। মিনিট পাঁচেক ভেবে সাহস সঞ্চয় করে বললেন,—

বিরাটদা, তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। শুনে তুমি আমাকে মেরে বসবে না তো ?

কি বলবি বল না, অত ভনিতে করছিস কেন ?

তোমরা পারুলকে বুড়োর সাথে বিয়ে দিচ্ছ কেন ?

আমরা, অর্থাৎ আমি বিয়ে দিচ্ছি,—একথা তোকে কে বলল ?

তুমি তো এ বিয়েতে আপত্তি করনি!

আমি আপত্তি করেই বা কি করব? একে আমরা দরিদ্র, তারপর আইনত পারুলের বাবাই পারুলের অভিভাবক। এ অবস্থায় আমি যদি একটা ভাল পাত্র যোগাড় করতে পারতাম, তা হলেও না হয় কিছু বলা যেত।

বিরাটদা, আমি যদি পারুলকে বিয়ে করি, তবে তুমি রাজী হবে?

বিরাটদা কথাটা শুনে, কিছুক্ষণ পরিদার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে, অত্যন্ত বেদনার্ত স্বরে বললেন,—পরি, তুই আমাকে ঠাট্টা করছিস? আর পারুলকে নিয়ে এই সময়ে ঠাট্টা!! তুই তো জানিস, মা-হারা পারুলকে আমি কত কষ্টে বুকে-পিঠে করে মানুষ করেছি। আমার সেই পারুল, আজ গায়ে হলুদের সময় যখন চোখের জলে—।

বিরাটদা আর বলতে পারলেন না। একেবারে শিশুর মত হাহাকার করে কেঁদে ফেললেন, যা কেউ কোনও দিন দেখেওনি, শোনেও নি।

পরিদা মুখ নীচু করে কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে শান্ত সংযত কণ্ঠে বললেন,—বিরাটদা, আমি তোমাকে ঠাট্টা করতে আসিনি। আমি এসেছি তোমাকে জানাতে এবং সম্মতি নিতে। তোমাকে জানালাম, এখন তুমি যদি সম্মতি না দাও, আমি আমার শেষ চেষ্টা করবই। সে চেষ্টায় যদি সফল না হই, তবে দুটি প্রাণীবধের ভাগী তুমিও হবে।

পরি, সত্যিই তুই পারুকে বিয়ে করতে চাস?

হ্যাঁ। এই আমি মা-কালীর মন্দিরে বসে তোমার পৈতে ছুঁয়ে বলছি, আমি পারুলকে বিয়ে করব। এ দয়া করে নয়। আমি ছেলেবেলা হতেই তাকে ভালবাসি। সে ভালবাসার স্বরূপ এতদিন বুঝিনি। আজ বুঝেছি, যখন শুনলাম পারুলের অন্যত্র বিয়ে হবে। এখন তুমি আমার সহায় হবে কি না সেইটে জানতে চাই।

স্যুট দি ম্যান উইথ দি বল,—বলে এক বিরাট হুঙ্কার ছেড়ে, বিরাটদা যেয়ে পড়লেন মা কালীর আসনের গোড়ায়। তারপর

আরম্ভ হল মাথা কোটা প্রণাম, গড়াগড়ি, হাসিকান্না। তার সাথে, 'মা, তুমি সত্যই জাগ্রত। তুমি আমার কথা শুনেছ। তুমি দুটি ভাই-বোনকে মৃত্যুর হাত হতে বাঁচার উপায় করে দিলে।' ইত্যাদি প্রলাপ আর ভাবাবেগের পাগলামী।

(৭)

কালীবাড়ি-নাটমন্দির গ্রামের ছেলেবুড়ো সকলেরই আড্ডা, ক্লাব, টাউনহল। বেলা বারোটার পর বসে যুবকদের আড্ডা, বিকাল থেকে চলে বৃদ্ধ-প্রৌঢ়দের দাবা-পাশা, দলাদলি, শাস্ত্রপাঠের আসর।

গ্রীষ্মের বন্ধে গ্রামের অনেকগুলি কলেজের ছেলে বাড়ি এসেছে। এই সময়ে ঢাকা, কলকাতায় পুলিনদাস ও পি, মিত্র মহাশয়ের অনুশীলন-সমিতি বাইরে স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সমাজ-সংস্কার, শরীর চর্চা ইত্যাদি সম্পর্কে জোর প্রচারকার্য চালাচ্ছিলেন। সেই সাথে ভিতরে ভিতরে জাগাচ্ছিলেন, সমস্ত অন্যায়, আবিচার, কুসংস্কার ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক মনোভাব। কলেজের ছেলেরা ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে যেয়ে, গ্রামের ছেলেদের মধ্যে ছড়াত সেই ভাব। গ্রামের ছেলেরা দল বেঁধে বসে ঢাকা-কলকাতা-প্রত্যাগত কলেজের ছেলেদের মুখে শুনত জাতির ও দেশের স্বাধীনতাকামী বীর নেতা গ্যারিবল্ডী, ম্যাটসিনী, জর্জ ওয়াশিংটন, শিবাজী, রাণা প্রতাপের কাহিনী। তারা অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে শুনত ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস, রাশিয়ার বিপ্লবী নিহিলিস্ট দলের বিদ্রোহ প্রচেষ্টার দুঃসাহসিক গল্প। আর প্রাণ খুলে গাইত,—'যায় যাবে জীবনে চলে, বন্দেমাতরম্ বলে।'

সে যুগে শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রীকান্তের সেই হবু ডিপুটি যমভয়বর্জিত 'দর্জিপাড়ার ছেলের' মত 'ঠুন্ ঠুন্ পেয়ালা' গাওয়া বাবুর আবির্ভাব পূর্ববঙ্গে একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। যদি দৈবাৎ বাইরে থেকে ও প্রকার কেউ যেয়ে পড়ত, তবে তার মর্যাদা বুঝে

শীতকালে নিজের গায়ের চাদর খুলে বিছিয়ে বসতে দেওয়ার মত ভদ্র শ্রীকান্ত বা ইন্দ্রনাথ তো ছিলই না, বরং চাঁটির চোটে মাথার চুল ছেঁটে দেওয়ার মত অভদ্র ছেলে যথেষ্ট ছিল।

বাংলায় ছেলেদের মধ্যে এসেছে তখন এক অপূর্ব ভাবের জোয়ার। সে জোয়ারের প্রথম ধাক্কায়ই ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল তাদের সমস্ত দীনতা, হীনতা, ভয়। তখনও কর্মপন্থা ও ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট হয়নি। বাংলার তরুণ সমাজের অবস্থা তখন স্টার্ট পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মটরলঞ্চের মত।

বেলা বারটা বেজেছে। কালীবাড়ি-নাটমন্দিরে গ্রামের যুবকদের আড্ডা বসার সময় হয়েছে। প্রথম দলে যে চারজন উপস্থিত হল তাদের দুজন কলকাতায় এম, এ, পড়ে। একজন পড়ে ল' কলেজে, আর একজন ইঞ্জিনীয়ারিং। চারজনই গ্রামের স্কুলে এক বৎসর বিরাটদার সহপাঠী ছিল।

দূর হতেই বিরাটদার কাণ্ডকারখানা দেখে চারজনই ছুটে এসে প্রশ্ন করল,—ব্যাপার কি পরি? বিরাটদার এত ভক্তির বাণ ডাকল কেন? হয়েছে কি?

বিরাটদা তাঁর অভ্যস্ত হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে জ্যোতির গলা জড়িয়ে ধরে আকুল আবেগে বললেন,—ভাই, পরি আমার পারুকে বিয়ে করতে চায়। ও পারুকে ভালবাসে। তোরা সকলে আমার পারুকে বাঁচা। পরি-পারুর বিয়ে দিতে তোরা সকলে আমার সহায় হয়ে আমাকে রক্ষা কর।

মাতৃহীন পারুল বিরাটদার কোলে পালিতা হয়ে গ্রামের সমস্ত যুবকেরই স্নেহপাত্রী। এক ধনবান বৃদ্ধ চার'শ টাকায় গ্রামের মেয়ে সুন্দরী ষোড়শী পারুলকে কিনে নিয়ে যাচ্ছে, এ সংবাদে সকলেই দুঃখিত ও মনে মনে বিচলিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কোনও প্রতিকারের পথ পায়নি। এখন তাদের দলেরই একজন পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষিত সুশ্রী যুবক সাহস করে তার কৌলীন্যের বেড়া ভেঙ্গে এই বিসদৃশ ব্যাপারের সুষ্ঠু মীমাংসা করতে এগিয়ে এসেছে শুনে সকলেই

মহানন্দে এ বিবাহে উৎসাহিত হয়ে উঠল। পথ পাওয়া গেল, এখন সে পথে যাত্রার ব্যবস্থা করতে হবে।

ক্রমে আরও সাত আট জন এসে গেল। সকলেই কলেজের ছাত্র। সমস্ত শুনে সকলেই মহা-উৎসাহী। তারপর একটা চমৎকার রোমান্সের লোভ। বসে গেল পরামর্শ সভা।

বিমল বলল,—বিরাটদা, তুমি তো বিয়ে-পাগলা বুড়োটাকে স্টুট দি ম্যান উইথ দি বল করবে। আমরাও তোমার সাথে নেমে কিক্ দি ম্যান আউট অফ দি ফিল্ড করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে পরি-পারুর বিয়েটা কেমন করে কোথায় দেবে বল তো? কাল এখানে বিয়ের আসরে হাঙ্গামা বাধালে সেটা অত্যন্ত বিশ্রী দেখাবে। তাতে আমাদের এই সুন্দর পরি-পারুর বিয়ের সৌন্দর্য-মাধুর্যও নষ্ট হয়ে যাবে। এখন ভেবে চিন্তে এমন একটা ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে সমস্ত ব্যাপারটায় বেশ একটা উপভোগ্য রোমান্স থাকবে, অথচ কাজটিও সুন্দর হওয়া চাই।

সন্তোষ বলল,—আমরা যখন ভাল পাত্র হাতে পেয়েছি, তখন গোবিন্দ কাকাকে বলে ও বিয়ে বন্ধ করে, এই বিয়ে দিলেই তো আর কোনও ফ্যাসাদ দেখা দেবে না।

জ্যোতি বলল,—তা ভাই হবে না। তার প্রধান কারণ হচ্ছে, একে পারুর আপন মা বেঁচে নেই, ঘরে সৎ-মা। গোবিন্দ কাকা মেয়ের বিয়ে দিয়ে চারশ' টাকা নগদ পাচ্ছেন। ধনী জামাইএর কাছে ভবিষ্যতেও আশা আছে। এত টাকা, আর এই ভবিষ্যতের সম্ভাবনা হাতছাড়া করতে দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিছুতেই রাজী হবেন না। গ্রামের বৃদ্ধেরাও আমাদের পক্ষ সমর্থন করবেন বলে মনে হয় না। কারণ, আমি শুনেছি তাঁরা যুক্তি আঁটছেন, কেমন করে ঐ বুড়ো বরের ঘাড় ভেঙ্গে এই কালীবাড়ির ঘাটটা বাঁধানো যায়। তারপর পরির কুলীন পিসেমশাইও এ বিয়েতে প্রবল বাধা দেবেন। কি বল ভাই শঙ্কর, চাটুজ্যে কাকা কি এ বিয়ে সহজে হতে দেবেন?

পরিতোষবাবুর পিসতুত ভাই শঙ্কর বলল,—মোটেই না। এ

বিয়ের মধ্যে আমিও আছি শুনে, বাবা হয় তো আমাকেই বাড়ি ঢুকতে দেবেন না, তবে মা আছেন এই যা ভরসা। জান তো ভাই, আমার বিয়ের সময় বউটার মাতুল-কুলে কোথায় কে কুলে একটু খাটো ছিল বলে, বিয়ের আগের দিন বাবা সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন। তখন কেবল পণ্ডিত জেঠামশাইএর ধমকে, আর মা'র জেদের ফলে বিয়ে হয়। তাও বাবা বিয়েয় গেলেন না। এখন পর্যন্তও আমার শ্বশুর-বংশের কারও সাথে একত্রে বসে খান না। তোমার কথাই ঠিক, আমাদের অন্য পন্থা খুঁজতে হবে।

তখন সকলে মিলে পরামর্শ করে স্থির করা হল,—কাল সন্ধ্যায় পাঁচখানা বাইচের নৌকা কালীবাড়িঘাটে প্রস্তুত থাকবে। বাছা বাছা চল্লিশ জন স্কুল কলেজের ছাত্র বাইচের বৈঠা নিয়ে কালীবাড়িঘাটে সমবেত হবে নন্তুকে দিয়ে পারুলকে ডাকিয়ে এনে নৌকায় তুলে, তিন মাইল দূরে দাদু বিমলাবাবুর বাড়ি যেয়ে, দিদিমার সহায়তায় বিবাহ নিষ্পন্ন করা হবে। দাদু ও দিদিমাকে আগে কিছু জানানো হবে না, কারণ তাতে অসুবিধে দেখা দিতে পারে। সকলে মিলে বর-কনে নিয়ে যেয়ে, তাঁদের ওপরে চড়াও করে, রাতের মধ্যেই বিয়ে সমাধা করতে হবে। বিয়ে হয়ে গেলে তারপর যা ঘটে ঘটুক, তাতে কেউ পিছ-পা নয়।

মনীন্দ্র বলল,—পরি-পারুর বিয়েটা কিন্তু আইন ও ধর্মসম্মত হওয়া চাই। পারুল আমাদের সকলেরই বোন। তার বিয়ে নিয়ে একটা যা-তা ছেলেখেলা চলবে না। বিয়ের দ্রব্যাদি ও পুরোহিত এখন হতেই যোগাড় করতে হবে। টাকা যা লাগবে, তা আমাদের মধ্যে চাঁদা করে তোলা হোক। আর পৌরোহিত্যের জন্যে চণ্ডীদাকে ডাক।

গ্রামের পুরোহিত ভট্টাচার্য বাড়ির ছেলে চণ্ডীচরণ বিরাটদার সমবয়সী। বাল্যকাল হতেই গ্রামের দুর্দান্ত দুঃসাহসী বুদ্ধিমান ছেলেদের একজন। গ্রামের স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ করে, বাড়িতেই পণ্ডিত জেঠামশাইর টোলে পড়ে কাব্য-ব্যাকরণের উপাধি নিয়ে স্মৃতি

পড়ছিলেন। সংবাদ পেয়ে এসে সমস্ত শুনে বললেন, তোমাদের কোনও চিন্তা নেই। আমি পরি-পারুর বি পূর্বক বহ ধাতু ঘঙ্-এর সব ব্যবস্থা করব। জেঠামশাইকে বলে কাল আমি চক্রবর্তী বাড়ির পুরোহিত হব। বিরাটদা, তুমি যেয়ে গোবিন্দ কাকাকে বল যে, তুমি উপবাস থেকে পারুর অধিবাস ও সম্প্রদান করবে। গোবিন্দ কাকা কেবল নান্দীমুখ শ্রাদ্ধটা করবেন। তারপর অধিবাস হবে সাণ্ডিল্যগোত্র পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে কাশ্যপগোত্রা পারুল দেবীর বিবাহের। ও বুড়ো হনুমানের নাম গন্ধও থাকবে না। পরি থাকবে আমার সাহায্যকারী হয়ে। ঐ সাথে পরির অধিবাসটাও করিয়ে নেব। নান্দীমুখ অনুকল্প একটা ভোজ্য উৎসর্গও পরিকে দিয়ে করিয়ে নেব। তোমাদের চাঁদা তোলার কোনও প্রয়োজন নেই। গোবিন্দ কাকাই মেয়ে বিয়ের সমস্ত দ্রব্যাদি যোগাড় করেছেন। এই শ্রীচণ্ডীচরণ দেবশর্মা কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্ ও হস্ত কৌশলে শ্রীশ্রীশালগ্রাম-শিলা, মঙ্গলঘট থেকে আরম্ভ করে, বিয়ের কনে পর্যন্ত বেমালুম লোপাট হয়ে, সন্ধ্যার মধ্যেই নৌকা ভরতি হয়ে যাবে। তারপর নৌকার ঘাটে বা পথে যদি কেউ বাধা দিতে আসে তবে চণ্ডীচরণের একখানা লাঠিই যথেষ্ট। তোমাদের গায় কাঁটার আচড়ও লাগবে না।

সুরেন বলল,—চণ্ডীদা বোধ হয় আমাদের মানুষ বলেই গণ্য করে না। আমরাও ঢাকা-কলকাতার ভাল ভাল আখড়ায় কুস্তি, লাঠি-তলোয়ার খেলা শিখে থাকি। বিপদ যদি আসেই তবে নিশ্চয়ই আমরা তোমার পিছনে লুকিয়ে গা বাঁচাব না।

আরে থাম, থাম! ঢাকা-কলকাতার মেস বোর্ডিং-এ ঠাকুরের হাতে খেয়ে খেয়ে তোরা তো হয়েছিস নাড়ী-মরা বাবু। তোরা আবার লাঠি ধরবি কি? আমি কেমন খাই তা দেখিয়ে দেব তোর বিয়ের সময়। আধমনি রুইমাছের একটা গোটা মুড়ো, পাঁচ সেরী হাঁড়ির এক হাঁড়ি দই, আর গুণে এক'শ রসগোল্লা-পান্তুয়া খাব, দেখিস।

জ্যোতি বলল—চণ্ডীদা, পরি-পারুর বিয়েয় কিন্তু তোমার বরাতে সবদিক দিয়েই একদম হাওয়া।

আরে ভাই, ভাগ্যে যদি থাকে, তবে বনে বসেও রাজভোগ মিলবে।

তারপর সে দিন রাত্রি আটটার মধ্যেই গ্রামে প্রচার হয়ে গেল আগামী কাল সন্ধ্যার পর একটা সখের বাইচ হবে। সে বাইচে গ্রামের পনরো বছর বয়সের ছেলে থেকে পঁচিশ বছরের যুবক সকলেই যোগ দেবে।

বিক্রমপুরে বাইচ খেলা বরাবরই একটা মহা-উৎসাহের ব্যাপার। সে বাইচে যদি মারামারির সম্ভাবনা থাকে, তবে উৎসাহের তাপ চরম ডিগ্রীতে ওঠে। এ বাইচে যারা বৈঠা ধবার নির্দেশ পেল, তারা মহানন্দে বৈঠা ঠিক করতে লেগে গেল। বাইচের আসল স্বরূপটি কিন্তু গ্রামের পনরো-ষোলটি যুবক ছাড়া আর কেউ জানতে পেল না। যে-হেতু বাইচে সমস্ত উচ্চ শিক্ষিত যুবকেরা যোগ দিয়েছে, সেহেতু অপর কেউ সন্দেহও করল না।

লজ্জাবশতই হোক, অথবা অন্য কোনও কারণেই হোক, পরিতোষ-বাবু যে সেদিন দুপুরে পারুলের সাথে দেখা করেছিলেন, সে কথা আর কাউকে জানালেন না।

(৮)

গোবিন্দ চক্রবর্তী প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ভট্টাচার্য বাড়ি পাশার আড্ডায় যান, ফেরেন রাত্রি এগারটায়। সে রাত্রেও তিনি পাশা খেলতে গিয়েছেন। দরিদ্রের মাতৃহীন মেয়ের বুড়ো পাত্রের সাথে বিয়ে, আত্মীয়স্বজন যত না আসে ততই ভাল। কাজেই বিয়ের জন্যে যতটুকু না করলে নয় ততটুকুই জানাজানি, নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। ফলে বিবাহের পূর্বদিনেও কোনো আত্মীয়-স্বজন আসেনি। বাড়ির

গৃহিণী পারুলের সৎ-মা, তাঁর নিয়ম মত সন্ধ্যারাত্রেই রান্নাঘরের কাজ সেরে সকলের খাওয়ানোর ভার পারুলকে দিয়ে, কোলের শিশু মেয়েটি নিয়ে বড় ঘরের দরজা বন্ধ করেছেন।

পারুলের সৎ-ভাই দু-বছরের নন্তু, তার দিদির অত্যন্ত বাধ্য, অনুগত। নন্তু দিনের বেলা দিদির পেছনে পেছনে ঘোরে, রাত্রে দিদির পাশেই ঘুমায়। সন্ধ্যাবেলা পারুল নন্তুকে পরিতোষবাবুর খোঁজে পাঠিয়েছিল কিন্তু দেখা পায়নি। সন্ধ্যার পর নন্তুকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে বিছানার ওপরে বসে বিরাটদার কেনা বড় ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে। ঘড়িতে ন'টা বাজল, কোনও সংবাদ নেই।

ঘড়ির বড় কাঁটাটা সরতে সরতে দশ মিনিটে চলে গেল, কোথাও কোনও সাড়া শব্দ নেই। পারুল উঠে ঘরের আড়ায় বাঁধা একটা পুঁটুলি নামিয়ে সেটা খুলে, খান চারেক ছেঁড়া শাড়ি বিছানার ওপরে রাখল। বাইরে কি একটা শব্দ হল, পারুল বন্ধ দরজায় কান পেতে কিছুক্ষণ শুনতে চেষ্টা করে শেষে অস্ফুট স্বরে,—'নাঃ, ও কিছু না'—বলে আবার বিছানায় এসে বসল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে কাঁটা সাড়ে-ন'টায় এসে গেছে। ঘরে বিয়ের বাজার করে সব রাখা ছিল। তার মধ্যে ছিল একটিন কেরসিন। পারুল আস্তে আস্তে টিনের মুখটা কাটল। বাইরে রাস্তায় কথা শোনা যায়। জানলা খুলে দেখে দুজন নৌকার মাঝি চলেছে।

ঘড়িতে ন'টা চল্লিশ হয়ে গেল। পারুল ব্যাকুল হয়ে অনুচ্চ স্বরে বলে উঠল,—দাদা, তবে কি তোমার সাথেও আর দেখা হবে না। বলেই আর কান্না চাপতে পারল না।

হঠাৎ নন্তু ঘুমের ঘোরে কেঁদে উঠল। পারুল ঘুমন্ত ভাইটিকে একটা চুমো দিয়ে, তার বুকের ওপরে মাথা রেখে, নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

ঘড়িতে টং টং করে দশটা বাজল। পারুল বিছানা থেকে নেমে এল। তখন আর তার চোখে জল নেই। মুখের ভাব বোধ হয় একমাত্র দৃঢ় সঙ্কল্প ছাড়া আর কিছু জানায় না। ঘরের কোণে ছিল

বিরাটদার খড়মজোড়া। সেটা হাতে নিয়ে মাথায় ছুঁইয়ে বলল,—দাদা, তোমার সাথে আর দেখা হল না। সেই গায়ে হলুদের সময় উধাও হয়েছ, এ পর্যন্তও এলে না। তুমি সারাদিন না খেয়ে রয়েছ। আজ শেষ দিনে তোমাকে যে অভুক্ত রেখে চললাম এই একমাত্র দুঃখ, তাছাড়া আর দুঃখ নেই। আমার পরিদা আমাকে ভালবাসে।

এই বলে খড়মজোড়াটা যথাস্থানে রেখে, পরনের ভাল শাড়ি খুলে রেখে একখানা পুরনো শাড়ি পরে আর একখানা তার ওপরে জড়াতে আরম্ভ করতেই বাইরে হুঙ্কার উঠল,—

স্টুট দি ম্যান উইথ দি বল, পারু উ-উ, ভাত দে। বড়্ডো খিদে পেয়েছে, সারাদিন কিছু খাইনি।

পারুল তাড়াতাড়ি ছেঁড়া কাপড় ছেড়ে ভাল কাপড় পরে, কোনও প্রকারে সমস্ত সামলিয়ে নিয়ে, দরজা খুলতেই বিরাটদা ঘরে ঢুকে, বোনের দুখানা হাত ধরে, মিনতিভরা কণ্ঠে বললেন—

পারু, লক্ষ্মী দিদি আমার, আমার কথা মত একটা কাজ তোকে কাল করতেই হবে। বল, তুই আমার কথা রাখবি কি না?

দাদা, আমার যে আর কোনও প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়া চলে না।

পারু, দিদি, আজ গায়ে হলুদের সময় তোর চোখের জল দেখে আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। জাগ্রত মা কালী আমাকে বাঁচিয়েছেন, নচেৎ তুই আর আমাকে দেখতে পেতিসনে। মা-কালী দয়া করে ঠিক সময় মত পরিতোষকে পাঠিয়েছিলেন। পরি তোকে বিয়ে করতে চায়। সে তোকে খুব—

আর বলা হল না, পারুল দাদার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। বিরাটদা চোখের জলে ভেসে বোনের মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে গদ গদ কণ্ঠে বলতে লাগলেন—দিদি আমার, লক্ষ্মী আমার, পরি বড় ভাল ছেলে। জ্যোতি, শঙ্কর, বিমল, চণ্ডে-পাগলা সকলে আমাদের সহায়। এই নিয়েই এতক্ষণ সকলে ব্যস্ত ছিলাম। আহা, পরিও আজ সারাদিন কিছু খায়নি, কচি মুখখানা শুকিয়ে কালো হয়ে গিয়েছে। কালই বিয়ে দেব। চণ্ডীঠাকুর

খেপেছে যখন, তখন কেউ বাধা দিয়ে কিছু করতে পারবে না। কাল চণ্ডে-পাগলাই আমাদের পুরুত হয়ে আসবে। তুই তার কথামত চলবি।—

এই প্রকার কত কথা আর কান্না। শৈশবে মাতৃহারা দুটি ভাই-বোনের সে আবেগোচ্ছ্বাসের কান্না, কথা, সদাজাগ্রত মা-কালীই দেখেছেন ও শুনেছেন, ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না।

নন্তু জেগে উঠে দাদা-দিদির কান্না দেখে কেঁদে ফেলল। পারুল তাকে কোলে টেনে নিয়ে বলল, ভয় কি ভাই, আমি তো তোর কাছেই আছি।

তবে কাঁদছ কেন?

বিরাটদা বললেন নন্তু, তুই শুনিসনি! কাল এক বুড়ো রাক্ষস বর সেজে তোর দিদিকে ধরে নিতে আসবে?

নন্তু আরও ভয় পেয়ে দিদির গলা জড়িয়ে ধরল।

বিরাটদা আবার বললেন—নন্তু ভাই শোন,—আমি, পরি, চণ্ডীঠাকুর সবাই মিলে ঠিক করেছি, কাল বুড়ো রাক্ষস আসার আগেই তোর দিদিকে আমরা লুকিয়ে রাখব। তারপর রাক্ষস এলে সব্বাই মিলে রাক্ষসগুলোকে মেরে তাড়িয়ে দেব। তুইও আমাদের সাথে থাকবি। এ কথা কিন্তু কাউকে বলিসনে। বললেই রাক্ষসেরা এসে তোর দিদিকে ধরে টপ করে খেয়ে ফেলবে, আর আমরা বাঁচাতে পারব না।

কাউকে বলব না? মা-কেও না?

না, কাকেও বলবিনে। বললেই রাক্ষস হালুম করে খেয়ে ফেলবে। তুই কাল সব সময় দিদির কাছে থেকে পাহারা দিবি। চণ্ডীঠাকুর কাল তোর দিদিকে বাঁচানোর জন্যে পূজো করবে। চণ্ডীঠাকুর তোকে যখন যা করতে বলে তাই করবি। কেমন, পারবি তো দিদিকে পাহারা দিতে?

দাদা, আমার ধনুকের ছিলেটা ছিঁড়ে গেছে। ছিলেটা লাগিয়ে দেবে? আর কয়টা ভাল তীর করে দেবে?

হ্যাঁ, কাল সকালেই করে দেব।

শুনে নন্তু ভারি খুশি। সে কি সোজা বীর! তার তীরের ভয়ে কাক পালায়, ও বাড়ির হুলো বিড়ালটা তীর খেয়ে ম্যাওঁ করে ছোটে।

(৯)

বিবাহের দিন যথারীতি চণ্ডীচরণের পৌরোহিত্যে নান্দীমুখ, অধিবাস হল। বৃদ্ধেরা কেউ কিছু বুঝতে পারলেন না। এ বিবাহে গ্রামের কোনও ছেলেরই যে আগ্রহ নেই, বরং তারা একটা বাজে বাইচ খেলা নিয়েই মত্ত, সে কথা নিয়ে বয়স্কদের মধ্যে কিছু সমালোচনাও চলল। বিয়ের পাত্র-পাত্রীর বয়সের এতবড় 'তফাৎটা', একালের ছেলেমেয়েরা কেউই ভাল চোখে দেখে না! তবে শ্রীমান বিরাটচন্দ্রের মত ভাল ছেলে গ্রামে আর নেই। সে বিধাতার বিধান, প্রজাপতির নির্বন্ধ বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়ে পরিতোষকে ডেকে এনে সমস্ত কাজ করছে। পরিতোষও অতি নিরীহ ধার্মিক ছেলে, পারুলকে ছেলেবেলা হতেই স্নেহ করে, তাই পারুলের বিয়েতে আপ্রাণ খাটছে।

গ্রামের বুদ্ধিমতী গৃহিণীরা কিন্তু পারুলের ভাব-ভঙ্গী দেখে বিস্মিত হয়ে কানাকানি করতে লাগলেন, যে পারুল গতকাল গায়ে হলুদের সময় কেঁদে ভাসিয়েছে, সেই পারুল আজ বিয়ের দিনে পরম শান্তশিষ্ট হয়ে প্রতিটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সাগ্রহে সমাধা করছে! আনন্দে মেয়ের রূপ উছলে পড়ছে! এ লক্ষণ বড় ভাল নয়। গোবিন্দঠাকুরের মেয়ের বিয়ে বোধহয় নির্বিঘ্নে সমাধা হবে না।

নন্তু সেজে গুজে তীরধনুক হাতে দিদির সাথেই আছে। যখন কেউ নিকটে না থাকে তখন দিদির কানে কানে জিজ্ঞাসা করে, দিদি, বুড়ো রাক্ষসটা কতদূর এল? এখন সে কোথায় আছে? তুই পালাবি কখন?

ক্রমে দিন যেয়ে সন্ধ্যা ঘোর হল। কালীবাড়ির ঘাটে পাঁচখানা

বাইচের ছিপ-নৌকা বাঁধা হয়েছে। নাটমন্দিরে প্রায় পঞ্চাশজন যুবক-কিশোর বাইচের বৈঠা হাতে প্রস্তুত। কোথায় কি প্রকার বাইচ হবে তা অনেকেই জানে না। জ্যোতি বলেছে—বিরাটদা আর চণ্ডীদা এলে সব জানা যাবে।

বিয়েবাড়িতে পাড়ার ছেলেদের সাহায্য-বঞ্চিত বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়ের দল যখন ধনী বর ও বরযাত্রীদের আদর-অভ্যর্থনার আয়োজনে ব্যস্ত, অন্দর-মহলে পাড়ার পাকা রাঁধুনী গৃহিণীরা যখন বিয়ের কাজের চাপে চোখে পথ দেখছেন না, তখন সেই সুযোগে গোবিন্দ চক্রবর্তীর কুলপুরোহিত-বংশধর শ্রীমান পাগলাচণ্ডীর অপূর্ব দক্ষতায়, বিবাহে প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য কালীবাড়িঘাটে নৌকায় চালান হয়ে গেল। শেষে চণ্ডীদা যখন শালগ্রাম-শিলা মঙ্গলঘট আর পারুল নন্তুকে নিয়ে ঘাটে এসে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর সেই বুড়ো হনুমানের সখের বিয়ের বাজনা দূরে শোনা যাচ্ছিল।

ছেলেদের মধ্যে যারা প্রকৃত ব্যাপার জানত না, তারা পারুলকে নৌকায় দেখে অবাক হল। চণ্ডীদা এক ক্ষুদ্র বক্তৃতায় বুঝিয়ে বললেন,—

আমাদের গ্রামের মেয়ে পারুল, আমাদের সকলেরই বোন। আমাদের বোন ষোল বছর বয়সের পারুলকে এক ষাট বছরের বুড়োর গলায় ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এই অন্যায়ের প্রতিকার করতে আমরা সকলে আজ মা-কালীর মন্দিরে একত্রিত হয়েছি। আমাদেরই গ্রামের ছেলে পরিতোষ তার কৌলীন্য উপেক্ষা করে পারুলকে বিয়ে করতে স্বীকৃত হয়েছে। চল, সকলে পরি-পারুকে বাঁচিয়ে নিয়ে দাদুর বাড়ি চল। সেখানে আজ রাত্রেই পরি-পারুর বিয়ে দেব। যদি কোনও বাধা আসে তবে প্রয়োজন হলে আমাদের হাতের বৈঠা এক নতুন ধরনের বাইচ খেলবে। খোল নৌকা, চালাও বাইচ, বন্দেমাতরম্।

সমবেত তরুণকণ্ঠে ধ্বনি উঠল, বন্দেমাতরম্। তরুণ বুকের তাজা রক্ত উছলে উঠল। পাঁচখানা বাইচের নৌকায় পঁয়তাল্লিশখানা বৈঠা

চলল সবল হাতের তালে তালে। তীরবেগে ছুটল নৌকা তিন মাইল দূরে বৈদ্যবাড়ির ঘাটের দিকে।

মাইলখানেক যেতেই সম্মুখে পড়ল বিবাহার্থী ধনীবৃদ্ধের বাদ্য-মুখরিত বৃহৎ বজরা। সুন্দরী ষোড়শী বধূর চিন্তাবিভোর বৃদ্ধ জানতে পারলেন না যে, তাঁরই বজরার পাশ দিয়ে তাঁর চার'শ টাকার পারুল-ফুল, বজরায় বারোজন দুর্ধর্ষ লেঠেল থাকা সত্ত্বেও হাতছাড়া হয়ে ভেসে গেল।

(১০)

আশেপাশের দশখানা গ্রামের যুবক, কিশোর, বালকদের দাদু হয়েছেন বিমলাপ্রসাদ গুপ্ত, পেন্‌সন-প্রাপ্ত সাবজজ। বিমলাবাবু প্রথম জীবনে ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। চাকরিজীবনে সরকারী আওতায় টেনিস খেলার ভিতর দিয়ে ঝোঁকটা বজায় ছিল। পেনসন নিয়ে বাড়ি এসে নিকটবর্তী গ্রামের ছেলেদের সমস্ত রকম খেলাধূলা, আনন্দ-উৎসবে যোগ দিয়ে, আর্থিক সাহায্য ও উৎসাহ যুগিয়ে, তাদের হৃদয় জয় করে একেবারে পাকাপোক্ত দাদু হয়েছেন। বিমলাবাবুর স্ত্রীর সখ হচ্ছে সব ছেলে, মেয়ে, বউদের নিজহাতে খাওয়ান। অতএব মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে। বিমলাবাবু বনেদী বড়লোক। তারপর তাঁর দুই ছেলের একটি ব্যারিস্টার, আর একটি বিলাত-ফেরত বড় ডাক্তার। অর্থের অভাব নেই।

ছেলে দুটি বিলাত-ফেরত বলে বিমলাবাবু সমাজচ্যুত। বৃদ্ধেরা শলাপরামর্শের জন্যে বৈদ্যবাড়ির বৈঠকখানায় আসর জমান, কিন্তু পাল-পার্বণে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না। তাঁদের পুত্র-পৌত্রেরা খেলায় জিতে এসে দিদিমার হাতের রান্না পোলাও-মাংস স্ফূর্তি করে খায়। পাশাপাশি গ্রামের মেয়ে, বউ-এর দল বেড়াতে এসে লুচি, পায়স, পিঠে, সব আনন্দ করে খায়। বিমলাবাবুর বাড়িতে খাওয়ানোর ধূমধাম একটা নিত্য ব্যাপার। গ্রামের বৃদ্ধ সমাজপতিরা সব জেনেও, নিজেরা

যে খান না, সেই গর্বের দড়ি দিয়ে নিজের নিজের ধর্ম বেঁধে রেখে, মুখ বুঁজে থাকতেন। সেকালে এমনি করেই কিছুকাল যাবৎ 'হুঁকোর নৈচে আড়াল করে খুড়োর মান রক্ষার' মত ব্যবস্থা সমাজে চালু ছিল।

এই সমস্ত ছেলেমেয়েদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার একটা বিশেষ উদ্দেশ্যও বিমলাবাবুর ছিল। কলকাতা থাকাকালে তিনি অনুশীলন সমিতির সম্পাদক ব্যারিস্টার পি, মিত্রের সংস্পর্শে আসেন। সেই সূত্রে ঢাকার পুলিন দাস মহাশয়ের সাথে পরিচয় হয়। অনুশীলন সমিতির সংগঠন ব্যাপারে প্রথমদিকে বিক্রমপুরে বিমলাবাবু ছিলেন একজন প্রধান গোপনকর্মী। ছেলেমেয়েদের চরিত্রগঠন, স্বাস্থ্যবান করে তোলা, আর তাদের মনে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে প্রকৃত দেশসেবক তৈরা করতে বিমলাবাবু ও তাঁর স্ত্রী সব দিক দিয়ে চেষ্টা করতেন। অকাতরে প্রচুর অর্থও ব্যয় করতেন।

সে দিন রাত্রি আটটায় দাদু খেতে বসেছেন, দিদিমা খাওয়ার তদ্বির করছেন। এমন সময় বাড়ির চাকর যদু এসে সংবাদ দিল, পাঁচখানা বাইচের নৌকা ঘাটে লেগেছে। অনেকগুলো মালকোচা মারা বাবু বড় বড় লাঠি হাতে নৌকা হতে নেমে বাড়ির দিকে আসছে। তাই দেখে সদর দরজা ভালভাবে বন্ধ করে সংবাদ দিতে এসেছে। স্বদেশী বাবু-ডাকাত আসছে দেখে হিন্দুস্থানী দারোয়ান, চাকর সব পালিয়েছে।

সে যুগে বিপ্লবী যুগান্তর দল তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ ডাকাতি করে সংগ্রহ করত। এ নিয়ে অনুশীলন সামিতি ও যুগান্তর দলের মধ্যে তীব্র মতভেদ ছিল। অনুশীলন সমিতির কর্মী বিমলাবাবুর আর খাওয়া হল না। তিনি দোতলায় গেলেন বন্দুক ঠিক করতে। দিদিমা উঠলেন দোতলার ছাদে।

দোতলার ছাদে দাঁড়িয়ে শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোয় যা দেখলেন তাতে তাড়াতাড়ি নেমে এসে বিমলাবাবুকে গুলি চালাতে নিষেধ করে, খিড়কি দরজা খুলে বাড়ির উত্তরের আমবাগানের ছায়ায় ছায়ায় সদরের দিকে এগিয়ে গেলেন। এগিয়ে যেয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে দেখেন, সমস্ত বাবুই তাঁর চেনা। আরও

দেখলেন, সেই ছেলেদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে পরীর মত সুন্দরী একটি মেয়ে একটা ছোট ছেলের হাত ধরে।

দিদিমা এবার নিশ্চিন্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন। গাছের ছায়া থেকে চাঁদের আলোয় বেরোতেই তাঁকে দেখে সকলে মহা-উল্লাসে ঘিরে ফেলে বলল—

দিদিমা, আমরা আজ একটা বড় কাজ উদ্ধারের জন্যে আপনার কাছে এসেছি। আপনার বাড়িতে এই রাত্রের মধ্যেই আমাদের পরি-পারুর বিয়ে দিয়ে জাতমান বাঁচাতে হবে। এ বিয়ের সমস্ত ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে।

শুনে দিদিমা তো অবাক্। এগিয়ে গেয়ে পারুলের মুখখানা চাঁদের আলোয় তুলে ধরে দেখলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে চণ্ডী, খুলে বল তো?

চণ্ডীদা সমস্ত বললেন। সব শুনে দিদিমা পরিতোষকে ডেকে নিয়ে পারুলের পাশে দাঁড় করিয়ে দেখে বললেন,—হ্যা, মানিয়েছে বেশ। পরি, তুমি এবার বি, এ, পাস দিলে না?

হ্যা দিদিমা, পরীক্ষে দিয়েছি। আশা করি পাস করব।

তুমি যে পারুলকে বিয়ে করতে চাচ্ছ, এটা গরীবের সুন্দরী মেয়েকে অনুগ্রহ করছ, না সত্যিই ভালবাস?

দিদিমা, আমি ছেলেবেলা হতেই ওকে ভালবাসি। আপনি ওকেই এটা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। ও নিজেও আমাকে ভালবাসে, আপনি যেমন দাদুকে ভালবাসেন তেমনি, বোধহয় তার চাইতেও বেশী।

দিদিমা হেসে বললেন—তাই নাকি! তারপর লজ্জিতা পারুলের মুখখানা আর একবার চাঁদের আলোয় তুলে ধরলেন।

এমন সময় বিমলাবাবু বন্দুক হাতে আমবাগানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। দিদিমা বাড়ির পেছন দরজা খুলে আমবাগানের দিকে গিয়েছেন, যতুর মুখে এই সংবাদ শুনে, এবং তাঁর বিলম্ব দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে, ব্যাপার কি তা দেখতে এসেছেন।

দাছুকে দেখে দিদিমা বললেন—এরা আমাদের বাড়িতে ডাকাতি করতে আসেনি। তবে গোবিন্দ চক্রবর্তীর বাড়িতে চুরি করে সেই চৌরাই মালের ব্যবস্থা করতে এসেছে। তুমি যেয়ে সদর দরজা খুলে দাও।

বিস্মিত দাছু দরজা খুলতে চলে গেলেন। দিদিমা সকলকে লক্ষ্য করে বললেন,—তোমরা পূর্বে আমাকে সংবাদ দাওনি কেন? জান, আমি যদি সাহস করে এদিকে না আসতাম, তবে এতক্ষণ তোমরা ছু-চারটে গুলি খেয়ে মরতে। ছেলেমী বুদ্ধি আর কাকে বলে! আয় পারুল, আমরা পিছন দরজা দিয়ে ভিতরে যাই। এ খোকা বুঝি তোর ভাই? খোকা, তোমার হাতে তীরধনুক কেন?

বুড়ো রাক্ষস দিদিকে খেতে এলে মারব।

দিদিমা হেসে নন্তুকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন—এত বড় বীর ভাই যার সে দিদির আবার ভয় কি!

(১১)

সদর দরজা খোলা হল। সকলে ভিতরে গেলে বিমলা বাবু তাদের মধ্যে এসে বললেন,—ভাই, তোমরা যে কাজ করেছ, তার ফল সুদূরপ্রসারী। পারুল নাবালিকা। তাকে তার আইনসম্মত অভিভাবকের গৃহ হতে বিবাহের পূর্বমুহূর্তে অপহরণ করে এনেছ। এর ফলে গুরুতর মামলা বাধতে পারে। কাজেই আমি তোমাদের সমর্থন করতে পারছিনে।

এবার ল-কলেজের ছাত্র মনীন্দ্র এগিয়ে এল। সে বলল—

দাছু, আমিও ওকালতী পড়ছি, এইবার ফাইনাল দেব। প্রচলিত আইনানুসারে আপনার কথাই ঠিক। কিন্তু আইন তো আমরাই করেছি। যে আইন ষাট বছরের বুড়ো ধনীর ইন্দ্রিয় লালসার আগুন হতে অসহায় নাবালিকা মেয়েকে রক্ষা না করে তার সেই কুৎসিত খেয়াল চরিতার্থ করার সহায়তা করে, সে আইন আমান্য করে যদি

জেল খাটতে হয়, তবে তার জন্যে আমরা প্রস্তুত হয়েই এসেছি। এখন কথা হচ্ছে, আপনি আমাদের মধ্যে থাকবেন কিনা? কিন্তু ভেবে দেখুন, এ শিক্ষা, এ সাহস তো আমরা আপনার কাছেই পেয়েছি। আপনিই আমাদের শুনিয়েছেন—যুগে যুগে তরুণেরাই নতুন করে সমাজ গড়ে তোলে। কালক্রমে সমাজের বুকে যে আবর্জনা স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে ওঠে, নির্ভীক তরুণদের সবল হস্ত সে আবর্জনা দূর করে সমাজকে করে সুস্থ, সুন্দর, নির্মল। সেই আপনি! আজ আমরা যখন একটা মর্মান্তিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তার সুষ্ঠ প্রতিকার করতে চলেছি, তখন সেই আপনি আমাদের ফেলে বস্তাপচা আইনের দোহাই দিয়ে সরে যাবেন! একথা কি এখন আমাদের বিশ্বাস করতে বলেন?

দাদু বললেন—ভাই, তুমি কালে একজন বড় জাঁদরেল উকীল হবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তোমার এই বক্তৃতায় ঝানু জজ আমিও সত্যিই ঘাবড়িয়ে যাচ্ছি। তবে এরকম ব্যাপারে তোমার আমার চেইতেও অভিজ্ঞ তোমার দিদিমা। তার সাথেই পরামর্শ করতে হবে।

এমন সময় দিদিমা এসে উপস্থিত হয়ে বললেন—বিয়ে আজ রাত্রেই দিতে হবে, নচেৎ নানাদিক থেকে বাধা আসবে। বিয়ে হয়ে গেলে তারপর যা হয় হবে। যদি মামলা বাধে, ওরা তো তার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছে। তোমার না হয় বে-আইনী কাজে সহায়তা করার জন্যে পেনসন্ বন্ধ হবে, তা হোক। এখন কথা হচ্ছে, এটা ব্রাহ্মণের বিয়ে, হবে আমাদের বাড়ীতে। বিয়েটা অশাস্ত্রীয় হতে দেব না। বিয়েতে যে সমস্ত দ্রব্যাদি লাগবে, তা এই রাত্রে কি করে যোগাড় করব তাই ভাবছি! দুজন ব্রাহ্মণ এয়োও জোগাড় করতে হবে তো!

চণ্ডীদা বললেন—দিদিমা, বিয়ের দ্রব্যাদির জন্যে কোনও চিন্তা নেই। আপনি আমার বড়-বিদ্যের পরিচয় তো এ যাবৎ-কাল নষ্ট-চন্দ্রের রাত্রে পেয়ে আসছেন। আজও সেই বিদ্যে খাটিয়েই মেয়ের

বাপের বাড়ি থেকে বিয়ের সব জিনিস, মায় তুখানা পিঁড়ি, মঙ্গল ঘট, শালগ্রাম-শিলা, সব নৌকা ভর্তি করে তারপর মেয়ে চুরি করেছি। আজ দিনে গোবিন্দ কাকার বাড়িতে পুরোহিত ছিলাম আমি। আমার সাহায্যকারী করেছিলাম পরিতোষকে। অধিবাস করেছি পরি-পারুর বিয়ের। আপনি এ সব দিকে কোনও অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থার আশঙ্কা করবেন না। তবে তুটো এয়োর কথা যা বললেন, তা আমাদের হাতেই আছে। আমরা এয়ো এনে দিচ্ছি।

সন্তোষ গাঙ্গুলী ও কমল চক্রবর্তী, তুজন ঐ গ্রামেই বিয়ে করেছিল। তুই বউ-ই সে সময় বাপের বাড়ি ছিল। সন্তোষ আর কমল গেল তাদের বউ আনতে। এক ঘণ্টার মধ্যেই তুই বউ আর তাদের পাঁচটি ভাই-বউ, বোন সেজে গুজে উপস্থিত হল। গ্রামে সংবাদ প্রচারিত হওয়ায়, আর আধ ঘণ্টার মধ্যে বহু মেয়ে, বউ, গৃহিণী এসে বাড়ি ভরে গেল।

শুভলগ্নে পণ্ডিত চণ্ডীচরণের পৌরোহিত্যে বিরাটদা ভগ্নী সম্প্রদান করলেন। বর-কনে ঘরে ওঠার সময় যখন বাড়িভরা এয়ো উলুধ্বনি দিয়ে শাঁখ বাজাচ্ছিল, সেই সময়ে, অতঃপর গোবিন্দ চক্রবর্তীর বাড়ি কি ঘটেছে, সেই সংবাদ নিয়ে আর একখানা নৌকা বৈদ্যবাড়ির ঘাটে এসে লাগল। ঠিক সেই সময়েই বিবাহার্থী হতাশ বৃদ্ধের বজরা নিঃশব্দে বৈদ্যবাড়ির ঘাট অতিক্রম করে গেল।

বুড়োর বিয়ের সখ আপাতত মিটেছে। গ্রামের প্রায় সব বাড়ির ছেলেই এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকায়, কেউ আর দলাদলির সুযোগ পায়নি। কাজেই ধনী বরের পক্ষ সমর্থকের একান্ত অভাব হওয়ায়, বুদ্ধিমান বৃদ্ধ বর আর বজরা হতে নামেননি। বজরায় বসেই গোবিন্দ চক্রবর্তীর নিকট থেকে তু'শ টাকা ফেরত নিয়ে বজরা ভাসিয়ে ফিরে চলেছেন।

এই সংবাদ পাওয়ার অল্পপরেই চণ্ডেপাগলার নেতৃত্বে চারখানা বাইচের নৌকা ছুটল। এক ঘণ্টার মধ্যেই বারজন বাজনদার আর তু'শ টাকা নিয়ে চারখানা নৌকা নিরাপদে ফিরে এল। শেষ রাত্রে পরি-পারুর বিয়ের রওশনচৌকী বাজনা আরম্ভ হল।

(১২)

এবার কিন্তু বৃদ্ধ বর আর ধৈর্য রক্ষা করতে পারলেন না। বিশেষ করে তাঁর বারজন লাঠিয়াল প্রজা, কেবল মাত্র বন্দেমাতরম ধ্বনি শুনেই বজরার ছাদ থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে অদৃশ্য হওয়ায় একেবারে খেপে গেলেন। রাত্রি প্রভাত হতেই নৌকা থেকে নেমে, ডাকাতির এজাহার দিতে থানায় গেলেন।

এজাহারের ভাবভঙ্গী আর বিমলাবাবুর নাম শুনে, দারোগা সাহেব ডায়রীতে বিশেষ কিছু লিখলেন না। বৃদ্ধকে সাথে নিয়ে ঘটনা স্থল দেখে, গেলেন বিমলাবাবুর বাড়ি। সেখানে অন্দর মহলে তখন কুশণ্ডিকা আরম্ভ হয়েছে। বাড়িভরা মেয়েদের আনন্দ উল্লাস চলছে।

বিমলাবাবু দারোগা সাহেবকে সমস্ত ঘটনাই বললেন, দু'শ টাকার কথা তিনি কিছুই জানতেন না। বাজনদারেরা সাক্ষী দিল, তারাও টাকার কথা জানে না। বাবুরা তাদের এই বিয়েতে বাজানোর জন্যে বলতেই তারা সানন্দে বাবুদের সাথে এসে বাজাচ্ছে।

সমস্ত বুঝে, দারোগা বিমলাবাবুকে এবিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে বলে, অনুরোধ করলেন—তিনি ব্রাহ্মণের বিবাহের কুশণ্ডিকা, কোনওদিন দেখার সুযোগ পাননি। বিমলাবাবু যদি অনুগ্রহ করে দেখান, তবে আনন্দিত হবেন।

বিমলা বাবু সানন্দে দারোগা সাহেবকে বিয়ে দেখার নিমন্ত্রণ করলেন। অন্দর মহলে যাওয়ার সময় দারোগা সাহেব বৈঠকখানায় উপবিষ্ট বৃদ্ধকে বললেন—বুঢ়া কোর্তা, আমাগো হাথে আইয়েন, আপনাগো আসামি দেখ্যা লই।

বাসী বিয়ের আসরের একপাশে তিনখানা চেয়ারে তিনজন এসে বসলেন। বুড়োকে দেখে বিরাটদা স্টুট দি ম্যান—বলেই থেমে গেলেন। আঙ্গিনাভরা বউ, ঝি মুখে কাপড় দিয়ে হাসি চাপতে লাগল। চণ্ডীদা গলা ছেড়ে মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করলেন। নন্ত ভয়ে দিদির কাছ ঘেঁসে দাঁড়াল।

দারোগা সাহেব কিছুক্ষণ ধরে সব দেখেশুনে, তাঁর পাশেই উপবিষ্ট বৃদ্ধকে বললেন,—বুঢ়া কোর্তা, এই হুরীর বাচ্চা মাইয়া লয়্যা রাখবান্ কই? আপনাগো হারেমও নাই বোরখাও নাই। হিঁদুর মদ্দি হাইট্ বছরের বুঢ়ার বিয়ার হক্ চাগান দিলি এম্বাই হয়। আপনি মোছলমান হন ; মুঁই আপনাগো তিন তিনডা নিকা দিয়া দিমু।

যারা এতক্ষণ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছিল, এবার তাদের আঁচল সরে যেয়ে হাসির হর্‌রা পড়ে গেল। পুরোহিত মন্ত্র পড়তে বিষম খেলেন। সকলের এই হাসি হুল্লোরের মধ্যে, বৃদ্ধ যে কখন উধাও হলেন, তা কেউ লক্ষ্য করেনি। যখন জানা গেল তিনি চলে গেছেন, তখন তাঁর মনের অবস্থা বুঝে বিমলাবাবু দুঃখপ্রকাশ করলেন। দিদিমা বললেন—আহাঃ বুড়ো মানুষ, বউমরার ভয়ে বোধ হয় কাল থেকে উপবাসী আছেন। উপবাসী ব্রাহ্মণ না খেয়ে চলে গেলেন, তোমরা কেউ দেখলে না! এটা তোমাদের বড়ই অন্যায়।

বুড়ো ব্রাহ্মণ না খেয়ে চলে গেলেও সেদিন গ্রামস্থ বুড়োর দল কিন্তু সমাজচ্যুত বিমলাবাবুর বাড়ি অনেকদিন পরে ভোজ খেলেন। গ্রামের সমস্ত জাতের তরুণী বউ, মেয়েরা প্রায় সকলেই বিয়ের রাত্রেই বিমলাবাবুর বাড়ি জমায়েৎ হয়েছিল। প্রভাত হতেই বয়স্কা গৃহিণীরা এলেন। তারপর সেদিনের ভোজের রান্নার ভার অতি সহজ ও সরলভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই যখন গ্রামের গৃহিণীরা গ্রহণ করলেন, তখন গ্রামের কর্তারা আর বিমলাবাবুর নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে বেকুব বনে যাওয়া সঙ্গত মনে করলেন না। এই প্রকারে সমাজের আর একটা বিশ্রী সমস্যারও অতি সহজ মীমাংসা, গ্রামের মহিলারাই নির্বিবাদে করে ফেললেন।

সে দিনের ভোজটা কিন্তু ভালই হয়েছিল। যদিও দই, মিষ্টি বেশী যোগাড় হল না, কিন্তু সেটা পুষিয়ে গেল বিমলাবাবুর দিঘির বড় বড় রুইমাছ দিয়ে গ্রামের পাকা রাঁধুনীদের রান্না পোলাও ও কালিয়ায়। চণ্ডীদা সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে বড় বড় দুটো মুড়ো খেলেন।

(১৩)

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। এ বিয়ে নিয়ে আর কোনও দিক হতে কোনও কথা উঠল না। বাসিবিয়ের দিন গোবিন্দ চক্রবর্তী মেয়ে-জামাই নিতে এসেছিলেন। দিদিমা ফুলশয্যা না হলে যেতে দেবেন না বলে তাঁকে বিদায় করলেন। ফুলশয্যার রাত্রে দিদিমা নিজ ব্যয়ে গ্রামের মেয়ে-বউদের ভরপেট মিষ্টি, দই, ক্ষির, পায়স খাওয়ালেন। পরদিন গোবিন্দ ঠাকুর মেয়ে-জামাই নিতে এলে দিদিমা পরি-পারুকে নাতনী-নাতজামাই এর মত সমস্ত দিয়ে সাজিয়ে পাঠালেন। এতে দিদিমার বেশ কিছু খরচ হল। তা হলে কি করা যায়! বনেদী জমিদার ঘর বৈদ্যবাড়ির নাতনী-নাতজামাই তো আর সাধারণভাবে বিদায় করা যায় না!

গোবিন্দ চক্রবর্তী মেয়ে-জামাই বাড়ি আনলে, গ্রাম ভেঙ্গে মেয়ে, বউ, গিন্নীরা দেখতে এলেন। এ বিয়েতে সকলেই সন্তুষ্ট। কেবল পরিতোষের পিসেমশাই একখানা ক্ষুদ্র পত্র লিখে পরিতোষবাবুকে জানিয়ে দিলেন, খোলাকাটা মেয়ে-বেচা চক্রবর্তীর মেয়ে বিয়ে করে, নৈকষ্য কুলীন চাটুজ্যে বাড়িতে পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবেশ আর সম্ভব নয়।

একদিন দুপুরে পিসীমা এসে পারুলকে শাঁখা, সিঁদুর, শাড়ি আর একখানা গহনা দিয়ে আশীর্বাদ করে গেলেন। পিসতুত ভাই শঙ্কর বাপের তাড়া খেয়ে কিছুদিন বাড়ির সদর দরজায় যাতায়াত ছেড়ে দিল। পিছন দরজা দিয়েই চলাফেরা করত।

অষ্টমঙ্গলার পর, বিমলাবাবুর হাতে-লেখা কয়েকখানা সুপারিসপত্র নিয়ে, পরিদা কলকাতা আসেন। কিছু দিনের চেষ্টায় এক বিলেতী কোম্পানীতে কেরানীর চাকরি পান। চার মাস চাকরি করে টাকা জমিয়ে, এই বাসা ভাড়া ঠিক করে পারুলকে আনতে দেশে যান। ফেরার সময় নন্তুও সাথে আসে। সে দিদিকে ছেড়ে কিছুতেই থাকবে না।

প্রথমে কথা ছিল বিরাটদা ষ্টীমার ঘাট পর্যন্ত যেয়ে সকলকে ষ্টীমারে তুলে দেবেন। পরে দেখা গেল তিনি গোয়ালন্দের টিকিট কেটে ষ্টীমারে উঠেছেন। গোয়ালন্দে এসে ঢাকা মেলে পরি-পারুদের তুলে দিয়ে, পারুলের হাত ধরে বিরাটদা কিছুক্ষণ নীরবে চোখের জল ফেলে-

ছিলেন। তারপর পারুলের হাত ছেড়ে দিয়ে, কোনও কিছু না বলে তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে চোখের জল মুছতে মুছতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সেই থেকে এ পর্যন্ত আর তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। উড়ো খবর যা পাওয়া যায়, তাতে, কেউ বলে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে দেশে দেশে ঘুরছেন। কেউ বলে তিনি বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। বিক্রমপুরে বিরাটদার সেই বিরাট হুঙ্কার—'স্টট দি বল উইথ দি ম্যান' চিরতরে নীরব হয়ে গেছে। তাঁর বিখ্যাত বাইচ বিজয়ী বৈঠাখানা এখনও স্থানীয় কালীবাড়ির কালীমন্দিরে সযত্নে রক্ষিত আছে।

বিরাটদা নিখোঁজ হওয়ার ছমাস পরে চণ্ডীঠাকুর বিপ্লবী সন্দেহে পুলিসে ধরা পড়েন। ধরা পড়ে ক'দিন পরেই পুলিস হেপাজত থেকে নিরুদ্দেশ হন। এ পর্যন্তও পুলিস তাঁর পাত্তা পায়নি।

(১৪)

পরিতোষবাবু পারুলকে নিয়ে কলকাতায় ভাড়াটে বাসায় সংসার পাতিয়ে চোদ্দটা বছর পরম সুখে কাটিয়েছেন। যদিও তিনি অল্প বেতনের কেরানী, তথাপি পারুলের সংসার পরিচালননৈপুণ্যে অভাব কাকে বলে তা জানতে পাননি। সঞ্চিত প্রচুর অর্থ, মূল্যবান ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, বহু বিষয়সম্পত্তি, এই সমস্তই যে সুখ নয়, সুখ ও আনন্দ যে অন্য ব্যাপার, তা যে ব্যক্তি কোনও দিন ভোগ করেনি, তাকে কোনও প্রকারেই বুঝানো যাবে না। সামান্য বেতনের কেরানী পরিতোষবাবু কলকাতার ভাড়াটে বাসায় সংসার পাতিয়ে, পারুলের গুণে যে সুখ, যে আনন্দ ভোগ করেছেন, তা বহু ধনীর প্রাসাদে দুর্লভ। পরিতোষবাবুর সব অভাব পূরণ করেছে পারুলের ভালবাসা। শুধু অভাব পূরণই নয়, পারুলের ভালবাসার মাধুর্য পরিদাকে আনন্দ-সাগরে ডুবিয়ে রেখেছিল। তাঁকে আর কিছু ভাবতেই দেয়নি।

নন্তুর ভাল নাম নরেশ। সে বরাবরই দিদির কাছে ছিল।

পারুল তাকে এই কেরানীর সংসার হতেই এম. এ. পাস করিয়েছে। পারুলের ইচ্ছা ছিল, ভাইটিকে ওকালতী পড়ায়। কিন্তু দুরন্ত কাল তার সে ইচ্ছা পূরণ করতে দিল না। দিদির অকাল মৃত্যুতে নরেশ বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েছে।

পারুলের কথা বলতে বলতে শেষের দিকে পরিতোষবাবু বিহ্বল হয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। বুঝলাম, ভদ্রলোক এ পর্যন্ত প্রাণ খুলে কাঁদার সুযোগ পাননি। বোধহয় পারুলের কথা বলে, কেঁদে মনটা হাল্কা করার মত শ্রোতাও এর পূর্বে পাননি।

যখন পরিতোষবাবু বললেন—মাষ্টার মশাই, পারুল আমাকে ছেড়ে যেতে পারে—এ আমার কল্পনাতীত ছিল। মাত্র বাইশ ঘণ্টার দুরন্ত জ্বর, তাকে জোর করে আমার বুক হতে ছিঁড়ে নিয়েছে। যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে আমি কিছু না বুঝলেও সে বুঝেছিল যে, তাকে যেতেই হবে। তাই আমি কাঁদব বলে, সে তার যাওয়ার কথা আমাকে না জানিয়ে, আমার পা দুখানির মধ্যে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। আমার চোখের জল তার সহ্য হবে না বলে, সে আর আমার মুখের দিকে তাকাল না। মাষ্টার মশাই, মরণের পরপার হতে কি এপারের কিছুই দেখা যায় না?

শুনে আমার চোখের জলও ঠেকাতে পারলাম না। আমি তাঁকে কোনও সান্ত্বনার কথা শুনাইনি। আমার নীরব চোখের জলই বোধ হয় তাঁকে কিছু সান্ত্বনা দিয়েছিল।

কথঞ্চিৎ শান্ত হয়ে পরিতোষবাবু বললেন, মাষ্টার মশাই, সকলেই আবার আমাকে বিয়ে করতে বলে। তারা বোঝে না—পারুল আমার কি ছিল। তারা বলে, দু'চার মাসের মধ্যেই আমি সব ভুলে আবার বিয়ে করে বউ ঘরে আনব। আমার এ বয়সে অনেকে বিয়েই করে না। এই রকম কত কি বলে তারা আমাকে সান্ত্বনা দিতে চায়। তাদের কথা শুনে আমার বুক ফেটে যায়, তা তারা বোঝে না। তাদের কথায় মনে হয়, অপর সকলে যেমন করে স্ত্রী পায়, আমি বোধ হয় তেমন করে পারুলকে পাইনি।

পারুলের হাতের সেলাই কাজ, আচার, মোরব্বা—বাক্স খুলে তার সিঁদুরের কৌটা, সামান্য কখানা গহনা, কখানা শাড়িকাপড়, সংসার খরচের হিসাবের খাতা—সমস্ত পরিতোষবাবু আমাকে দেখালেন। আমার মত নিঃসম্পর্ক তৃতীয় পক্ষের চোখে দ্রষ্টব্য হিসাবে সেগুলির গুরুত্ব নাও থাকতে পারে, কিন্তু পরিতোষবাবুর হৃদয়াবেগ বুঝে, ওগুলি দেখলে, অমূল্য সম্পদ বলেই মনে হবে।

সারাটা রাত্রি আমাদের দুজনের জেগে কাটল বললে ভুল হবে। রাতটা যে কি করে এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল, তা আমিও বুঝলাম না। ভোরের আলো জানলা দিয়ে ঘরে এসে পড়েছে। মলিন বিছানায় পাঁচটি মাতৃহারা সন্তান ঘুমিয়ে আছে—যেন রাতের নিষ্ঠুর ঝড়ে গাছ থেকে ছিঁড়ে পথে-পড়া একথোকা চাঁপা ফুল।

ভোর হয়ে গেল। এবার আমাকে বিদায় নিতে হবে। এক রাত্রের অতিথি আমি, কিন্তু সেই এক রাত্রেই পরিতোষবাবু যেন আমার পুরনো বন্ধু হয়ে গেলেন। তাঁকে আমার জ্ঞান বুদ্ধিমত একটা পরামর্শ দিয়ে বললাম—

পরিতোষবাবু, আর আধঘণ্টার মধ্যেই আমাকে পথে বেরোতে হবে। আমি আপনাকে একটা পরামর্শ দিতে চাই। আপনি কিছু দিনের ছুটি নিয়ে, দেশে আপনার শাশুড়ীর কাছে ছেলেমেয়ে কটি রেখে আসুন। এ বাসা ছেড়ে একটা ভাল মেসে বাসা করুন। আপনি আর নরেশ মাসে মাসে টাকা পাঠালে, আপনার শাশুড়ী ছেলে মেয়ে রাখতে আপত্তি না করে বরং আগ্রহই প্রকাশ করবেন। আগে থেকে পত্র লিখে যদি শাশুড়ীর সম্মতি নিতে চেষ্টা করেন, তবে সেটা ভুল হবে। আপনি একেবারে ছেলেমেয়ে সাথে নিয়ে যেয়ে, কিছু নগদ টাকা শাশুড়ীর হাতে দিয়ে, ওদের রেখে আসুন। তারপর কলকাতা এসে একটা সদ্‌বংশের ভাল মেয়ে দেখে, যত শীঘ্র সম্ভব নরেশের বিয়ে দিন। তারপর নরেশ তার চাকুরিস্থলে বাসা করে আপনার ছেলে-মেয়ে নিয়ে মানুষ করুক। আপনি যা মাইনে পান তার থেকে আপনার নিজস্ব প্রয়োজনীয় টাকা রেখে, বাকী সমস্ত নরেশের হাতে দিয়ে

দেবেন। নরেশ তার দিদির হাতে-গড়া ভাই। এই ব্যবস্থায় আপনি সব দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে শান্তি পাবেন বলেই মনে করি।

আমার কথা শুনে পরিতোষবাবু অতিশয় আগ্রহ সহকারে আমার হাত চেপে ধরে বললেন—মাষ্টার মশাই, আপনি ভাল পরামর্শ দিয়েছেন। পারুলকে হারিয়ে আমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে। অপর কেহই আমাকে সৎপরামর্শ দেয় না। সকলেই কেবল বিয়ে করতে বলে। আমি আজই ছুটির দরখাস্ত করব। নরেশের জন্যে পারুল নিজেই মেয়ে দেখে পছন্দ করে, সম্বন্ধ ঠিক করে গিয়েছে। আমি দু'মাসের মধ্যেই নরেশের বিয়ে দিতে পারব। আপনি সত্যিই আমার পরম বান্ধব, মা কালীই আজ আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

পরিতোষবাবুর নিকট বিদায় নিয়ে, ঘর থেকে বেরোবার সময় দেখলাম, তখনও পাঁচটা ছেলেমেয়ে অকাতরে ঘুমচ্ছে। বড় মেয়েটা বোধহয় স্বপ্নে মাকে পেয়ে তার সাথে কথা বলছে।

* * *

এই ঘটনার প্রায় দশ বৎসর পরে একদিন সন্ধ্যায় কলকাতায় কলেজ স্কোয়ারে বসে আছি। এক ভদ্রলোক দু'তিনবার আমার সম্মুখে ঘোরাফেরা করার পর, আমার পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনাকে যদি দশ বৎসর পূর্বে পরিতোষবাবুর বাসায় দেখা মাষ্টার মশাই বলে মনে করি, তবে কি সেটা আমার ভুল হবে?

সেখানে সে রাত্রে আপনাকে দেখেছি বলে তো মনে হয় না!

আমিই পরিতোষ ব্যানার্জী।

আশ্চর্য হলাম। দশ বছর আগের দেখা পরিতোষবাবু অপেক্ষা এঁর বয়স আরও কম বলে মনে হল। আনন্দোজ্জ্বল মুখশ্রী, শরীর সুন্দর স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে ভরা। আশ্চর্য!

আমাকে বিস্মিত হতে দেখে তিনি বললেন—মাষ্টার মশাই, আপনার পরামর্শমত চলে আজ আমি পরম সুখী। আমার পারুলকে আমি অন্তরে অন্তরে পেয়েছি। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, তথাপি আপনি আমার পরম বান্ধব বলেই বলছি—

পারুল স্বর্গে গিয়েও আমার দুঃখ অনুভব করে স্থির থাকতে পারেনি। সে, স্বর্গ ছেড়ে এসে একদিন আমার আত্মার সাথে এক হয়ে গেল, ঐ আমি স্পষ্ট দেখেছি। তারপর থেকেই তাকে আমি বড় নিবিড় করে পেয়েছি। আজ আর আমি পারুল-হারা পরিদা নই। আপনি দশ বৎসর পূর্বে দেখেছিলেন পারুল-হারা পরিকে, তাই পারুল পাওয়া পরিতোষকে চিনতে পারলেন না।

পরিতোষবাবুর গণ্ডবেয়ে অশ্রু গড়াতে লাগল। এ অশ্রু কিসের? বিয়োগ ব্যথার? না নিবিড় প্রাপ্তির আনন্দাশ্রু?

নাথুয়া দোসাদ

পরিতোষবাবুর বাসা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে মনে হল, তাই তো, এখন যাই কোথায়? নবদ্বীপ ফিরে যাওয়ার ভাড়া বাদে আর টাকাদেড়েক পকেটে আছে। এই সম্বলে আর কদিনই বা কলকাতা থেকে ঘোরা যাবে? আর ঘুরেই বা কি করব? চাকরি যোগাড় করতে হলে যে সমস্ত যোগ্যতা থাকা উচিত, তার কোনওটাই যে আমার নেই।

ভাবতে ভাবতে ঠন্‌ঠনে কালীমন্দিরের কাছে এসে পড়লাম। মন্দিরে তখন প্রভাতী মঙ্গল-আরতি হচ্ছিল। খেয়াল চাপল, মায়ের মন্দিরে একটা প্রণাম করে আসি। মা বিরাটদার কান্না শুনে পরি-পারুর বিয়ে ঘটিয়ে দিলেন, ইচ্ছে হলে আমার একটা চাকরিও যোগাড় করে দিতে পারেন। হয়তো তাতে আমার কোনও চেষ্টাই করতে হবে না। সেই জমিদার মনিবের মত কোনও বড় সাহেব, আমাকে রাস্তা হতে কুড়িয়ে নিয়ে একেবারে বড় অফিসের চেয়ারে বসিয়ে দিতেও পারেন। দৈবানুগ্রহে কি না হয়!

প্রণাম করে উঠে দেখি নরেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক দিন এদের কারও সাথে দেখা হয়নি। আমিও একেবারে সংসারে জড়িয়ে পড়ায় কোনও সংবাদ নিতে পারিনি। অল্প কথায় নরেন যা বললে, তাতে বুঝলাম পার্টির অবস্থা খারাপ। অহিংস কংগ্রেসী আন্দোলনের ফলে বিপ্লবীদলে নতুন ভাল ছেলে পাওয়া যাচ্ছে না। যা দু'চারজন পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাসঘাতক বলে প্রমাণ হয়েছে। তারপর দক্ষিণেশ্বর বোমার ঘটনায় দলের অনেকগুলি ভাল কর্মী ধরা পড়ে নিদারুণ আঘাত লেগেছে। যারা এখনও বাইরে আছে, তাদের ভাগ্যে কখন কি ঘটে বলা যায় না। দেশের জনসাধারণও আর পূর্বের মত সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি দেখায় না।

নরেনের সাথে গেলাম কালীঘাটে এক বাড়িতে। সেখানে দলের আরও চারজনের সাথে দেখা হল। তাদের মুখে শুনলাম, দক্ষিণেশ্বর বোমার আসামীরা আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আছে। কদিন হল তারা সংবাদ পাঠিয়েছে, হাতদেড়েক লম্বা একখানা লোহার ডাণ্ডা পেলে বোধহয় অনেকগুলি কর্মী বাঁচানো যেতে পারে।

চারদিন ঘোরাফেরা করার পর সেন্ট্রাল জেল হাসপাতালের ঝাড়ুদার নাথুয়ার সাথে দেখা হল। তাকে সমস্ত বুঝিয়ে বলতে সে তিন চারদিন সময় চাইল। তিনদিন পরে কালীঘাট ব্রীজের ওপরে দেখা করে জানাল—দেড়হাত লম্বা ডাণ্ডা পাঠান যাবে না, চব্বিশ ইঞ্চি পর্যন্ত পাঠান যাবে। বাবুদের ওয়ার্ডের মেথর তুলিয়া ডাণ্ডা পৌঁছে দেবে।

নাথুয়াই লোহার শিক কিনে নিয়ে গেল। লোহার ডাণ্ডা কি কাজে ব্যবহার হবে, তার কোনও আভাসই পাইনি। ধারণা ছিল যে, বোধহয় জেলখানার তালা ভাঙ্গতে ব্যবহার হবে। যাই হোক ডাণ্ডা ব্যবহারের স্বরূপটা জানার জন্যে কালীঘাটেই থেকে গেলাম। কদিন পরেই সংবদেপত্রে দেখলাম, আলীপুর সেন্ট্রাল জেলের মধ্যে গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তা রায়বাহাদুর ভূপেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী লোহার ডাণ্ডার আঘাতে নিহত হয়েছেন (১০ই মে, ১৯২৬)

সংবাদটা পড়ে দুঃখিত হলাম। তিন বছর পূর্বে আলীপুর জেলে তিনি আমাকে যে কথাগুলি বলেছিলেন, সেই কথার ভিতরে যেন বেশ কিছু বাস্তববোধসম্পন্ন দেশপ্রীতিও ছিল। যতই দিন যাচ্ছে ততই যেন তাঁর কথাগুলি কার্যত প্রমাণ হচ্ছে।

পরবর্তী অবস্থাটা বুঝার জন্যে আরও কদিন কালীঘাটে থেকে গেলাম। দুদিন পরে কালীঘাট বাজারে নাথুয়ার বউ-এর সাথে দেখা হল। সে আমাকে ইসারায় ডেকে নিয়ে ধর্মশালায় যেয়ে নির্জনে জানাল—বাবু, আমার মরদ আজ দুদিন দুবেলাই আপনার খোঁজে আমাকে বাজারে পাঠাচ্ছে। চ্যাটার্জী সাহেব খুন হওয়ার পর দুলিয়া পালিয়েছে। সে যদি ধরা পড়ে তবে হয়তো আমার মরদের নাম বলে দেবে। শেষ পর্যন্ত আমার মরদও আপনার পরিচয় গোপন রাখতে পারবে কিনা সন্দেহ। আপনি এখনই সতর্ক হন।

এই নাথুয়ার শেষ পরিণতি এখানেই বলে রাখি। দুলিয়া ধরা পড়ে নাথুয়ার নাম করে। নাথুয়া কিছু বলতে অস্বীকৃত হওয়ায় এলিসিয়াম রো-এর ধোবীখানায় পাঠান হয়। তারপর আর তার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। নাথুয়ার স্ত্রী প্রায় একমাস যাবৎ প্রতিদিন তার মরদের সংবাদ পাওয়ার আশায়, লালবাজারের রাজবাড়ির দরজায় বসে সকাল-সন্ধ্যা কাঁদত। তার সে কান্নায় পথের দুটো কুকুর এসে সম্মুখে বসে কাঁদত, কিন্তু লালবাজারের কর্তারা কোনও দিন তার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করেননি। কোনও সাহেবের গাড়ির কাছে গেলে সিপাইরা মারতে আসত। একমাস পরে হতাস হয়ে, সে দুটো ছেলেমেয়ের হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে হাওড়া স্টেশনে আসে। স্টেশনে এক রেলবাবু তার হাহাকার শুনে দয়া করে, হাওড়া স্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর মহিলাদের বিশ্রাম ঘরের ঝারুদারণীর চাকরি দেন।

১৯৩২ সালে মে মাসে ব্যাণ্ডেল স্টেশনে মেয়েদের বিশ্রাম ঘরের আয়া নাথুয়ার বউ-এর সাথে আমার দেখা হয়। সে আমাকে চিনে কাঁদতে লাগল। তারই মুখে শুনলাম নাথুয়ার শেষ পরিণতি। নাথুয়ার বউ ভাল মাইনে পায়। অনেকে তাকে বিয়ে করতে চায়।

সে বিয়ে করবে না। তার বিশ্বাস নাথুয়া বেঁচে আছে। দেশে স্বরাজ হলে নাথুয়া ফিরে আসবে। নাথুয়া তাকে খুব ভালবাসে, সে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে।

নাথুয়ার বউয়ের ব্যাকুলতা দেখে চোখের জল গোপন করে পালাতে হয়েছিল।

কালীঘাট বাজারে নাথুয়ার স্ত্রীর সতর্কবাণী শুনে সেদিন রাত্রেই নবদ্বীপ গেলাম। পরদিন বাজারে যেয়ে কিনলাম ছয় পয়সার গেরুয়া রং। একখানা বাঁশের দণ্ড যোগাড় করতে লাগল চার পয়সা। মাথা নেড়া করতে নাপিত নিল চার পয়সা—এই চোদ্দ পয়সা খরচ করে সেদিন শেষরাত্রে সন্ন্যাসী বনে গেলাম। ভাগ্যে আমাদের সন্ন্যাসী বাবুরা গেরুয়া লুঙ্গী ও গেরুয়া পাঞ্জাবীর প্রচলনটা বজায় রেখেছেন, নচেৎ অসুবিধায় পড়তে হত, হাতে টাকা ছিল না।

শেষরাত্রে বিদায় নিলাম। এ বিদায় যদিও নিমাই-সন্ন্যাসের বিদায় নয়, তথাপি যাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম তাদের সেই বিদায়ক্ষণের মুখচ্ছবি আজও মনে পড়ে।

চোদ্দ পয়সার সন্ন্যাসী

১৯২০ সালের জুলাই মাসে আমি প্রথম জানতে পারি, পুলিসের গুপ্তচর বিভাগ আমাকে একজন বিপ্লবী দলভুক্ত বলে ধরে নিয়েছে। চাকরি করতে গিয়ে চা-বাগানের সাহেব ম্যানেজারের মাথা ফাটিয়েছি, গোয়ালন্দে ষ্টীমার কোম্পানীর এজেন্ট ব্লাকমুর সাহেবকে কাদায় ফেলে মাড্মুর করেছি, জেলেদের পক্ষ নিয়ে জমিদারদের সাথে খুনোখুনি করেছি—এ সমস্ত যদিও আইনের চক্ষে অপরাধ কিন্তু গুপ্তচর বিভাগের গ্রাহ্য ব্যাপার নয়। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন গোয়ালন্দ মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এ্যালফ্রেড বোস সাহেবের বাংলোয়

বন্দুকের গুলি করে সেই আমপাড়ার বাহাদুরী। মহানন্দ ব্রহ্মচারীর সাথে ঘনিষ্ঠতা। তারপর দেখেছেন এলিসিয়াম রো-এর ধোবীখানার ধোলাইতে নির্বাক থাকা। কাজেই তাঁদের দৃষ্টি যে আমার উপরে আছে, তা দুই আর দুই-এ চারের মতই বুঝেছিলাম।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার আসামীদের ওয়ার্ডে পুলিসের ডেপুটি কমিশনার রায়বাহাদুর ভুপেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী খুন হওয়ার সংবাদ পেয়ে বুঝলাম, এবার আমার অবস্থা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠল। এতদিন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিপ্লবীদলের কোনও কাজই আমি করিনি। সেদিক হতে পুলিসে আমাকে কোর্টে উপস্থিত করে বিশেষ কিছু করতে পারবে না, এ বিশ্বাস আমার ছিল। কিন্তু এখন তো আর সে কথা ভাবা চলে না। বিশেষ করে নাথুয়ার বউ কালীঘাট বাজারে দেখা করে আমাকে সতর্ক করেছে। দুলিয়া পালিয়েই সর্বনাশ করেছে, সে ধরা পড়বেই। ধরা পড়ে নাথুয়ার নাম বলে দেবে। তারপর নাথুয়া এলিসিয়াম রো-এর ধোবীখানায় ধোলাই হলে আমার নাম প্রকাশ না করে পারবে না। ফল হবে এই—বিচারে নাথুয়া ও দুলিয়া পাঁচ-সাত বছর জেল খেটে বেঁচে যাবে, কিন্তু আমার বেলায় নির্ঘাৎ ফাঁসির দড়ি এগিয়ে আসবে। যে ডাণ্ডা মেরে খুন করেছে, আর যে ষড়যন্ত্র করে সেই ডাণ্ডা জেলের মধ্যে পাঠিয়েছে, তাদের দুজনের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হবে না।

শোনা যায় ক্ষুদিরাম, কানাই দত্ত প্রভৃতি বহু বিপ্লবী ফাঁসির রাত্রেও অঘোরে ঘুমিয়েছেন। ঘুম থেকে জাগিয়ে তাঁদের ফাঁসিকাঠে ঝুলানো হয়েছে। আমার অবস্থা কিন্তু অন্য প্রকার হল। আলিপুর জেলের খুনের সংবাদ শোনার পর বহু রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি পুলিস আমাকে ধরতে এসেছে, আমার বিচার হচ্ছে, আমাকে ফাঁসিতে ঝুলানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছে। স্বপ্ন দেখে ঘেমে স্নান করে উঠেছি।

বক্সা ডিটেনসন ক্যাম্পে কালীশঙ্কর দাদা প্রথম দিন আমাকে দেখেই বলেছিলেন—'আরে, তুমি না একেবারে ছেলেমানুষ! গো-

বেচারী! তুমি এ পথে এলে কি করে? এ পথ তো তোমার মত দুর্বল মানুষের জন্য নয়।' তাঁর সেই কথায় তখন মনে মনে বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। এখন আমার এই অবস্থার কথা পড়ে যদি কোনও পাঠক আমাকে ভীরু কাপুরুষ বলেন, তবে সে কথা আমি মেনে নেব। কিন্তু কোনও পাঠিকা যদি নিন্দা করেন, তবে তাঁর সাথে ঝগড়া বাধাব। কারণ আমার এই ভীরুতার হেতু তাঁদেরই একজন। যদিও সে কোনও দিন আমার কোনও কাজে বাধা দেয় না, ভালমন্দ কোনও সমালোচনাও করে না।

আমার এই কথায় হয়তো কোনও পাঠিকা মুচকি হেসে বলবেন—পথচারী মশাই, যদি আপনি মনে করে থাকেন আপনার ঐ চোদ্দ পয়সার সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে আপনাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, তবে আপনি নির্বোধ। আমাদের দেশে বহু ডাকাত, খুনে সন্ন্যাসী বা ফকির-বোষ্টম সেজে বেড়ায়, একথা পুলিসে ভাল করেই জানে। আপনাকে বাঁচিয়েছে আমাদেরই একজনের শাখা-সিঁদুর।

এ কথার উত্তরে আমার আর কিছু বলার নেই। সন্ন্যাসী সেজে অল্পদিনেই বুঝেছিলাম যে, এ প্রকারে আত্মগোপনের চেষ্টা একটা হাস্যকর ব্যাপার। তথাপি সেই হাস্যকর চোদ্দ পয়সার সন্ন্যাসীই সেজেছিলাম। ছয় পয়সার গেরুয়া রং, চার পয়সার মাথা ন্যাড়া, আর চার পয়সার একখানা বাঁশের আগা পুলিসের চোখে ধুলো দিতে না পারলেও এর মহিমা কিন্তু অপার। এই বেশ ধরে একটু বুদ্ধি খাটিয়ে চলতে পারলে সত্যিই মহারাজা হওয়া যায়। আমাদের ভারতে ইংরেজ আমলে রাজা মহারাজদের ইংরেজ রেসিডেন্ট সাহেবদের করে দারুণ ভয় ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর বল্লভভাই প্যাটেল এক কলমের খোঁচায় সমস্ত রাজা মহারাজদের গণেশ উল্টিয়ে দিলেন। কিন্তু এই সাধু-সন্ন্যাসী মহারাজদের গণেশ উল্টানোর ক্ষমতা কারও নেই। এমন কি ইনকমট্যাক্স অফিসাররাও এঁদের কথা মনের কোণেও স্থান দেন না।

পাঠক পাঠিকারা হয়তো ভাবছেন—এইবার আমিও তা হলে মহারাজ হয়ে যাব। না, তা আমি হতে পারিনি। যদি তা হতে পারতাম তবে আর এত দিন পরে এই বই লিখে আপনাদের পকেট বা ভ্যানিটি ব্যাগে হাত পোরবার জন্যে ব্যস্ত হতাম না। ভাগ্যে যদি না থাকে তবে কোনও ব্যবসায়েই বড়লোক হওয়া যায় না।

একটা গল্প আছে—এক রাজার রাজ-জ্যোতিষী একদিন রাজাকে বললেন যে, তাঁর সিংহদ্বারে যে ভিখারীটি ভিক্ষা করে, তার ভাগ্যে দিনান্তে সওয়া পাঁচ আনার বেশী প্রাপ্তিযোগ নেই।

কৌতূহলী রাজা জ্যোতিষীর কথা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে পর দিন প্রভাতে ভিখারীটাকে ডেকে এনে রাজভাণ্ডারে বসিয়ে দিয়ে বললেন যে, সেদিন সূর্যাস্তের মধ্যে যত ইচ্ছা ধন সে নিয়ে যেতে পারে।

ভিখারী রাজ-আদেশে পরমানন্দে ভাণ্ডারে প্রবেশ করল। তারপর সোনা-মোহরের বস্তা খুলে গুণে গুণে দেখল, মণিমুক্তা পরীক্ষা করল, পোষাক-পরিচ্ছদের কারুকার্য বিচার করল, এই প্রকারেই সারাটা দিন কেটে গেল। সূর্যাস্তের সময় দ্বরোয়ান এসে যখন ভিখারীটার হাত ধরে ভাণ্ডার হতে বের করে দিতে নিল, তখন হাতের কাছে একখানা নতুন গামছা ছিল, তাই হাতে করে সে রাজভাণ্ডার হতে বেরিয়ে গেল। গামছাখানার দাম সওয়া পাঁচ আনা।

আমার ভাগ্যও ঐ প্রকার। শাঁখা-সিঁদুরের মহিমা এ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখলেও অর্থভাগ্যে ও মহিমা কোনও কাজে লেগেছে মনে করার কোনও হেতু নেই।

এখন আমার আসল কথায় আসা যাক। ১৯২৬। ১৬ই মে, শেষ রাত্রে সন্ন্যাসী সেজে শাঁখা-সিঁদুরের কাছে বিদায় নিয়ে নবদ্বীপধাম স্টেশনে হাওড়ার গাড়ি ধরলাম। প্রাতে সাড়ে ছটায় হাওড়া নেমে সোজা চলে গেলাম ব্রীজের তলায় গঙ্গার ঘাটে। সেকালে ঐ জায়গাটায় বহু উড়িয়া ব্রাহ্মণ থাকত। কলকাতার রাঁধুনী, পুরোহিত, চাকর প্রভৃতি ঐ উড়িয়া ডিপো হতেই সরবরাহ হত। আমার ধারণা উড়িয়ারা আর যাই করুক না কেন খুন-ডাকাতি করতে ভয়

পায়। সেজন্য খুনী বা ডাকাত খুঁজতে পুলিস উড়েদের আড্ডায় যায় না।

ঘাটে গিয়ে ভাগ্যক্রমে একটা খালি ঘর পেয়ে গেলাম। ঘরটার মালিক বোধহয় দেশে গিয়েছিল। রাত্রে যারা থাকে, তারাও কাজে গিয়েছে। আমি তাদের পরিত্যক্ত খাটিয়ার ওপরে একেবারে শুয়ে পড়লাম।

কদিন ধরে একটা দারুণ দুশ্চিন্তা চলছে। সে চিন্তায় কেবল এই সিদ্ধান্ত করেছি—সন্ন্যাসী সেজে ফেরার হতে হবে। ফেরারী হয়ে আত্মগোপন করে কোথায় যেয়ে থাকব, সে চিন্তা মনে জাগেনি। সেদিন গঙ্গার ঘাটে খাটিয়ায় শুয়ে প্রথমেই মনে জাগল, এর পর কোথায় যাব? সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে যদি আমাকে বাঁচায়, তথাপি পেট চলবে কি করে? নবদ্বীপ বাসা হতে দু'টাকা নিয়ে বেরিয়েছি।

সে দু'টাকা থেকে এক টাকা ছ'পয়সা রেলভাড়ায় গিয়েছে, বাকী সাড়ে চোদ্দ আনা আছে। এ দিয়ে কদিন চলবে?

এই সব ভাবছি এমন সময় পাশের ঘর থেকে কানে এল, একজন আর একজনকে চাপাগলায় ধমক দিয়ে হিন্দুস্থানী বাংলায় বলছে —জান, তোমাদের ধরিয়ে দিলে পাঁচশ টাকা জরিমানা আর ছমাস জেল হতে পারে।

কথা কানে আসতেই আমার চিন্তা ভুলে গেলাম। বাঁশের চাটাই-এর বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখলাম একজন পুলিস কনষ্টেবল আর পাঁচ-জনকে ধমকাচ্ছে। ঐ পাঁচজনের দুজন মুসলমান কসাই, আর তিনজন গরু-মোষের খাটালের মালিক হিন্দু।

ধমকানোর হেতুটা শুনলাম। খাটালের মালিক তাদের গরু-মোষ বাচ্চা দিলে সেই সদ্যপ্রসূত বাচ্চাগুলো রাত্রে ঘোড়ার গাড়িতে তুলে এনে এই ঘাটে কসাইদের কাছে বিক্রী করে। সাহেবদের হোটেলে এই সব বাছুরের মাংস অত্যন্ত মূল্যবান খাদ্য। এই মাংসের ইংরেজী নাম 'ভীল'। আগের রাত্রে বারোটা বাছুর খাটালওয়ালারা কসাইদের কাছে বিক্রী করেছে। টাকার আদান প্রদান রাত্রে শেষ

হয়নি, তাই এখন আবার তারা একত্র হয়েছে। এই কেনাবেচায় পুলিসে প্রতি বাছুরে খাটালপক্ষ হতে এক টাকা আর কসাইপক্ষ হতে এক টাকা পায়। রাত্রে বারোটা বাছুরের জন্য কুড়ি টাকা দেওয়া হয়েছে। বাকী চারটাকা এখন আর দিতে চাচ্ছে না। তারই জন্য হিন্দুস্থানী হিন্দু কনষ্টেবলের এত তর্জন।

ঘটনাটা শুনে মনে চিন্তা এল, মুসলমানদের গো-কোরবানী নিয়ে প্রতি বছরে কতই না দাঙ্গা-হাঙ্গামা খুনোখুনী হয়! এই যে ব্যাপারটা শুনলাম তাতে ঐ গোমাতার ভক্ত হিন্দু কজন বেশী অপরাধী, না ঐ মুসলমান কসাইগুলো বেশী অপরাধী?

এই ঘটনার অনেক বছর পরে একবার কলকাতা নারকেলডাঙ্গার বস্তী অঞ্চলে এক বাড়িতে কিছুদিন ছিলাম। ঐ বাড়ির আসেপাশে অনেকগুলো খাটাল ছিল। খাটালে কোনও গাই বা মোষের বাছুর নেই। একটা মরা বাছুরের চামড়া দিয়ে নকল বাছুর তৈরী করা আছে। গাই দোহানর সময় ঐ নকল বাছুরটার গায়ে একটু ঝোলাগুড় মাখিয়ে গাইয়ের সম্মুখে দেওয়া হয়। গাইটা ঐ মরা বাছুরটা চাটতে থাকে আর ওদিকে গাই দোহানো হয়।

সন্ধ্যাবেলা হাওড়া ব্রীজের ওপরে দাঁড়িয়ে দেখা যায় হিন্দুস্থানী গোয়ালারা দলে দলে গাই নিয়ে হাওড়ার ওদিক থেকে কলকাতা আসে, আবার রাত্রে ফিরে যায়। এই সমস্ত গাইয়ের সাথে বাছুর থাকে। বাছুরগুলোর মুখ টোনা এঁটে বন্ধ করা। না খেয়ে খেয়ে বাছুরগুলোর চামড়া ঢাকা হাড়ের মধ্যে প্রাণটুকু কোনও প্রকারে ধুক্ ধুক্ করছে। এই সমস্ত গাইয়ের টাটকা খাঁটি দুধ বড়বাজারের গো-রক্ষা সমিতির মাননীয় সভ্য ও চাঁদা দাতাদের সেবায় লাগে, সত্যনারায়ণ ঠাকুরের সিরনী মাখাও হয়। আমাদের সুযোগ্য কর্তৃপক্ষ দেশের দুগ্ধ-সম্পদ গো-সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে বিরাট বিরাট পরিকল্পনা প্রস্তুত করে মহাধিকরণের আলমারি, র‍্যাক বস্তা বস্তা তথ্যপূর্ণ দলিলে ভরে দিচ্ছেন। কিন্তু এই সমস্ত দিকে কি পরিমাণে গো-সম্পদ অপচয় হচ্ছে, সে বিষয়ে বোধ হয় ছুঁচোর মত কানা।

সে দিন গঙ্গারঘাটে মুসলমান কসাই আর হিন্দু গোয়ালাদের আলোচনা শুনে মন আরও খারাপ হয়ে গেল। কি করব কিছুই স্থির নেই। চারিদিকেই যেন একটা বিশ্রী ব্যাপার চলছে। বেলা প্রায় দশটা হল। হাওড়া ব্রীজের ওপরে যেমন ভিড় তেমনি শব্দ বেড়েছে। দরিদ্র কেরানীর দল ছুটেছে অফিসে। দেখে আমারও স্নান-আহারের কথা মনে পড়ল।

যে ঘরে বসেছিলাম তার নীচেই গঙ্গা। গায়ের জামাটা খুলে খাটিয়ার ওপরে রেখে নেমে গেলাম গঙ্গায়। স্নান করে ওপরে উঠে কাপড় ছাড়তে যেয়ে দেখি ভিজে কাপড়টায় বেধে উঠে এসেছে একদলা 'নরবর'। গঙ্গাস্নানের সব শুচিতা এক মুহূর্তে উবে গেল।

গ্রামোফোন রেকর্ডে গান শুনেছিলাম—

রাবণ আসিল যুদ্ধে পরে বুট জুতো।
হনুমান মারে তারে লাথি চড় গুঁতো।
রাম নামের কি বা মহিমে॥

রাবণ জন্মান্তরে ছিলেন বৈকুণ্ঠ-পার্ষদ। ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে রাক্ষসকুলে জন্ম নিয়ে হনুমানের লাথি চড় গুঁতো খেয়েছেন। গঙ্গাদেবী কার অভিসম্পাতে আমাদের মধ্যে এসে, আমাদের দুষ্কর্মের বোঝা মাথায় করে বয়ে চলেছেন ?

আবার যেয়ে স্নান করলাম। এবার যাতে মা গঙ্গা আমাকে অপবিত্র না করেন তার জন্য তাঁর দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখেছিলাম। স্নান করে উঠে এসে কাপড় পরতে যেয়ে দেখি সেই কাপড়ের এক কোণে বাঁধা আছে বিয়াল্লিশটা তামার পয়সা আর তেরটা আধলা। বুঝলাম এ সেই নবদ্বীপে ছেড়ে আসা শাঁখা-সিঁদুরের সযত্নে লুকনো সমগ্র গুপ্তধন। গুপ্তধন আবার গোপনেই বেঁধে রাখলাম। স্থির করলাম ও সম্পদ আর খরচ করব না। কিন্তু তা আর হল না।

নবদ্বীপ হতে দু'টাকা সম্বল নিয়ে বেরিয়েছিলাম। সে দু'টাকা থেকে এক টাকা ছ'পয়সা রেলভাড়া গিয়েছে। আসাম বড়পেটা রোড হতে বিনা টিকিটে পাংসা পেঁৗছেছি। পথে মাত্র গোটা চারেক সিকি

কাজে লাগাতে হয়েছিল। এখন কিন্তু নবদ্বীপ হতে হাওড়ার এইটুকু পথ বিনা টিকিটে চলতে সাহস নেই, যদি ধরে পুলিসে দেয়। টিকিট খরচ বাদে জামার পকেটে ছিল সাড়ে চোদ্দ আনা।

স্নান হয়েছে, এখন কিছু খাওয়ার চাই। জামাটা গায় দিতে নিয়ে দেখি পকেট ফাঁক। সাড়ে চোদ্দ আনা উধাও হয়েছে। বসে ভাবছি। হঠাৎ একটা চিৎকার কানে এল—হে প্রভু জগড়নাথ, তু আমারো কি করিলি।

ভিজে কাপড়ের পোঁটলা বগলে করে দেখতে গেলাম 'জগড়নাথ' প্রভু কার কি সর্বনাশ করলেন।

একটা উড়েকে ঘিরে দশ বারজন উড়ে জটলা করছে। জটলার উপলক্ষটি সেই দিনই সকাল সাতটায় হাওড়ায় পৌঁছিয়েছে। একেবারে আনকোরা নতুন লোক। সাথের পোঁটলায় ছিল সাত টাকা আর একখানা নতুন গামছা। আমার পকেটের সাড়ে চোদ্দ আনার মত এরও সাত টাকা আর নতুন গামছা উধাও হয়েছে। আমার জামা-কাপড় যে উধাও হয়নি তার কারণ উধাও হয়ে আর কারও গায়ে ওঠার যোগ্যতা ওরা প্রায় হারিয়ে ফেলেছিল।

দেখলাম ঘাটের উড়ে ঠাকুরেরা কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটার ব্যবস্থা করল। যত দিন তার চাকরি না জুটবে ততদিন ঘাটের ঠাকুরদের আশ্রয়েই সে থাকবে, চাকরিও তাঁরাই খুঁজে দেবেন। সান্ত্বনা পেয়ে লোকটা জয় প্রভু জগড়নাথ বলতে বলতে ব্রাহ্মণদের সাথে চলে গেলে। আমার মনে বিদ্যুৎ চমকের মত খেলে গেল—আমিও প্রভু জগন্নাথের শ্রীচরণে যাই না কেন?

হাওড়া স্টেশনে বাইরের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম বারোটা বেজেছে। সাড়ে বারোটায় পুরী প্যাসেঞ্জার ছাড়ে। তাড়াতাড়ি সেই গুপ্তধন থেকে চার পয়সা বের করে কিনলাম তিন পয়সায় এক পোয়া চিড়ে, আর এক পয়সায় এক ছটাক বাতাসা। চিড়ে বাতাসার ঠোঙা হাতে করে গাড়িতে চেপে বসলাম। যখন টাকা নেই, তখন টিকিটের বালাইও নেই। জয় প্রভু জগন্নাথ।

যে গাড়িতে উঠলাম তাতে বেশী লোক ছিল না। গাড়ি ছাড়লে চিড়ে বাতাসার ঠোঙা খুলে খেতে আরম্ভ করলাম। শুকনো চিড়ে দু'চার মুঠ খেতেই এক উড়িয়া ভদ্রলোক এগিয়ে এসে সবিনয়ে বললেন—আপনার বোধ হয় আজ এ পর্যন্ত কিছু ভোজন হয়নি। আমার সাথে প্রচুর খাবার আছে। দয়া করে যদি কিছু গ্রহণ করেন তবে কৃতার্থ হব।

আমি নতুন জামাইএর মত দু-একবার না, না, করে তারপর পেট ভরে লুচি, তরকারি. হালুয়া, জিলেপি, ভোজ খেয়ে নিলাম। রাত্রে আর খাওয়ার প্রয়োজন হল না। চার পয়সার চিড়ে বাতাসা সম্বল থেকে গেল।

পরদিন প্রাতে পুরী পৌঁছে উঠলাম যেয়ে গোয়েঙ্কা ধর্মশালায়। বড় রাস্তার ওপরে বিরাট ধর্মশালা। ধর্মশালার সদর দরজা তখনও খোলা হয়নি। বাইরে বারান্দায় আমার ছেঁড়া কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। পর পর দু'রাত ঘুম হয়নি। গাড়িতে যদিও ভিড় ছিল না, তথাপি ছারপোকার আবদার অগ্রাহ্য করে ঘুমনোর মত পুরু চামড়া আমার গায়ে নেই।

কেবল একটু ঘুমনোর যোগাড় করেছি, এমন সময় ধর্মশালার ম্যানেজার এসে নমস্কার জানিয়ে কাছে বসে জানতে চাইলেন—কোথা থেকে আসছি, কোন্ মঠের সন্ন্যাসী, কোন্ মঠে বা আশ্রমে থাকি, নিজস্ব মঠ-আশ্রম আছে কিনা, পুরীতে কোনও পরিচয় আছে কিনা, এখানে যদি কিছুদিন থাকি ; তবে আমার কি কি দ্রব্য প্রয়োজন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ম্যানেজারের প্রশ্নের বহর দেখে মনে মনে চটে গেলাম। তখন যা মুখে যোগাল তাই উত্তর দিলাম। আমার কিছু লাগবে কিনা—এ প্রশ্নের উত্তরে বললাম—আমার কি লাগবে না লাগবে তা আমি জানিনে। যখন যা প্রয়োজন হয় তখন তা পেয়ে যাই, এই জানি। এখন একটা ভাল ঘুমের প্রয়োজন, কারণ দু'রাত ঘুমইনি। অতএব আপনি আপনার কাজে গেলেই সুখী হব।

আমার কথা শুনে ম্যানেজার গম্ভীর মুখে উঠে গেলেন, আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম।

সন্ন্যাসীর বিপদ

যখন ঘুম ভাঙল তখন বেলা প্রায় দশটা। ঘুম ভেঙে প্রথমেই দেখলাম আমার পোঁটলাটা নেই। একখানা ধুতি দুখানা করে বহির্বাস করেছিলাম। একখানা পরেছি, আর একখানা পোঁটলায় ছিল। চার পয়সার চিড়ে বাতাসাও ছিল। সব উধাও হয়েছে। এদিক-ওদিক তাকাতেই চোখে পড়ল, রাস্তার ওপাশে বাড়ির ছাদের ওপরে কয়েকটা বানর, আমার গেরুয়া বহির্বাস নিয়ে বউ বউ খেলা করছে। চিড়ে-বাতাসার জন্য দুঃখ নেই, তখনও পয়সা আধলায় মিলিয়ে এগার আনা সাথে আছে। কিন্তু দ্বিতীয় বস্ত্রের যোগাড় কি করে হবে? বসে ভাবছি। এমন সময় একজন এসে জানাল—ম্যানেজার আমাকে ভিতরে যেতে অনুরোধ করছেন।

গেলাম ভিতরে। ম্যানেজার ইঁদারার ধারে স্নান করছিলেন। আমাকে দেখে বললেন—আপনাকে আরও ক'বার খোঁজ করেছি। আপনি গভীর ঘুম ঘুমচ্ছিলেন। আপনার কাপড়ের পুঁটুলি বানরে নিয়ে গেছে। এখানে ভয়ানক বানরের উপদ্রব। আপনার জন্যে দোতলার কোণের ঘর ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছি। ঘরে আপাতত প্রয়োজনীয় সব দেওয়া হয়েছে। নতুন বহির্বাস রং করে শুকোতে দিয়েছি। জামাটা বিকেলে পাওয়া যাবে। আপনি এখন স্নান করুন। প্রসাদ শীঘ্রই আসবে। আপনার ঘরে যেয়ে কাপড়-জামা ছাড়ুন।

ম্যানেজারের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে ইতস্তত করছি দেখে তিনি বললেন—আপনি কোনও সঙ্কোচ করবেন না। আপনাদের মত নিষ্কিঞ্চন সাধু মহাত্মাদের সেবার জন্য এই ধর্মশালার প্রতিষ্ঠাতা বহু অর্থ জমা রেখেছেন। সেই টাকা হতেই এ খরচ হচ্ছে। আমি গরীব চাকর, আপনার সেবা করার সৌভাগ্য আমার নেই।

আমি বললাম—আমি তো মহাপুরুষ-মহাত্মা নই, একটা ভবঘুরে সন্ন্যাসী। আমার জন্যে এ ব্যয় অপব্যয় হবে মাত্র।

ম্যানেজার গম্ভীর হয়ে বললেন—আপনি কি প্রকার সাধু, তা বিচার করার ভার আমার, আপনার নয়। সাধুসন্ন্যাসী এলেই যে, ঐ ফাণ্ডের টাকা খরচ করে সেবা করা হয়, তাও নয়। এখন বেলা অনেক হয়েছে, দয়া করে আপনার ঘরে যেয়ে স্নানের ব্যবস্থা করুন। আপনি প্রসাদ গ্রহণ না করলে, আমরাও কিছু খেতে পারছিনে। আজ আর সমুদ্র-স্নানে যাবেন না, চাকরে জল তুলে দিচ্ছে, এখানেই স্নান করুন।

আর কথা বাড়ালাম না। চাকর ঘর দেখিয়ে তালা খুলে দিল। দেখলাম একখানা চৌকির ওপরে কম্বল বিছিয়ে তার ওপরে চাদর পেতে বিছানা করা হয়েছে। একটা মশারিও খাটানো হয়েছে। সব নতুন। একটু পরে চাকরটা দু'খানা বহির্বাস, একখানা গামছা আর একজোড়া হরিণের চামড়ার জুতো এনে দিল। জলভরা তামার কলসী, দুটো ছোট বড় তামার লোটাও আছে। সাধুসেবার আয়োজন দেখে চমৎকৃত হলাম।

স্নান করে আসতেই প্রসাদ এসে গেল—অন্ন, ডাল, তরকারি, তার সাথে চারখানা মালপুয়া, গজা, লাড্ডু ইত্যাদি। সমস্তই শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ। প্রসাদের সাথে ম্যানেজারও আমার খাওয়ার তদ্বির করতে এলেন।

প্রসাদের মধ্যে মালপুয়া দেখে আমার ক্ষুধা উড়ে গেল। কিছুদিন পূর্বে নবদ্বীপে একদিন বিকালে আমার চার বছরের ছেলেটাকে সাথে নিয়ে বাজারে যাই। এক দোকানে মালপুয়া ভাজা হচ্ছিল। ছেলেটা একখানা মালপুয়া খেতে চায়, পয়সার অভাবে কিনে দিতে পারিনি। কাঁদতে আরম্ভ করলে একটা চড় মারি। মার খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাসায় এসে, কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়ল। রাত্রে উঠে আর কিছু খেল না। দুপুর রাত্রে জেগে দেখলাম, তার মা বিষণ্ণ মুখে ছেলের শিয়রে বসে আছে। মাত্র চার পয়সার একখানা মালপুয়া! কিছুই বললাম না। বলারও কিছু ছিল না। মাত্র চারটি পয়সা!

সমস্ত দৃশ্যটা যেন চোখের ওপরে ভাসতে লাগল। অন্ন, ডাল,

তরকারি খেলাম। মিষ্টান্নে হাত দিচ্ছিনে দেখে ম্যানেজার সেগুলি খেতে অনুরোধ করলেন।

আমি বললাম—আমি সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর পক্ষে মিষ্টান্নাদি মূল্যবান উৎকৃষ্ট খাদ্য খাওয়া শাস্ত্রের নিষেধ আছে।

ম্যানেজার বললেন—অনেক বড় বড় সাধু সন্ন্যাসী তো খান দেখেছি!

আমি একটু বিরক্ত হয়েই বললাম—কে খায়, আর কে খায় না—তা নিয়ে আমার কোনও মাথা ব্যথা নেই। আমি সন্ন্যাসী, খাইনে—এইটে জেনে রাখুন। আপনি আমার জন্য অনর্থক অর্থের অপব্যয় করবেন না। ঐ কম্বল, চাদর, মশারি, জুতো, সব নিয়ে যান। জামা একটা আমার আছে, এতেই চলবে, নতুন জামা আর আনবেন না। আমার সাথের কম্বলেই বিছানার কাজ চলে যাচ্ছে। নতুন বহির্বাস একখানা হলেই আমার চলবে। আর সব আপনি নিয়ে যান।

আমার কথায় ম্যানেজার অতিশয় কাতর হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত বহির্বাস দুখানা, একটা নতুন জামা, জুতো আর মশারিটা রাখতে হল। শেষে দেখলাম মশারি আর জুতো সত্যই প্রয়োজন। বাঙালী সন্ন্যাসী চেষ্টা করলে অনেক কিছুই ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু মশারি আর জুতো ত্যাগ করা বোধহয় সম্ভব নয়। কারণ—বাঙালীর চামড়া একেবারেই সন্ন্যাসের অনুপযুক্ত।

গোয়েঙ্কা ধর্মশালায় থাকি। ভোরে উঠে হাত মুখ ধুয়ে সমুদ্রতীরে বেড়াতে যাই। সাতটা বাজতেই শ্রীজগন্নাথ দর্শন করে এসে স্নান করে কিছু খেয়ে, ঘরের দরজা বন্ধ করি। বেলা বারটায় প্রসাদ এলে দরজা খুলে প্রসাদ পাই। প্রসাদ পেয়েই আবার দরজা বন্ধ করি। দুটো বাজলে একটু বেড়াতে সমুদ্রতীরে যাই। মন্দিরে আরতি দেখে এসে কিছু খেয়ে রাত্রি ন'টার মধ্যেই ঘরের দরজা বন্ধ করি। এই ভাবে কিছুদিন বেশ নির্বিবাদে কেটে গেল

ফেরারী আসামী কি প্রকারে আত্মগোপন করে বেড়ায়, সে বিষয়ে তখন আমার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। কারও কাছে উপদেশও পাইনি। আমার নিজের বুদ্ধিমত চেষ্টা করেছিলাম মাত্র।

ঐ প্রকার চেষ্টা যে মারাত্মক ভুল, তা অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বুঝলাম

আমার কথাবার্তা চালচলন দেখে দ্বারভাঙ্গা জেলার অধিবাসী ব্রাহ্মণ ম্যানেজার বুঝে নিলেন—আমি একজন দরের মহাত্মা যোগীপুরুষ। সারা দিনরাত ঘরে দরজা বন্ধ করে যোগ সাধনা করি। ফলে তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা উথলে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। রাত্রি আটটায় মহাত্মা দর্শন করে কৃতার্থ হওয়ার জন্যে ভক্তসমাগম আরম্ভ হল। ক্রমে ভক্তিমতীরাও আসতে আরম্ভ করলেন। তারা সাথে আনেন সাধুসেবার জন্য নানাপ্রকার ফল। ক্রমে ফলের আমদানী এতই হতে লাগল যে, ইচ্ছে করলে আমি দিব্বি 'ফলাহারীবাবা' বনে যেতে পারতাম। ক্ষীর, সর, ননী, সন্দেশ এসব আসত না। বোধহয় ম্যানেজার প্রচার করেছেন—আমি একজন কঠোর সংযমী সন্ন্যাসী। নচেৎ যা হত, তাতে বুঝলাম, এমনি করেই সাধুবাবারা এক একজন ভোজন বিলাসী ভীমসেন হয়ে ওঠেন।

এ নিয়ে ম্যানেজারকে অনুযোগ জানালাম, বিরক্তি প্রকাশ করলাম, একদিন তীব্র তিরস্কার করলাম, ফল হল বিপরীত। যতই আমি দর্শনার্থী তাড়াতে চাই, ততই তারা সংখ্যায় বাড়ে। যতই আমি তাদের দেওয়া সেবার দ্রব্য অবজ্ঞা করে ছুঁড়ে ফেলি, ততই তারা বেশী মূল্যের আনে। যা আনে, তা আমার ঘরের সম্মুখে সাজিয়ে রেখে হাতজোড় করে বসে থাকে।

পথে বেরুলে প্রণামের ঠেলায় দশ মিনিটের পথ আধঘণ্টায় চলতে হয়। তারপর পথে আর এক উপদ্রব দেখা দিল, আমার মুখে শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ গুঁজে দেবার জন্যে অজস্র প্রসারিত হাত। শ্রীমন্দিরে এ উপদ্রবটা আরও বেশী।

ধর্মশালায় যাঁরা দর্শন করতে আসেন, তাঁদের একটা বিশেষ গুণ এই যে, তাঁরা আমার পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামান না। সমুদ্রতীরে কিন্তু এ নিয়ে বিপদ দেখা দিল। পুরীর সমুদ্রতীরে সকাল-সন্ধ্যায় বাঙালীই বেশী। প্রতিদিনই নতুন পরিচয় প্রার্থীর

প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। পুরুষ মহল—আমার বিদ্যা বুদ্ধির দৌড়, কি অবস্থার ঘরের ছেলে, কি জাত ইত্যাদি জানতে সচেষ্ট। মহিলারা সোজাসুজি—কেন আমি এই বয়সে সন্ন্যাসী হয়েছি, ঘরে মা বাপ আছে কিনা, এই সব জানতে চান। উত্তরে যা মুখে আসে তাই বলি। মিথ্যে কথার বড় অসুবিধে হচ্ছে এই যে, মিথ্যেবাদী নিজেই মনে রাখতে পারে না সে কোথায় কি বলেছে। সেইজন্য মাঝে মাঝে ধরা পড়ে যাই।

আরও একটা উপদ্রব আমার স্বভাব-দোষেই জমে উঠল। সমুদ্র-তীরে এক ঝাঁক বোনের সন্ন্যাসীদাদা হয়ে গেলাম। আমি উপস্থিত হলেই তারা এসে চারদিকে দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করে বসতে বাধ্য করে। তাদের শোনাতে হবে পৌরাণিক মজার গল্প, দেশ-বিদেশের কথা ও কাহিনী।

পৌরাণিক কাহিনীর কথা যখন উঠল, তখন একটা কাহিনী লিখি—

প্রাচীনকালে উত্তর ভারতে ঋষভদেব নামে এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাট ছিলেন। তাঁর দণ্ডের গুঁতোয় কিছুকালের মধ্যেই রাজ্যে দণ্ড দেবার মত আর একটা অধার্মিকও থাকল না। মহাধার্মিক রাজা হয়ে পড়লেন একদম বেকার। এ প্রকার বেকার হয়ে ধার্মিক মানুষ আর কতদিন বাড়ি বসে থাকতে পারেন? তাই অনেক ভেবে-চিন্তে স্থির করলেন—আমার রাজ্যে তো সকলেই ধার্মিক হয়েছে; এইবার পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির ধর্মহীন অধম মানবকুলকে পবিত্র ধর্মের আলো দেখাতে হবে।

ঢাল-তলোয়ার হাতে ঘোড়ায় চড়ে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বিধর্মী বা অধর্মীর রাজ্য আক্রমণ, লুণ্ঠন, নারীধর্ষণ, অগ্নিদাহন, প্রভৃতি আশু ফলপ্রদ ধর্মপ্রচারের কৌশলগুলি বোধহয় সেকালে অজ্ঞাত ছিল, অথবা সভ্যতা ও রুচির বাধক ছিল। সেজন্য ঋষভদেবের মনে ও প্রকার উপায়ের কথা স্থান পায়নি। টাকার তোড়া ও মদের বোতলের সাহায্যও তিনি গ্রহণ করেননি। তিনি ভেবে-চিন্তে এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করলেন।

আজকাল যেমন বিভিন্ন অর্থকরী ধর্ম প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক প্রতীকচিহ্ন ও ঝাণ্ডা দেখা যায়, রাজা ঋষভদেবও ঐ প্রকার বেদোক্ত 'সত্যম্, শিবম, সুন্দরম্'-এর প্রতীক বাঁশ, বেল আর আমলকীর তিনখানা ডাণ্ডায় গেরুয়া কাপড় জড়িয়ে ঝাণ্ডা তৈরি করলেন। রাজবেশ ত্যাগ করে পরলেন গেরুয়া লুঙ্গি আর আলখাল্লা। পাগড়ী ও গান্ধীটুপির সন্ধান পুরাণে মেলে না। সন্ন্যাসীর জন্যে পাগড়ী বোধহয় হালে আমেরিকার চিকাগো সহর থেকে আমদানী। আর গান্ধীটুপি ? ও তো নামেই পরিচয়।

তারপর সেজেগুজে ঝাণ্ডা ঘাড়ে নিয়ে সম্রাট গেলেন প্রথম দক্ষিণ ভারত উদ্ধার করতে। সারা-দক্ষিণ ভারতে পড়ে গেল একটা বিপুল সাড়া। দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাট ঋষভদেব এসেছেন ধর্মপ্রচার করতে! অতএব যেখানেই তিনি যান, সেখানেই রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, বালক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ, সকলেই তাঁর অভ্যর্থনার বিরাট আয়োজন করে। আর সেই সাথে তাঁর মহিমা সম্পর্কে নানাপ্রকার আজগুবী অলৌকিক গল্প মুখে মুখে প্রচার হতে লাগল। ঋষভদেবের অঙ্গগন্ধের তো কথাই নেই, তাঁর পরিত্যক্ত বিষ্ঠার সুগন্ধেই যোজনপথ, অর্থাৎ চার ক্রোশ পথ আমোদিত করে। এমনি কত কি।

অল্পদিনের মধ্যেই সে দেশের রাজারাজড়া-ধনী-বড়লোকদের বিলাসী পুত্রেরা, গেরুয়াপরা ধর্মপ্রচারক ঋষভদেবের সুখ-সম্মান-সৌভাগ্যের ঘটা দেখে, পরস্পর বলাবলি করতে লাগল—হ্যাঁ, এ সংসারে সুখ ভোগ করতে হলে ঋষভদেবের উদ্ভাবিত পন্থাই সর্বোৎকৃষ্ট। আমাদের রথ টানে ঘোড়ায়। সে ঘোড়ার দানাপানি যোগাতে হয়, ডলাই-মলাই করতে হয়, কত রকম তোয়াজ করতে হয়। তা সত্ত্বেও রথ টানার সময় প্রায়ই অবাধ্য হয়ে লাথি ঝাড়ে। আর ঋষভদেবের রথ টানে মানুষে। সে সব মানুষ রথের দড়ি ধরতে না পেলেই দুঃখিত হয়। আমাদের সেবা করে দাসদাসীতে। সে সব দাসদাসী বেতন নিয়েও কাজে ফাঁকি দেয়। আর ঋষভদেবের সেবা করে সকলে স্বেচ্ছায়। তারা সেবার সুযোগ না পেলেই দুঃখিত

হয়। একটা সুন্দরীকে কাছে আনতে আমাদের কত জল সেচতে হয়। আর ঋষভদেবের নিকটে যাওয়ার জন্যে সুন্দরী যুবতীদল হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দেয় ইত্যাদি।

অতএব নিখরচায় ভাল স্ফুর্তি করার জন্যে বহু রাজনন্দন, ধনীর দুলাল তাদের ব্যয় বহুল বিলাস-নিকুঞ্জ অর্থাৎ বাগান বাড়ি ত্যাগ করে গেরুয়া পরে, তিনখানা ঠ্যাঙ্গায় গেরুয়া জড়িয়ে কাঁধে নিয়ে, এক শুভ দিনে উপস্থিত হল গেরুয়া ও ত্রিদণ্ডধারী ধর্মপ্রচারক ঋষভ-দেবের সম্মুখে। তাদের শিষ্য করে এই ধর্ম প্রচারের ছলাকলা কৌশল যাকে বলে ইংরেজীতে tricks and tactics, সমস্ত শিখিয়ে ধর্ম-প্রচারক প্রস্তুত করে দিতে হবে।

দেখে শুনে ঋষভদেবের তো চক্ষু স্থির। সম্রাট করতে এলেন কি, আর এ হল কি! তিনি দাক্ষিণাত্য হতে পালাতে চেষ্টা করলেন। শিষ্যত্ব প্রার্থীরা সাথে চলল। উড়িষ্যার কুটকাচল পাহাড়ে এসে মুখে পাথরপুরে বোবা সাজলেন। তাতেও কোনও সুবিধে হল না, গেরুয়া ডাণ্ডার দল সাথেই থাকল। মধ্য ভারতের গভীর অরণ্যে মাথা দিলেন। কৃপা প্রার্থীরা সেই বনেই পিছনে চলল। শেষ পর্যন্ত দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দাবাগ্নিতে প্রবেশ করে রেহাই পেলেন। সম্রাট ঋষভদেব সাধু সেজে ধর্মপ্রচার করতে যেয়ে শিষ্য ও শিষ্যত্ব প্রার্থীদের সভক্তি আক্রমণের গুঁতোয় শেষ পর্যন্ত নিজের দেহ আগুনে বিসর্জন দিয়ে এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন।

ঋষভদেব ছিলেন সম্রাট, অতএব টাকা পয়সার অভাব ছিল না। তারপর তাঁর উদ্দেশ্যটাও ছিল সৎ। কাজেই তাঁর মাথায় এতবড় ব্যবসার সুযোগ গ্রহণের কথা মোটেই স্থান পায়নি। পুরীর ব্যাপার দেখে, আমার মনে কিন্তু মাঝে মাঝে এ ব্যবসাটা করার ইচ্ছে জাগত। কিন্তু কি করব, পিছনে যে পুলিস ওয়ারেন্ট আছে। জেল ফাঁসের ভয় ততটা করিনে, ভয় করি এলিসিয়াম রো-এর ধোবীখানার। কাজেই দুশ্চিন্তায় পড়লাম।

প্রতিদিনই দেখি সমুদ্রতীরে এক ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী ও বিশ

বাইশ বছরের একটি মেয়ে একখানা বেঞ্চে বসে থাকেন। প্রথম দিকে তাঁরা আমার প্রতি উদাসীন ছিলেন। দিন সাতেক বাদে ডেকে কাছে বসিয়ে একটু বেশী রকম ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ করলেন। শেষে একদিন ভদ্রমহিলা প্রস্তাব করলেন—আমি যদি তাঁদের সাথে কলকাতা যেয়ে এ সমস্ত গেরুয়া-ফেরুয়া ফেলে দিয়ে গৃহী হই, তবে তাঁরা আমার সমস্ত ভার নিতে পারেন। তাঁদের কোনও পুত্র-সন্তান নেই।

শুনে প্রমাদ গণলাম। রক্ষা এই যে, মেয়েটি আমার সাথে একটা কথাও বলে না, বা আমার সেই গল্প-শোনা বোনের দলেও মেশে না।

এক মাস কেটে গেল। ঘটনা ক্রমেই ঘোরাল হয়ে উঠছে। ধর্মশালার ম্যানেজার তাঁর মোক্ষ প্রাপ্তির দায়িত্ব আমার স্কন্ধে চাপাতে ব্যস্ত। ম্যানেজার-পত্নী তাঁর ভালমানুষ স্বামী আমার পাল্লায় পড়ে সন্ন্যাসী হতে চলেছে ভেবে, অতিশয় ভীতা, অতএব আমার প্রতি বিরূপা। মুখে প্রসাদ গোঁজার ভয়ে মন্দিরে যাওয়া ছেড়েছি, পথ চলতেও এক এক পথে এক এক দিন যাই। তাতে প্রণামের সংখ্যা কমল বটে, কিন্তু চলতে হয় বহু ঘুরে ঘোরা পথে। সমুদ্রতীরের অবস্থাও ক্রমেই বিপদ সীমায় এসে যাচ্ছে। এ অবস্থায় কেন যে পুলিসে আমাকে ধরে লালবাজারে পাঠায় না, মাঝে মাঝে তা ভেবে আশ্চর্যান্বিত হতাম। পরে জেনেছিলাম, আমার এই নিরাপত্তার হেতু সেই নাথুয়ার আত্মদান। তখন কিন্তু আমি সব সময়েই পুলিসের দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করতাম।

আষাঢ় মাস এসে গেছে। পুরীতে রথযাত্রার তোড়জোড় চলছে। মনে মনে স্থির করেছি, রথযাত্রা দেখে পুরী হতে পালাব। এখন রথযাত্রা পর্যন্ত কোনও প্রকারে কাটাতে পারলে হয়। ধর্মশালায় ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে বসে থাকা যায় বটে কিন্তু আমি একটা সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের পক্ষে ঠাণ্ডা গারদ ভয়ানক শাস্তি।

সারা দিনরাত ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে কাটাই। সন্ধ্যার

সময় সমুদ্রতীরে একটু বেড়ানো নেশার মৌতাতের মত পেয়ে বসেছে। সে দিন অপরাহ্নে এক পশলা জোর বৃষ্টি হয়ে গেল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। জোর বাতাসও ছিল। বেড়ানোর সময় হতেই আর ঘরে থাকতে পারলাম না। বেরিয়ে পড়লাম। মন্দির ডান হাতে রেখে স্বর্গদ্বারের পথে সোজা সমুদ্রতীরে পৌঁছে গেলাম।

জনশূন্য সমুদ্র তীরে চলতে চলতে দেখলাম, তরঙ্গগুলি যেন রাগ করে তটের ওপরে আছড়িয়ে পড়ছে। তট কিন্তু তাতে অটল। সে প্রতিটি তরঙ্গ ঠেলে তার আপন ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তরঙ্গের প্রতি তটের যে এত অবজ্ঞা, তা সত্ত্বেও তরঙ্গ নানাপ্রকার মান, অভিমান, ক্রোধ, মিনতি বুকে নিয়ে পুনঃ পুনঃ তটের পায় লুটিয়ে পড়ছে। কেন এই ব্যর্থ চেষ্টা? কিসের জন্যে এ আকুলতা।

তরঙ্গ ও তটের এই ধস্তাধস্তি দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম। আকাশে গভীর মেঘ থাকায়, সন্ধ্যার অন্ধকার একটু আগেই নেমে আসছে। দু-একজন জেলে ছাড়া সমুদ্রতীর জনমানবশূন্য। হোটেল-গুলোর বারান্দায় কাউকে দেখা যায় না। অনেক দিন পরে এ প্রকার নির্জন পথে বেড়ান ভালই লাগছিল।

আনমনে চলেছি সমুদ্রতীরের পথ ধরে পূর্ব দিকে। বাতিঘরের কাছে আসতেই একটি মেয়ে সাথ ধরল। তার সাথে আছে এক বুড়ো পশ্চিমা দরোয়ান। আমাকে কলকাতা নিয়ে গিয়ে যাঁরা গেরুয়া ছাড়িয়ে সংসারী করতে চেয়েছিলেন, এ তাঁদেরই সেই নির্বাক মেয়েটি।

নির্বাক মেয়ে নির্বাক হয়েই সাথে চলল, আমিও চলেছি নির্বাক। মনে কিন্তু অস্বস্তিবোধ হতে লাগল। বীচ হোটেলের সম্মুখে এসে হঠাৎ মেয়েটি আমার হাত চেপে ধরে একখানা বেঞ্চের ওপরে বসিয়ে পাশেই বসল। তখন আমার মনের যে অবস্থা হয়েছিল, তাকে ভয়ও বলতে পারিনে, বিস্ময়ও বলা চলে না, আনন্দ তো নয়ই।

মেয়েটি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বোধহয় দেখল, আমি কিছু বলি কিনা। যখন আমিও নির্বাক নিশ্চল থেকে গেলাম, তখন সে প্রথম মুখ খুলল।

আপনি বোধহয় আমাকে চিনতে পারেননি। আমি কিন্তু আপনাকে দেখেই চিনেছি। কলকাতায় আমার মামাত ভাই অমিয় দাদার সাথে আপনি এক কলেজেই পড়তেন। আমার মামাবাড়িতে আপনি প্রায় রোজই আসতেন। বাবা ব্রহ্মদেশে চাকরি করতেন বলে মামাবাড়ি থেকে পড়তাম। সে সময়ে রোগা পাতলা ছিলাম। আপনি আমাকে 'ফাতাসী' বলে খেপাতেন। বাবা দেশে এসে আপনাকে বহু খোঁজ করেছেন। আপনারা সর্বস্বান্ত হয়ে দেশ ত্যাগ করেছেন—এর বেশী সংবাদ আর নাকি তিনি পাননি। আপনার সাথে দুটো কথা বলার সুযোগ হয় না। একদিন দরোয়ান সাথে নিয়ে ধর্মশালায়ও গিয়েছিলাম। ধর্মশালার ম্যানেজার আপনার সাথে দেখা করতে দেয়নি। এখানে মেঘবাতাস হলে সমুদ্রতীরে বড় কেউ আসে না। তাই আজ যদি আপনি আসেন, তবে সুযোগ পাব মনে করে অনেকক্ষণ বসে আছি। বলুন তো, আপনি এ বেশ ধরলেন কেন?

মেয়েটিকে চিনলাম, নাম অনীতা, মস্ত বড়লোকের মেয়ে, ভয়ানক জেদী আর ঝগড়াটে। বিশেষ করে আমার সাথে কথায় কথায় তর্ক করত, আর ঝগড়া বাধাত। যে বার প্রথম আমাকে পুলিসে ধরে লালবাজারে নিয়ে যায়, সে বার অমিয় তাদের বাড়িতে সংবাদটা বলতেই অনীতা নাকি বলে ওঠে, 'মরুক গিয়ে, ও নিয়ে আমাদের মাথাব্যথার দরকার কি?' কিন্তু সত্যই সেদিন ও তারপর দিন অনীতা মাথার যন্ত্রণায় কারো সাথে কথা বলেনি, স্কুলেও যায়নি। লালবাজার ঘুরে এসে তাদের বাড়িতে গেলে সকলেই নানাপ্রকারে দুঃখপ্রকাশ করলেন। অনীতা কিন্তু আমাদের বিপ্লবীদলকে লক্ষ্য করে যা তা বলে গালাগালি দিয়েছিল। আমিও রেগে যা তা বলেছিলাম। সেই দিনের দেখাই আমাদের শেষ দেখা। তারপর এই।

মেয়েটির কথায় একটু ভেবে নিয়ে বললাম—দেখ, আমি সন্ন্যাসী। তুমি খপ্ করে আমার হাত ধরে ফেললে। তারপর এই নির্জনে এক বেঞ্চিতে তোমার পাশে টেনে বসালে। এ সমস্ত তোমার অত্যন্ত অন্যায় ....।

আর বলতে পারলাম না। অনীতা উত্তেজিত হয়ে উঠে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল, কক্‌খনও না। আসল সন্ন্যাসী তুমি কিছুতেই হতে পার না। আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়ার ক্ষমতা তোমার নেই।—বলতে বলতে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। দুহাতে মুখ ঢেকে বালির ওপরেই বসে পড়ল।

ব্যাপার বুঝে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সেদিন তার কথাবার্তায়, মুখভাবে যে কথা প্রকাশ পাচ্ছিল, কলকাতায় তিন বছরের মেলা-মেশায় তার সম্পূর্ণ বিপরীত কথাই প্রকাশ পেত! কলকাতায় থাকা কালে এ বিষয়ে যদি ঘুণাক্ষরেও কিছু বুঝতে পারতাম, তবে তখনই একে সতর্ক করে এই সংঘাতিক মোহ হতে রক্ষা করতে পারতাম। এসব ব্যাপারের মোক্ষম প্রতিষেধক তো আমার হাতেই ছিল। আমি পনরো বছর বয়সে বিবাহিত, স্ত্রী বর্তমান।

বেঞ্চটার কিছু দূরে দরোয়ান সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসে ছিল। সমুদ্রগর্জনে তার পক্ষে আমাদের কথা শোনা সম্ভব ছিল না। সে মুখ ফিরিয়ে যখন দেখল, অনীতা দুহাতে মুখ ঢেকে বালির ওপরে বসে আছে, তখন বিস্মিত হয়ে উঠে এসে বলল—চল দিদিমণি, বাড়ি যাই। রাত হয়ে এল।

আমিও বেঁচে গেলাম। দরোয়ানের আগে আগে হাঁটা দিলাম। অনীতা উঠে এসে আমার হাত ধরে চলতে চলতে বলল, আমাকে তার সাথে যেয়ে বাসার দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে। বড় পোস্ট অফিসের নিকটেই তাদের বাসা।

পোস্ট অফিস পর্যন্ত দুজনেই নির্বাক ছিলাম। পোস্ট অফিসের কাছে এসে অনীতা বলল, আমি মনে ভেবেছিলাম আজ যদি তোমার সাথে দেখা হয়, তবে আমার যা বলার তা সবই বলব। কিন্তু কিছুই বলা হল না। দোষটা অবশ্য আমারই। আমি অতি অল্পেই উত্তেজিত হয়ে পড়ি। আমার কথাগুলো বুঝিয়ে বলার জন্যে আর একটা দিনের সুযোগ দিতে হবে। সে সুযোগ কবে, কোথায়, কোন্ সময়ে হবে বল?

আমি বললাম—দেখ, আমি সন্ন্যাসী হই আর নাই হই, তোমাদের সাথে মেলামেশায় কোনও দিন স্বেচ্ছায় জ্ঞাতসারে এমন কিছু বলিনি বা করিনি, যাতে তুমি আমাকে ভুল বুঝতে পার। তোমার সাথে কলকাতায় যখন আলাপ পরিচয় হয়েছে, তখন তুমিও নিতান্ত ছেলেমানুষ ছিলে না। ভালমন্দ বোঝার ক্ষমতা তখন তোমার বেশ ছিল। তোমার সেই তর্কাতর্কি আর ঝগড়াই আমার কথার প্রমাণ। এ অবস্থায় যদি আমার সমগ্র পরিচয়, অবস্থা আর কার্যকলাপ খোঁজ করে জানতে, তবে বোধ হয় এ মোহে পড়ার সম্ভাবনা থাকত না। বেশ, তুমি আর একদিন আমার সাথে নির্জনে কথা বলতে চাও, তা হবে। সে দিন কিন্তু আমি আগে আমার কথা শোনাব। সে কথা শুনেও যদি কিছু বলতে চাও, বলবে। আমি শুনব।

রাস্তার আলোয় লক্ষ্য করলাম, অনীতা আমার কথায় একটু হেসে উত্তর দিল—

তুমি যা শোনাতে চাও তা সমস্তই আমি জানি। তুমি ছেলেবেলায় বিয়ে করেছ। তোমার সে স্ত্রী বর্তমান। সে বেচারী নিতান্ত নিরীহ ভাল মানুষ; তোমার কোনও পাগলামী বা বদখেয়ালে বাধা দেয় না। তার একটা খোকা হয়েছে। তোমরা সর্বস্বান্ত হয়ে নবদ্বীপ এসে বাসা ভাড়া করে আছ। তুমি এ পর্যন্ত জীবনে উন্নতি করার বহু সুযোগ পেয়েছ, কিন্তু স্বভাব দোষে একটা সুযোগও কাজে লাগাতে পারনি। পদ্মা নদীতে জেলেদের ব্যাপার, চা বাগানের ডাণ্ডাবাজী, গোয়ালন্দ-ঘাটের বাহাদুরা, সব মিলে পুলিস মহলে তোমার খুব সুনাম আছে। তার ফলে কোথাও ভাল চাকরি মিলবে না। কারও কোনও সাহায্যও তুমি নেবে না। এই সমস্ত কথা তো তুমি শোনাতে চাও? এইবার আমার কথা একটু শোনা।—

মেয়েদের একটা ধর্ম আছে। সে ধর্ম তোমাদের ধর্মের মত পোষাকী ধর্ম নয় যে, ইচ্ছে হলেই ফেলে দিয়ে আর একটা নতুন পছন্দমত বেছে নেওয়া যায়। সে ধর্ম যে মেয়ের আছে, সে মেয়ে জীবন দিতে পারে

কিন্তু ধর্ম ছাড়তে পারে না। আমি অশিক্ষিতা সেকেলে মেয়ে নই। এবার এম্, এ, পরীক্ষা দেব। থাকি কলকাতায় শিক্ষিত ভদ্র সমাজেই। আমার লাভ-ক্ষতির বিচার তোমাকে করতে হবে না। সে বিচার আমার মন আর ধর্ম বহু পূর্বেই করেছে। আমি কুলীনের মেয়ে, আমার রক্তে এখনও কৌলীন্য বর্তমান। আমার বাবার টাকাপয়সা, বিষয়সম্পত্তি যথেষ্ট আছে। সে সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী আমি। যে দিন সংবাদ পেলাম জেলেদের কৃতজ্ঞতার দানও তুমি গ্রহণ করনি, তারপর দিনই বাবাকে বুঝিয়ে দিয়েছি যে, কোনও অবস্থায়ই আমি ও সম্পত্তি নেব না। আমার পরামর্শমত বাবা তাঁর সম্পত্তি দেশের কাজে দান করছেন। আমি এম, এ, পাশ করে চাকরি করব। তখন আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই, সে তোমার কাছে থেকেই পারি, অথবা দূরে থেকে করি, তাতে কিছু যায় আসে না। তোমার কাছে এই অনুগ্রহটুকু চাই যে, তুমি আমার সাহায্য নেবে। তোমাকে এককালে শুধুই……।

বলতে বলতে অনীতা থেমে গেল। দেখলাম চোখের কোণে জল টল্‌টল্ করছে। আর একটু এগিয়ে একটা বড়বাড়ির সদরদরজার কাছে এসে আমরা থামলাম। বদ্ধ দরজা খোলার জন্য দরোয়ান ডাকাডাকি আরম্ভ করল। আমি অনেক ভেবে-চিন্তে অনীতাকে বললাম,—

দেখছি তুমি আমার প্রায় সমস্ত সংবাদই জান। আমার এই গেরুয়া পরার কারণটা কিন্তু তুমি জান না। আর তা জানাও তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই গেরুয়া পরে ফেরার হওয়ার হেতু—আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে রায়বাহাদুর ভূপেন চ্যাটার্জীর হত্যা ব্যাপারে আমি আমার অজ্ঞাতসারে জড়িত। আমার সম্মুখে ফাঁসির দড়ি ঝুলছে।—

কথা শেষ হল না। একটা অস্ফুট শব্দ করে অনীতা ঢলে পড়তেই ধরে ফেললাম। দেখলাম চোখ দুটো উপরে উঠে স্থির হয়ে গিয়েছে। চাকর দরজা খুলেছে। কোলে তুলে নিয়ে ছোট একটু ফুলবাগান পেরিয়ে সম্মুখের বারান্দায় বেঞ্চের ওপরে শুইয়ে দিলাম। ব্যাপার দেখে বুড়ো দরোয়ান আর চাকরটা হতভম্ব হয়ে পড়েছিল।

চাকটাকে বাড়ির ভিতরে সংবাদ দিয়ে জল আর পাখা আনতে বললাম। চাকরটা চলে গেলে, আমি ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। তারপর সোজা গেলাম শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে

ছেলেবেলা হতেই আমি ঠাকুর দেবতার নিকটে সহসা কিছু প্রার্থনা করিনে। সে রাত্রে কিন্তু নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে শ্রীজগন্নাথের চরণে আমার এই অস্বস্তিকর অবস্থা হতে মুক্তি প্রার্থনা করলাম।

প্রণামান্তে পিছন ফিরে দেখি, এক জটজুটধারী সৌম্যমূর্তি সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করছেন। আমি নাটমন্দিরের পূবের চত্বরে সন্ন্যাসী মহারাজের আগমন প্রতীক্ষায় থাকলাম। দণ্ডবৎ, প্রণাম, পরিক্রমা ইত্যাদি শেষ করে মহারাজ যখন চত্বরে এলেন, তখন সম্মুখে যেয়ে প্রণাম করে নিবেদন জানালাম—মহারাজ, আপনার অনুমতি পেলে একটা উপদেশ প্রার্থনা করি।

সন্ন্যাসী ইঙ্গিতে তাঁকে অনুসরণ করতে বললেন। বিমলা দেবীর মন্দিরে যেয়ে প্রণাম করে, মন্দিরের সম্মুখে বসে আমার প্রার্থনা জানাতে অনুমতি দিলেন। আমি হাতজোড় করে বললাম মহারাজ, এমন একটা নিরাপদ স্থানের সন্ধান পেতে চাই, যেখানে যেয়ে আমি নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রবে থাকতে পারি।

সন্ন্যাসী মহারাজ আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখে হেসে ফেললেন। বুঝলাম ধরা পড়েছি।

সন্ন্যাসী স্নেহ কোমল কণ্ঠে বললেন, বেটা, ডর মৎ, সব ঠিক হো যায়েগা। আভি হৃষীকেশমে চলা যাও। বাবা কালীকমলেবালাকা গদ্দীপর ম্যানেজারকা সাথ্ মুলাকাত্ কর। সব ঠিক হো যায়েগা, ডর মৎ বেটা।

প্রণাম করে ধর্মশালায় গেলাম। রাত্রি প্রভাত হলে সাড়ে ছয়টায় ট্রেন ধরতে হবে। ভাল ঘুম হল না, অনীতার কথাই মনে জাগতে লাগল। সেই সাথে আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল—যখনই মূর্ছিতা অনীতার ছবি মনের পটে ভেসে ওঠে, তখনই তার পাশে এসে দাঁড়ায় আর একখানা ছবি। চার পয়সার একখানা মালপুয়ার জন্যে

আবদার ধরে মার খেয়ে ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে বাসায় এসে কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়েছে।. ছেলের শিয়রে বসে আছে বিষণ্ণ মুখে তার দারিদ্র্য-ক্লিষ্টা মা।

হৃষীকেশের পথে

পুরীর ধর্মশালায় আমার সেই শেষ রজনীর শেষ রাত্রে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্ন দেখলাম, নবদ্বীপ বাসায় গিয়েছি। সাথে নিয়ে গিয়েছি শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ এক কচ মালপুয়া। ছেলেটার দু'হাতে দু'খানা মালপুয়া দিয়েছি, সে খাচ্ছে আর আনন্দে নাচছে। আমি মার সাথে কথা বলছি। স্ত্রী দুয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় একটা হনুমান এক লাফে এসে কচ ধরে মালপুয়াগুলো নিয়ে গেল। আমি—নিয়ে গেল, নিয়ে গেল—বলে চিৎকার করতে করতে জেগে গেলাম।

প্রথম আষাঢ়ের ভোর পাঁচটা, বেশ ফর্সা হয়েছে। হাতমুখ ধুয়ে স্নান করে প্রস্তুত হলাম। সাথে কিছুই নিলাম না, এমন কি সেই ছেঁড়া কম্বলটাও না কারণ, আমি চলে যাচ্ছি, একথা ম্যানেজারকে বুঝতে দেওয়া সঙ্গত হবে না। প্রত্যহ যেমন বেড়াতে যাই, সেই ভাবেই চললাম। ম্যানেজার ইঁদারার পাড়ে বসে দাঁতন করছিলেন। ঘরের চাবিটা তাঁকে দিয়ে বললাম. ঘরটা আজ সাফাই করবেন। আর যে ফলগুলো আছে তা সমস্ত বিলিয়ে দেবেন, একটাও যেন না থাকে।

ম্যানেজার কোনও সন্দেহ করলেন না। আমি সোজা স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে চেপে বসলাম। চললাম হৃষিকেশের পথে। শ্রীজগন্নাথ বোধহয় সেবার আমার দুরবস্থা দেখে ও প্রার্থনা শুনে কৌতুকের হাসি হেসে বিদায় করেছিলেন।

বেলা প্রায় এগারটায় ভুবনেশ্বরে গাড়ি থামলে, আমার স্ত্রীর

দেওয়া সম্বল সাড়ে নয় আনার দু-আনা খরচ করে পেট ভরে চিড়ে দই খেয়ে নিলাম। থাকল আর সাড়ে সাত আনা। হিসেব করে দেখলাম, হৃষিকেশে পৌঁছুতে লাগবে চারদিন। অতএব দৈনিক দু-আনার বেশী খরচ করা চলবে না। পথে চেকারে যদি গাড়ি হতে নামিয়ে দেয়, তবে কতদিনে যে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাব তার ঠিক নেই। সে অবস্থায় একমাত্র ভরসা, সন্ন্যাসী মহারাজ বলেছেন—'বেটা ডর মৎ'।

সত্যই সন্ন্যাসীর বাক্য ফলতে চলল। পুরী থেকে খড়গপুর পর্যন্ত পথে চারবার চেকার গাড়িতে উঠেছিল, তাঁদের কেউই আমাকে গলাধাক্কা দেননি। একজন চেকার তো কাছে বসে আলাপ করে, কোন্ পথে, কোন্ সময়ে, কোন্ কোন্ গাড়ি ধরে হৃষীকেশে যেতে হবে, তা বুঝিয়ে দিলেন।

রাত দশটায় খড়গপুর নামলাম। আদরা প্যাসেঞ্জার ভোর পাঁচটায় ছাড়ল। গাড়িতে অত্যন্ত ভিড়। কি একটা কারণে খড়গপুর-আদরা লাইনে কদিন যাবৎ দিনেরাতে মাত্র একখানা ট্রেন যাতায়াত করছিল। মেদিনীপুর এসে ভিড় চরমে উঠল। আমি গাড়ির একপ্রান্তে জানলার ধারে বসেছিলাম। আশ্চর্যের বিষয় আমার ওপরে ততটা ভিড় চাপলো না।

ট্রেন যখন বাঁকুড়ার নিকটবর্তী হতে চলেছে, তখন দেখলাম, যাত্রীরা দরজা-জানলা ভাল করে বন্ধ করে, দরজার কাছে মালপত্র সাজিয়ে, রীতিমত ব্যারিকেড প্রস্তুত করতে লেগে গিয়েছে। একজন এসে আমার পাশের জানলাটাও ভালভাবে বন্ধ করে দিল। তার মুখে শুনলাম, সম্মুখে বাঁকুড়া স্টেশনে ক'এক হাজার যাত্রী দুদিন ধরে বসে আছে। গাড়িতে জায়গা কোথায়? শুনে সশঙ্ক চিত্তে জানলা ধরে বসে রইলাম।

ট্রেন বাঁকুড়া এসে থামল। চল্লিশ ঘণ্টা পূর্বে পুরীর সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র-গর্জন শুনেছিলাম। সে গর্জন তখনও কানে লেগেছিল। বাঁকুড়া স্টেশনে দরজা-জানলা-বন্ধ গাড়ির ভিতরে বসে

বাইরে যে গর্জন শুনলাম, তাতে নিঃশেষে সে সমুদ্র-গর্জন ভুলে গেলাম। সমুদ্রে তরঙ্গ ও তটে যে ধস্তাধস্তি হয় তার একটা সীমা আছে। সে সীমার বাইরে দাঁড়িয়ে নিরাপদে ও মল্লযুদ্ধ দেখা যায়। কিন্তু বাঁকুড়া স্টেশনের তুফানের লক্ষ্যস্থল যে আমাদেরই গাড়ি। আষাঢ়ী-বেলা বারোটা। আকাশে মেঘের লেশমাত্র নেই। মেদিনীপুরেই গাড়ির "আটত্রিশ জন বসিবেক"-এর জায়গায় আটাত্তর জন ভরতি হয়েছে। তারপর গাড়ির দরজা-জানলা সব বন্ধ। এ অবস্থাটাও ভুলে ভবিষ্যতের আশঙ্কায় বুক শুকিয়ে উঠল।

সে ভবিষ্যতও এসে গেল। দরজার পাশের তিনটে জানলা ভাঙল। সেই পথে চালু ইঞ্জিনের পিস্টনের মত চলতে লাগল বড় বড় পিতল বাঁধান বাঁশের কোঁৎকা। কোঁৎকার আওতার মধ্যে যেগুলো ছিল, তারা বোধহয় বেঞ্চের তলায় ঢুকে পড়ল। সেই ফাঁকা জায়গায় দুম্-দাম বড় বড় গাঁটরি এসে পড়তে লাগল। আধ মিনিটের মধ্যে জায়গাটা এমন বোঝাই হয়ে গেল যে, বার থেকে ঠেলেও আর গাঁটরি ঢুকনো গেল না। গাঁটরিওয়ালারাও কেউ ঢুকতে পারল না।

মিনিটখানেক পরে দেখি গাঁটরিগুলো হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠল। তখন বুঝলাম ওগুলো গাঁটরি নয়, মানুষ। তাও আবার মেয়ে-মানুষ! লাজলজ্জার কোনও বালাই নেই। আবরু থাকবে কি না থাকবে, তা ভাবার প্রয়োজন নেই। গাড়িতে উঠাতে হবে, তাই উঠিয়েছে।

সে দিন প্রথম দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম, এখন বেশ অভিজ্ঞতা হয়েছে। বাংলার বাইরে কোনও কোনও প্রদেশের অধিবাসীদের নিকটে, গাড়ির জানলা ও দরজায় কোনও প্রভেদ নেই। গাড়ির ভিতরে বসা বা দাঁড়ানোর জয়গা নিয়েও কোনও কথা নেই। গাড়ি আশ্রয় করে কোনও প্রকারে গন্তব্যস্থলে যেতে পারলেই হল। অপরাপর ব্যাপারে অবাঙালী মেয়েদের যথেষ্ট ঝাঁজ থাকলেও এ প্রকার ব্যাপারে একেবারে তারা কাঁচালঙ্কার বস্তা।

আর এই তুলনায় আমাদের বাঙালা? আমরা সরকারী ব্যবস্থায়

একটু অসুবিধে হলেই লম্বা লম্বা অভিযোগপত্র লিখব। সভা করে বক্তৃতা ঝাড়ব। সংবাদপত্রে বিরুদ্ধ সমালোচনার ঝড় তুলে, সরকারী অব্যবস্থার কথা দেশে-বিদেশে জানিয়ে দেব। তারপর আমাদের এক সম্প্রদায় তো সব ব্যাপারেই "আমাদের দাবী মানতে হবে। নইলে গদী ছাড়তে হবে।" শ্লোগানের শোভাযাত্রা বের করার জন্য সব সময়ই প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন। আমাদের তুলনায় ঐ সব প্রদেশের অধিবাসীরা কত ভাল। সাধে কি আর বাঙালী জাতটাকে কেউ ভাল চোখে দেখে না!

বাঁকুড়ায় ট্রেন দশ মিনিট থামার কথা, কতক্ষণ থেমে আছে তার হিসেব করা সম্ভব নয়। অবস্থা গতিকে এক মিনিটও দশ মিনিট হয়, আবার দশ মিনিটও এক মিনিট হয়। বাইরে গর্জন অনেকটা থেমে এসেছে। কত লোক গাড়িতে ওঠার সৌভাগ্যলাভ করল, আর কত লোক হতাশচিত্তে গাঁটবি-বোঁচকা ঘাড়ে করে ফিরে যাচ্ছে, তা দেখার সাহস নেই। শ্রীজগন্নাথের কৃপায় সেই সন্ন্যাসী মহাত্মার আশীর্বাদই আমাকে এ বিপদে বাঁচিয়েছে। তখন পর্যন্তও আমার ঘাড়ে দু'দশ জন চেপে পড়েনি। ভাঙা জানলা দিয়ে যে সমস্ত জীব ঢুকেছে, গুণে দেখলাম আঠারটি। তাদের চিল্লানির চোটে ঐ অঞ্চলে যারা ছিল, তারা আপোষে গাদাগাদি করে গাড়ির মেঝে স্পর্শ করার মত খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। তাতেও তাদের চেল্লাচিল্লি কমল না, বরং কিছু বেড়েই গেল। লাঠির গুঁতোয় যারা বেঞ্চের তলায় ঢুকেছিল, তাদের আর দেখলাম না। বোধহয় তারা সেখানেই নিরাপদে থেকে গেল। গাড়ির বার আনা লোক দাঁড়িয়ে আছে, সেও নানাপ্রকার কসরৎ করে।

হঠাৎ কানে এল, আমার জানলার বাইরে কে একজন অতি কাতর কণ্ঠে বলছে—গাড়ির ভেতরে কে আছেন, আমার একটা কথা দয়া করে শুনুন। আদরা লোকোশেডে মাত্র তিন মাস হল চাকরি পেয়েছি। তিন দিনের ছুটি নিয়ে পরিবার নিতে এসেছিলাম। আজ দুদিনেও গাড়িতে উঠতে পারলাম না। লোকোশেডের ফোরম্যান

বাঙালীদের চাকরিই দিতে চায় না। বাঙালীদের একটু ত্রুটি পেলেই বরখাস্ত করে। আজ যদি না যেতে পারি, তবে আমার চাকরি থাকবে না। গরীব মানুষ, একেবারে সপরিবারে না খেয়ে মারা যাব। যদি সম্ভব হয়, তবে দয়া করে আমাদের একটু ব্যবস্থা করুন।

আমি জানলা না খুলেই জিজ্ঞাসা করলাম—আপনারা কজন?

আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজন, আর কোলে একটা ছোট বাচ্চা আছে!

মালপত্র কি আছে?

ছোট একটা ট্রাঙ্ক আর দুটো বিছানার বাণ্ডিল আছে।

আমার এই জানলার কাছে ট্রাঙ্কটা রেখে তার ওপরে বাণ্ডিল দুটো রাখুন। আপনার স্ত্রীকে ঐ বাণ্ডিলের ওপরে বসতে বলুন। লক্ষ্য রাখুন গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা পড়া ও গার্ডসাহেবের দিকে। যেই বুঝবেন গাড়ি ছড়ার সময় হয়েছে, তখনই আমাকে বলবেন, আমি আপনাদের তুলে নেব। মাল তোলার জন্যে একটা কুলি কাছে রাখুন।

ঠিকমত সমস্ত করা হল। মালের ওপর দিয়ে উঠতে মেয়েটির কোনও অসুবিধে হল না। কুলি চলতি গাড়িতেই মাল তিনটে তুলে দিল। ভদ্রমহিলাকে বসতে দিয়ে আমি দাঁড়ালাম। দুবেঞ্চের ফাঁকে বাক্স ও বিছানার বাণ্ডিল ফেলে একটু বসার জায়গা হল বটে, কিন্তু মায়ের কোলে ছসাত মাসের বাচ্চা ছেলে, যদি কল ছাড়ে তবে ভিজিয়ে দেবে, আমার সাথে দ্বিতীয় বস্ত্র নেই।

গাড়ি ছেড়ে চলেছে। হঠাৎ বউটি উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাত ধরে টেনে বলল—দাদা, আপনি আমার পাশে বসুন। এখানে আমাদের দু-ভাই-বোনেরই বসার জায়গা হবে।

আবার দাদা! বাধ্য হয়ে বউটির মুখের দিকে তাকাতে হল। একেবারে ছেলেমানুষ, ডাগর দুটি চোখ স্নেহ মমতা সরলতায় ভরা। মনে হল সে যেন আমার চিরপরিচিত ছোট বোন।

বসলাম তার পাশেই। পরিচয় যা পেলাম, তাতে ভদ্রলোকের নাম বিনয় দেব, জাতি কায়স্থ, বাড়ি বাঁকুড়া সহর হতে ন'দশ মাইল

দূরে গ্রামে। ছ'বৎসর বয়সের মধ্যেই পিতামাতা হারিয়ে, বিধবা পিসীর কাছে প্রতিপালিত হয়েছেন। বিষয় সম্পত্তি যা ছিল, তা বিক্রী করে পেট ও পড়ার খরচ চালিয়েছেন। ম্যাট্রিক পাশ করে পুলিসের চাকরিতে ঢোকেন। ছ'বছর চাকরি করে পুলিসের চাকরি ভাল না লাগায় সে চাকরি ছেড়ে, আদরা রেলের লোকো বিভাগে ক্লিনার হয়ে ঢুকেছেন। আশা আছে ভবিষ্যতে ড্রাইভার হতে পারবেন। ছ'বছর হল বিয়ে করেছেন। বউটি গ্রাম্য মেয়ে, সামান্য কিছু লেখাপড়া জানে।

আমার পরিচয় যা দেবার তাই দিলাম। বেলা তিনটের সময় ট্রেন আদরা জংসনে শেষ থামা থামল। সকলে নামছে। আমরা গাড়ির শেষ প্রান্তে আছি, ভিড় কমলে শেষে নামব। মেয়েটি বলল, দাদা আপনি খোকাকে নিন। আমি ছোট বিছানাটা নিই। উনি বাক্সটা নিয়ে চলুন, পরে এসে বিছানাটা নিয়ে গেলেই হবে। দেখছেন তো কুলি পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি বললাম—আমি যে আসানসোল যেয়ে দেরাদুন এক্সপ্রেস ধরব। আমার ট্রেন একটু পরেই ছাড়বে।

মেয়েটি অতি সহজভাবে উত্তর দিল—তা হবে না। আমি নতুন বাসায় যাচ্ছি। বাসায় থেকে কেমন করে সংসার করে, তা আমি জানিনে। আমি আপনার ছোট বোন। বোনের নতুন সংসারটা গুছিয়ে ঠিক করে না দিয়ে কোথাও যেতে পারবেন না।

অত্যন্ত সহজ সরল অকাট্য যুক্তি। ছোট বোনের নতুন বাসারে সংসার গুছিয়ে না দিয়ে দাদা আমি কিছুতেই যেতে পারিনে। তারপর সংসার পাতিয়ে দিয়ে, যাওয়ার জন্যেও বোনের অনুমতি নিতে হবে নিশ্চয়ই! আশ্চর্য এরা! পরিচয় করে আপন করে নিতে দশ মিনিটও লাগে না। আবার দশ বছর এক জায়গায় থেকে আলাপ-প্রলাপ চালিয়েও এদের আপন করা যায় না।

বাধ্য হয়ে ছোট বোনের খোকা-ভাগ্নে কোলে করে রেল কলোনীতে ভগ্নীপতি বিনয় দেবের বাসায় যেতে হল।

ছয় দিন বিনয়ের বাসায় ছিলাম। বোনটি নতুন সংসার পাতানো ব্যাপারে সত্যই আনাড়ী। পাঁচদিনে অন্ততঃ পঁচিশবার আমাকে দোকানে ছোটাছুটি করতে হল। কাজকর্মও ভাল জানে না বা বোঝে না। তবে আলস্য বা কাজে অবহেলা নেই। আরও কিছুদিন থাকা লাগত, কিন্তু পঞ্চম দিনের রাত্রে আমার অবস্থাটা খুলে বললাম। শুনে, আমার বিপদ সম্ভাবনায় বোনটির মুখ শুকিয়ে গেল। বারবার বলতে লাগল, একথা কেন প্রথমে বলিনি। বললে তো সে আমাকে বাসার বাইরে এক পা-ও যেতে দিত না। এখন যদি পুলিসে দেখে থাকে তবে কি হবে ?

বিনয়কে বলল—তুমি তো দু'বছর পুলিসের চাকরি করেছ। একবার থানায় যেয়ে খোঁজ করে দেখ না, তারা দাদাকে দেখেছে কিনা।

বোনটির কথায় আমরা দুজনেই হেসে ফেললাম। আমাদের হাসতে দেখে সে আরও রেগে গেল। তার রাগ দেখে গম্ভীর মুখে বিনয় বলল—তাহলে তোমার কথামত কাল আমি থানায় যেয়ে দারোগা-বাবুকে জিজ্ঞাসা করব যে, আমাদের বাসায় সন্ন্যাসীদাদা এসেছেন। তিনি একজন ফেরারী। আপনারা তাঁকে দেখেছেন কিনা—কেমন এই তো ?

তা কেন বলবে। দাদা পুলিসের নজরে পড়েছেন কিনা, এইটে তুমি জেনে আসবে।

তা হলে আমি থানায় যেয়ে কাকে কি বলে জিজ্ঞাসা করব, তা তুমিই আমাকে শিখিয়ে দাও।

বোনটি নিরুত্তর। আমি তার মনের অবস্থা বুঝে বললাম—দিদি, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। কাল চারটার ট্রেনে আসানসোল যেয়ে দেরাদুন এক্সপ্রেস ধরব। হৃষীকেশে আমি নিরাপদেই পৌঁছাব। পুরীতে সেই সন্ন্যাসী মহারাজ আমাকে অভয় দিয়েছেন। সাধু মহাত্মাদের বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না।

দাদা, আজ রাত্রে যাওয়ার কোনও গাড়ি নেই ?

প্রশ্ন শুনে অবাক্ হয়ে গেলাম। আমার অমঙ্গল-আশঙ্কায় বোনটি যে কতটা বিচলিত হয়েছে, তা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গেল।

পরদিন সাড়ে তিনটায় বিদায় নিতে হল, চারটায় গাড়ি ছাড়বে। দরিদ্র রেলকর্মচারী বিনয় একখানা নতুন বহির্বাস ও গামছা দিয়েছে। তার এক সহকর্মী বন্ধু দিয়েছে একখানা কম্বল। আসানসোল স্টেশনে যেয়ে যাতে অসুবিধায় না পড়তে হয় তার জন্যে ধানবাদের টিকিট একখানাও এনে দিল। বোনটি দিল এক পোঁটলা খাবার আর একটা পিতলের গ্লাস।

যাত্রার সময় আমার পথে কুড়িয়ে পাওয়া বোন, প্রণাম করে হাতের মধ্যে সাতটা টাকা গুঁজে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল—দাদা, এ টাকা কটা আমি বৌভাতে আশীর্বাদী পেয়েছিলাম। টাকা কটা আপনার সাথে থাক। আপনি বিপদ-মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে আমার কাছে আসবেন। হৃষীকেশে পৌঁছে একখানা পোস্টকার্ডে, আপনি নিরাপদে পৌঁছেছেন এইটে শুধু জানাবেন।

তারপর আমার হাত ছেড়ে দিয়ে, চোখ মুছতে মুছতে ঘরের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি চললাম স্টেশনে ভাবতে ভাবতে, সুখ-আনন্দ কি তবে ভালবাসার মিলন ও বিরহের গলা জড়িয়ে ধরে চলে?

স্টেশনে এসে বিনয়কে বললাম—ভাই, আমি গেরুয়া পরে বিনা টিকিটে ট্রেনে চলি। এ অবস্থায় টাকা সাথে থাকলে অনর্থক মিথ্যা কথা বলতে হবে। তুমি এই টাকা কটা আমার বোনটিকে ফিরিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে বলবে, বিপদ কেটে গেলে ফিরে এসে, এ টাকা দিয়ে মা মঙ্গলচণ্ডীর পূজো দেব।

* * * * * * *

আসানসোল এসে সাত ঘণ্টা বসে থেকে দেরাদুন এক্সপ্রেস ধরলাম। ধানবাদ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হল। ধানবাদে এক ভদ্রলোক নেমে যাওয়ার সময়, তাঁর জায়গাটা আমাকে দিয়ে গেলেন। বসার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ছেলেবেলায় কোনও একখানা বইতে পড়েছিলাম—অশ্বজাতি দাঁড়াইয়া নিদ্রা যায়। তারপর লক্ষ্য করেছি, পশুপক্ষীদের জাতি ও

শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য তাদের নিদ্রাকালেও সকলেরই এক। মানুষের বেলায় কিন্তু তা নয়। আহার, বিহার, রীতিনীতি—এ সমস্ত বাদ দিয়ে কেবল নিদ্রা ব্যাপারেই মানুষের কত বৈশিষ্ট্য। নাসিকা গর্জন, লালাক্ষরণ, অঙ্গমোটন, দন্ত কড়মড়ি এ সব তো আছেই; তা ছাড়া স্থান-কাল-পাত্র ও হেতু-ভেদে মানুষের নিদ্রা, রস, মাধুর্য ও দার্শনিক তত্ত্বে ভরপুর। তবে এ সমস্ত রস, মাধুর্য ও দার্শনিক তত্ত্ব উপভোগ করতে হলে দেখার মত চোখ, শোনার মত কান, আর বুঝার মত তত্ত্বজ্ঞান থাকা চাই।

ছেলে ঘুমপাড়াতে মা ঘুমান। বৎসরে দশ মাস ছাত্র-ছাত্রীরা সম্মুখে বই খুলে রেখে ঘুমায়। ক্লাসে বসে শিক্ষক ঘুমান। অফিসে যাওয়ার পথে গাড়িতে ভিড় উপেক্ষা করে কেরানীবাবুরা ঘুমান। সংসারে অর্থাভাব থাকলে, গিন্নীর বাজেট বক্তৃতার সময় কর্তা ঘুমান। এ সমস্ত ঘুমের ফলে অনেক সময় মোটারকমের খেসারত দিতে হয়।

বিনা খেসারতে নিরাপদের ঘুমও আছে। অফিসের বড়কর্তা অফিস-চেয়ারে হেলান দিয়ে, টেবিলের ওপরে পা তুলে ঘুমান। আমাদের পালনকর্তাদের কেউ কেউ পকেটে হাতপুরে ঘুমান। পার্লামেণ্টে বা লোকসভার জনপ্রিয় মন্ত্রীর পাল প্রায়ই সেক্রেটারীদের হাতে কান, চোখ আর দলের কাছে বিবেক বুদ্ধি জমা দিয়ে ঘুমান। অন্যান্য সদস্যরা পার্টি হুইপের হাতে কান জমা রেখে ঘুমান। ব্যাকবেঞ্চাররা একমাত্র পাওনার বিল ভাঙানোর সময় ছাড়া আর সব সময় ঘুমান। ভক্ত বৈষ্ণবেরা ভাগবত পাঠসভায় তত্ত্বসিদ্ধান্ত ব্যাখ্যার সময় ঘুমান।

এই প্রকার বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘুম একমাত্র মানুষেই ঘুমায়। তার মধ্যে সভ্য সমাজে বোধহয় রকমারীটা একটু বেশী।

সে রাত্রে দেরাদুন এক্সপ্রেসে থার্ড ক্লাস গাড়িতে আমিও এক চমৎকার ঘুমের পাল্লায় পড়েছিলাম। আসানসোলে গাড়িতে উঠে দেখলাম গড়পড়তায় মন দুয়েক ওজনের এক দম্পতি আরামে

ঘুমচ্ছেন। তাঁদের জাগিয়েও অতিরিক্ত স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বুঝে, সে চেষ্টা আর করলাম না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে নিদ্রাভঙ্গীর মাধুর্য উপভোগ করছিলাম। দম্পতির পতিটি চিৎ হয়ে শুয়ে, একখানা চরণ জায়াদেবীর কাঁধের ওপর দিয়ে পিঠের ওপরে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। আর একখানা চরণপদ্ম জানলা দিয়ে বাইরে প্রসারিত। শ্রীঅঙ্গে হাওয়া-বাতাস লাগানোর জন্যে পরিধেয় ধুতিখানা কটিতটে জড়ানো। বৃহৎ নিতম্বসমেত আর সর্বাঙ্গই অনাবৃত।

জায়াদেবী মুখে ওড়না জড়িয়ে, পতিদেবতার এক চরণ কাঁধে নিয়ে, জানলায় স্থাপিত অপর চরণ বালিশ করে ঘুমচ্ছেন। উভয়ের নাকই সমান তালে গর্জন করছে।

যতক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, ততক্ষণ এ নিদ্রার রসমাধুর্য বেশ উপভোগ হচ্ছিল। ধানবাদে এসে যখন জায়াদেবীর পিঠের কাছেই বসার জায়গা পেলাম তখন একটু পরেই রস শুকিয়ে গেল। জায়াদেবীর পিঠের ঠ্যাং আমার ঘাড়ে চাপতে চায়।

বাধ্য হয়ে উঠতে হল। বাঙালীজাত আমরা, চাঁদা ও চাকরির জন্যে বহু গোদাচরণেই তৈলমর্দন করে থাকি, তাই বলে রেল গাড়ির থার্ড ক্লাস যাত্রী হয়ে, ধনীর গোদাপা কাঁধে করতে কোনও বাঙালীই প্রস্তুত নয়, বিনা-টিকিটের যাত্রী আমিও নই।

এগিয়ে যেয়ে ঘুম ভাঙাতে চেষ্টা করলাম। ডাকলাম, সাড়া নেই। ঠেলা দিলাম—নড়ে না। কাতুকুতু দিলাম—কোনও বোধ নেই। মাথা ধরে ঝাঁকুনি দিলাম—নাকের ডাক থামল বটে, চোখ খোলে না। মহা ভাবনায় পড়লাম। কুম্ভকর্ণের কলিযুগ সংস্করণের নিদ্রাভঙ্গ না করতে পারলে, সারাটা রাত দাঁড়িয়ে যেতে হবে।

হঠাৎ মনে পড়ল, সেই ত্রেতা যুগে লঙ্কায় শ্রীযুত কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাতে সম্রাট রাবণচন্দ্রের অত্যন্ত বেগ পেতে হয়েছিল। এই সংবাদ সর্বত্রই জানাজানি হয়। সীতা-উদ্ধারের পর বানর-সম্রাট সুগ্রীব নিজ রাজ্যে ফিরে এসে রাজকার্য পরিচালনা করতে যেয়ে বুঝলেন, তাঁর

মন্ত্রীবর্গ এবং বড় বড় দায়িত্বশীল পদে প্রতিষ্ঠিত কর্মচারীরা, নানাকারণে নানাপ্রকার ঘুম ঘুমান। তার মধ্যে জেগে ঘুমনোটাই বেশী। তখন বানররাজ রাজ্যের বড় বড় বৈজ্ঞানিক নিয়ে একটা কমিশন গঠন করে, তাঁদের ওপরে এমন একটা বস্তু আবিষ্কারের ভার দিলেন যা সর্বপ্রকার ঘুমের প্রতিষেধক অথচ শস্তা হবে।

বৈজ্ঞানিকেরা প্রথম আবিষ্কার করেন জল-বিছুটি। রাজার নির্দেশে সেটা প্রথম পরাক্ষা করা হল প্রধান মন্ত্রী মাননীয় জাম্বুবানের ওপরে। ফল হল সাংঘাতিক। প্রধান মন্ত্রীর কামড়ে তিনজন বৈজ্ঞানিক অকুস্থলেই পটোল তুললেন। তেরজন গেলেন হাসপাতালে। রাজা আবিষ্কারটা অনুমোদন করতে পারলেন না।

তারপর আবিষ্কার হল কাঁচালঙ্কার নির্জলা রস। সেটার পরীক্ষা হল পূর্তমন্ত্রী মাননীয় নল মশাইএর চোখে দিয়ে। তাতে মন্ত্রী মশাই মহাধিকরণে নিজ কার্যালয়ের মধ্যেই এমন চিৎকার ও লম্ফ ঝম্ফ করলেন যে, সে প্রকার কাণ্ড রাজ্যের লোকসভা অথবা কিস্কিন্ধ্যানগরীর পৌর সভায় প্রায়ই ঘটে থাকলেও, রাজ্যের মহাধিকরণ-ভবনে বড়ই। অশোভন। কাজেই রাজা এটাও অনুমোদন করলেন না। বৈজ্ঞানিক কমিশন পড়লেন মহামুস্কিলে।

এই সময়ে একদিন রাজার নাপিত রাজঅঙ্গের উকুন বাছতে বাছতে গল্প করল—তাদের গ্রামের পাঠশালায় বানর বালকেরা পণ্ডিত মশাই ক্লাসে বসে ঘুমুলে, তাঁর লেজের সাথে জ্বলন্ত তারাবাজী, জ্যান্ত ছুঁচো, এইসব বেঁধে দিত। পণ্ডিত মশাই জ্বালাতন হয়ে এমন একটা গুঁড়ো আবিষ্কার করেছেন, যা এক টিপ নাকে দিলে কয়েকটা হাঁচি হয়ে, ঘুম আর আসতে পারে না। বৃদ্ধ পণ্ডিতের দ্বাদশ পক্ষের তরুণী স্ত্রী নানা কারণে যখন তখন বিছানায় শুয়ে ঘুমুত। ডাকলেও সাড়া পাওয়া যেত না। এখন এই গুঁড়ো প্রয়োগের ফলে, পণ্ডিত এদিক দিয়েও চমৎকার সুফল পেয়েছেন। গুঁড়োটার নাম রেখেছেন তিনি—নস্য।

গল্প শুনে মহারাজা তখনই দূত পাঠিয়ে পণ্ডিত মশাইকে রাজ সভায় আনালেন। নস্য নামক গুঁড়োটা পরীক্ষা করে দেখা গেল, সত্যই

সবরকম ঘুমের অমোঘ প্রতিষেধক, নির্দোষ এবং শস্তা। রাজা খুশি হয়ে পণ্ডিতকে তার ইচ্ছামত পুরস্কার চাইতে অনুমতি করলেন।

পাঠশালার পণ্ডিত প্রার্থনা করলেন, লঙ্কা হতে মহারাজ কর্তৃক আনীত অমৃত ফল আমের একটা তাজা আঁঠি। রাজা কিন্তু এ জিনিস কাউকে দিতেন না। তাঁর মৎলব ছিল, আম তাঁর বাগানের একটা পেটেণ্ট ফল হয়ে থাকবে। কিন্তু এই পাঠশালার পণ্ডিত মশাই রাজার সে চেষ্টা পণ্ড করলেন। রাজবাক্যের মর্যাদা রক্ষার জন্য, একটা তাজা আঁঠি দিতে হল। এই অমৃত ফল আমের বহুল প্রচার ও ঘুম ভাঙানোর—বিশেষ করে জেগে ঘুমনো ঘুম ভাঙানোর অব্যর্থ মুষ্টিযোগ নস্য আবিষ্কার আর আমের জন্য আমরা কিন্তু এই নির্লোভ বানর পণ্ডিত মশাইএর নিকটে ঋণী। লঙ্কায় অশোক বনে সীতাদেবী প্রদত্ত আম খেয়ে, মহাবীর হনুমান তার আঁঠিটা এদেশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, আর তা থেকেই এদেশে আম গাছ হয়ে আমের প্রচলন হল এটা অবিশ্বাস্য।

সে রাত্রে দেরাদুন এক্সপ্রেসে সেই কলির কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙানোর জন্যে নস্যের কাহিনী মনে পড়ল বটে কিন্তু আমার কাছে নস্য ছিল না। গাড়ির ভদ্রমহোদয়গণের সমীপে আবেদন জানাতেই, তিন-চারটে কৌটো এগিয়ে এল। হাতের কাছে যেটা পেলাম সেইটে নিয়ে, ভালরকম এক টিপ কুম্ভকর্ণের নাকে প্রয়োগ করলাম। এক টিপেই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না—তিন নাড়ী এক করে মূলাধার চক্রে পৌঁছে, কুলকুণ্ডলিনী পর্যন্ত জেগে গেল। হ্যাঁচ্চো, ফ্যাঁচ্চো, থক্ থক্, ওয়াক্, থুঃ—এই পঞ্চস্বর আবৃত্তি করতে করতে কুম্ভকর্ণ উঠে বসলেন। বসেও আবৃত্তি সমানে চলতে লাগল। নাকের পোঁটা, মুখের লালা, চোখের জল, সমানে তিন দিকে ছিটতে দেখে, নিকটস্থ সকলে উঠে সরে দাঁড়ালেন।

মিনিট তিন চারের মধ্যে কতকটা সামলে নিয়ে, কুম্ভকর্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, হামারা হ্যাঁচ্চো—নাকমে ফ্যাঁচ্চো—নাস্ থক্ থক্—কোন্ ওয়াক্ ওয়াক্—দিয়া থুঃ ?

উত্তর দিলাম—আমি দিয়েছি। আপনার ঘুম ভাঙানোর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায়, শেষে এই রামভকত্‌কা রাম দাওয়াই লাগিয়েছি।

এখানে তো আর কারও বসার মত জায়গা নেই।

সেটা আমিও জানি। বসার জায়গা করার আশায় আপনাকে জাগাইনি। আমার বসার জায়গা আপনার স্ত্রীর পেছনে আছে। আপনার একখানা শ্রীচরণ আপনার স্ত্রীর স্কন্ধ অতিক্রম করে আমার ঘাড়ে চাপতে চাচ্ছিলেন, তাই জাগিয়েছি।

আপলোক সাধু হ্যায়?

হ্যাঁ জী, বহুৎ বড়িয়া সাধু হ্যায়। ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী হ্যায়। আউর হাম একদম আংরেজীওয়ালা বাঙালীবাবু সন্ন্যাসী হ্যায়। হৃষীকেশমে বাবা কালীকমলেবালা কা গদ্দীমে যাতা হ্যায়। হাম বহুত বড়িয়া সাধু হ্যায়।

মাপ কিজিয়ে মহারাজ। বৈঠ্‌ যাইয়ে—বলে কুম্ভকর্ণ একটু নড়ে চড়ে বসলেন। তাতে এক ইঞ্চি জায়গাও ফাঁক হল না। আমি আমার জায়গায় যেয়ে বসলাম।

এত কাণ্ড ঘটে গেল তাতে কিন্তু জায়াদেবীর নাকের ডাক থামেনি! তবে হ্যাঁ, একবার বোধহয় থেমেছিল, যখন তাঁর বালিস কুম্ভকর্ণের ঠ্যাং জানলা হতে সরে বেঞ্চের তলায় নামে। সেও মাত্র দু'মিনিটের জন্য, তারপরেই জানলায় মাথা রেখে পূর্ণোদ্যমে গর্জন চলছে।

হৃষীকেশে বাবা কালীকমলীর গদীতে যাচ্ছি শুনে, কুম্ভকর্ণের বোধহয় আমার ওপরে একটু ভক্তি এসে গেল। তিনি নিজে থেকেই পরিচয় দিলেন—কলকাতা বড়বাজারে গদী আছে, লাখ লাখ টাকার ব্যবসা হয়। দুই ছেলে উপযুক্ত হয়ে এখন ব্যবসা দেখছে। কর্তা-গিন্নী দুজনে ধর্মকর্মে মন দিয়েছেন। তাঁর পিতা তিন লাখ টাকা খরচ করে কাশীধামে ও হরিদ্বারে ধর্মশালা করেছেন। তিনিও বাংলা মুলুকে দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী হলে হাজার হাজার টাকা দান করেন। গান্ধী মহারাজের স্বরাজের জন্যে বছরে হাজার-এক টাকা চাঁদা দেন—ইত্যাদি।

তাঁর ধর্মকর্ম দান খয়রাতের ফিরিস্তি শুনে এক ভদ্রলোক বললেন —প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে বাংলা দেশে এমন অনেক বড় বড় ডাকাত ছিল যারা দেশে-বিদেশে ডাকাতি করে ধনসম্পদ এনে বাড়িতে দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি নানা প্রকার ধর্মকর্ম করত। সেই ধর্মকর্মে বহু কাঙ্গালীকে খাইয়ে কাপড় টাকা ইত্যাদি দিত। তৎকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও এদের নিকটে অনেক কিছু সাহায্য পেতেন। বাঙ্গালীর সে দিনও নেই, সে প্রকার দান-খয়রাৎ করার মত লোকও নেই। এখন ওটা আপনারাই করছেন। তবে বাঙালীদের সাথে আপনাদের এক জায়গায় পার্থক্য আছে। সেকালের বাঙালী ডাকাতরা কেবলমাত্র ধনীর ভাণ্ডারই হৈ হৈ করতে করতে লুণ্ঠন করত, দরিদ্রের শাক-ভাতের ওপরে হামলা করত না। তাদের ডাকাতিটা ডাকাতি বলে চেনাও যেত। এখন ওর রকমটা বদলিয়েছে।

কুম্ভকর্ণ আবার বলতে আরম্ভ করলেন—বাঙালী ব্যবসা বোঝে না। কেমন করে টাকা খাটিয়ে টাকা তুলতে হয়, তার কৌশল জানে না। ব্যবসায় বাঙালীর সাহসের অভাব, কারণ তারা মাছ খায়। তারপর বাঙালী অত্যন্ত বিলাসীবাবু। যা উপায় করে, তার চাইতে বেশী খরচ করতে চায়—ইত্যাদি।

এবার আর এক ভদ্রলোক উত্তর দিলেন—বাঙালী যে একেবারেই ব্যবসা বোঝে না, তা নয়। তাদের প্রধান অসুবিধা—মূলধনের অভাব। সে অভাব পূরণের প্রধান বাধা হচ্ছে—অপরের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক চক্রান্ত। তবে কলকাতার বড়বাজারী ব্যবসা বাঙালী সত্যিই করতে পারে না। কারণ ওটা বাঙালীর রুচিতে পোষায় না। তারপর ও ব্যবসাচক্রে বাঙ্গালী ঢোকার উপায়ও নেই। যদি কোনও দুঃসাহসী বাঙালী ঢুকতে চেষ্টা করে, তবে এমন মার খায় যে, একেবারে মাজা ভেঙে যায়। বিলাসীতা বাঙালীর সত্যিই আছে। লাখ লাখ টাকা উপার্জন করে, শস্তা দরের কাঁচা তরমুজ বা ঝিঙের ঝোল দিয়ে রুটি খেয়ে, দড়ির খাটলীর ওপরে শুয়ে টাকা জমানো চিরকালই বাঙালীর স্বভাববিরুদ্ধ। বাঙালী যদি মাসে একশ টাকা

উপায় করে (১৯২৬ খৃঃ), তবে মেয়ে-ছেলে নিয়ে রেলে চলতে হলে, কিনবে ইণ্টার ক্লাস টিকিট। তিনশ টাকা মাসে আয় হলে কিনবে সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট। পাঁচশ টাকা আয় হলে ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভ করবে। লাখ লাখ টাকা মূলধনের ব্যবসার মালিক হয়ে, রেলের থার্ডক্লাস গাড়িতে বউয়ের ঘাড়ে ঠ্যাং চাপিয়ে আরামে ঘুমনো বাঙালী জাতির জাতীয় স্বভাব, চরিত্র ও রুচির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। তাতে কেউ যদি তাকে বিলাসী বলে বলুক, জাতীয় ভাবধারা তো ত্যাগ করা যায় না।

এরপরে 'কুম্ভকর্ণ-বাঙালী সংবাদ' থেমে গেল, আমিও বাঁচলাম। কিছুক্ষণ পরেই আবার দুজোড়া নাসিকা গর্জন আরম্ভ হল। তবে এবার আর চিৎ হয়ে ঠ্যাং ছড়িয়ে নয়। জানলার ওপরে ওড়না ঢাকা মুখের সাথে নাক লাগিয়ে গর্জন প্রতিযোগিতা চলতে লাগল। রাত্রে আর কোনও উপদ্রব দেখা দিল না।

বেলা দশটায় ট্রেন বেনারস পৌঁছল। কুম্ভকর্ণ-দম্পতি সমেত বহুলোক নেমে গেলেন। গাড়িটা বেশ ফাঁকা হল। আমি হাতমুখ ধুয়ে খাওয়ার আয়োজন করলাম। আদরার বোনটির দেওয়া পোঁটলাটা খুলে দেখলাম, আমার মত খানেওয়ালার দুদিনের খাবার চারটি স্তরে সুন্দর করে সাজানো আছে। যাতে দুদিনেও খাবার নষ্ট না হয়, তার জন্যে প্রচুর ময়ন নিয়ে কড়াভাজা লুচি, হালুয়া, মোরব্বা, আচার। প্রতিটি জিনিস ও সাজানোর কৌশল স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছে, আমার সেই ছ'দিনের পরিচিত—তাই বা বলি কেন! দেখা মাত্রে পরিচিত ছোট্ট বোনটির ভালবাসার গভীরতা।

শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বইগুলির নারীচরিত্র নিয়ে সমালোচনা কিছু কিছু পড়েছি। কিন্তু কি জন্য যেন মনে হয় সমালোচনাগুলি প্রায়ই বাস্তববোধ বর্জিত। যে বস্তু যে প্রকার সে বস্তু যদি সেই প্রকারেই বর্ণিত হয়, তবে তার সমালোচনা কি করে হবে? সুন্দর গোলাপ ফুলের গাছে ভয়ানক কাঁটা। গাছসমেত গোলাপ ফুলের বর্ণনা লেখা হলে, সে লেখার সমালোচনা কি প্রকার হবে? সমাজে সামাজিক মানব-জীবনস্রোত আর পারিপার্শ্বিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে

এঁকে-বেঁকে চলেছে। সে চলার পথে, পথের পাশের কত কিছু ভেঙে যায়, আবার কত নতুন চর ফেলে উর্বর জমি প্রস্তুত হয়। সময়ে আনন্দ-বর্ষায় আসে তার জোয়ার, সময়ে দুঃখ-শীতে হয় শীর্ণ। কিন্তু লক্ষ্যের দিকে গতি তো তার থেকেই যায়!

পুরীতে সেই শেষ সন্ধ্যায়, অনীতার সাথে নতুন করে চেনা পরিচয় হওয়ার পর, এ সাতদিন একটা ব্যস্ততার মধ্যেই কেটে গিয়েছে। মাঝে মাঝে অনীতার কথা মনে হত বটে, তবে সে তার ঐ মূর্চ্ছিত রূপটিমাত্র। অনীতার উক্তিগুলি ভেবে দেখার অবকাশ পাইনি। কেন পাইনি? কেন পাইনি, তার হেতু বলে দিচ্ছে ঐ সম্মুখের খাবারগুলো।

বেনারস স্টেশনে খাবার পুঁটুলি খুলে নিয়ে বোনটির কথা মনে পড়তেই চিন্তা জগতে এসে দাঁড়াল অনীতা। সে এমনভাবে মন দখল করল যে, হৃষীকেশ পৌঁছানো পর্যন্ত আর কোনও কিছু মনে স্থান পেল না। এর কারণ বোধহয় তৎকালে আমার সম্মুখে বোনটি অথবা ঐ প্রকার অপর কারও অনুপস্থিতি।

সে রাত্রে অনীতা বলেছিল—'আমাদের একটা ধর্ম আছে। সে ধর্ম তোমাদের অর্থাৎ পুরুষের ধর্মের মত পোষাকী নয় যে, ইচ্ছে করলেই খুলে ফেলে আর একটা পছন্দমত করে নেব। আমার লাভ-ক্ষতির বিচার তোমাকে করতে হবে না। কারণ, তা তুমি বুঝবে না। সে বিচার আমার মন আর ধর্ম বহু পূর্বেই করেছে।'

অনীতার একথার মর্যাদা আজও রক্ষা করে চলেছি। তথাপি ভাবি, সে তো আমার সব সংবাদই জানত! জেনেশুনে এ বিষবৃক্ষ কেন সে মনে স্থান দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছে?

বোধহয় না দিয়ে উপায় ছিল না। একে উচ্ছেদ করতে তার ধর্মই বাধা দিয়েছে, আর মন করেছে পরিপুষ্ট। কিন্তু এই ধর্মের স্বরূপটা কি? নারীমাত্রেরই কি ধর্ম এক? না কি এর ব্যতিক্রম আছে?

দার্শনিক আচার্য কপিল, তাঁর সাংখ্যদর্শনে বিচার করে দেখিয়েছেন, নির্গুণ পুরুষ গুণময়ী প্রকৃতি-সংসর্গে দুঃখ পাচ্ছে। প্রকৃতি সঙ্গত্যাগ

করলেই সে মুক্ত দুঃখাতীত। গৌতম ও কণাদ ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে, জাগতিক যাবতীয় পদার্থ বিশ্লেষণ করে দেখালেন, মানুষের দুঃখের হেতু হচ্ছে জাগতিক পদার্থ ভোগের চেষ্টা, যা কোনও প্রকারেই ভোগ্য নয় বরং দুঃখের হেতু। মায়াবাদী বৈদান্তিক আচার্য শ্রীশঙ্কর বেদান্তদর্শন বিচার করে প্রতিপন্ন করেছেন, এ জগৎ মিথ্যা মায়ামাত্র! ভ্রান্ত মানব সুখের আশায় মিথ্যা মায়ার সংসারের পিছনে ঘুরে দুঃখ পাচ্ছে। এ দুঃখের হাত থেকে বাঁচতে হলে সংসার ত্যাগ করতে হবে।

এই সমস্ত দার্শনিকদের বিচার বিশ্লেষণ পড়লে মনে হয়, এ যেন একটা সদ্য ফোটা গোলাপ গাছ থেকে ছিঁড়ে এনে, দু'হাতে আচ্ছা করে চটকিয়ে তার রূপ দেখানো আর রসটা জিভেয় লাগিয়ে তার স্বাদ বোঝানো।

মাদকবর্জনী বক্তৃতা ও প্রবন্ধের মত এই সমস্ত দার্শনিকদের তত্ত্বকথা আমরা শুনি, পড়ি, কেউবা কিছু বুঝিও। কিন্তু যখন কোনও ভক্ত গায়কের মুখে শুনি—

"বঁধু কি আর বলিব তোরে।
অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া রহিতে না দিলি ঘরে।
(এবার) কামনা সাগরে সিনান করিয়া সাধিব মনের সাধা।
(আমি) মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন তোমারে করিব রাধা॥
(তখন) পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব রহিব কদম্ব মূলে।
(আবার) ত্রিভঙ্গ হইয়া বাঁশরী বাজাব যখন যাইবে জলে॥
(সেই) বাঁশরী শুনিয়া মোহিত হইবে সহজ কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কহে তখনই বুঝিবে পিরীতি কেমন জ্বালা॥

এগান শুনে সব ভুল হয়ে যায়। কপিল, গৌতম, শঙ্কর সকলেই মন হতে নিঃশব্দে সরে যান। থাকে এক লোভনীয় বেদনামধুর আনন্দ। শত যুক্তিতেও তাকে মিথ্যা বলতে মন চাইবে না।

হৃষীকেশে

ভোরে হরিদ্বারে গাড়ি বদল করে বেলা আটটায় হৃষীকেশে পৌঁছে গেলাম। স্টেশন থেকে প্রায় এক মাইল দূরে কালীকমলীর ধর্মশালায় গিয়ে ম্যানেজারের সাথে দেখা করে জানালাম—আমি পুরী থেকে আসছি। এখানে নির্জনে থেকে সাধন-ভজন করতে চাই। অতএব অনুগ্রহ করে আমার যথোপযুক্ত ভবন, ভোজন ও ভজনের ব্যবস্থা করতে আজ্ঞা হয়।

ম্যানেজারটি পাঞ্জাবী। তাঁর হিন্দীও আমি বুঝিনে, আমার বাঙ্গালী হিন্দীও তিনি বোঝেন না। কিছুক্ষণ ভাষার ধস্তাধস্তি করে শেষে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলাম—তিনি ইংরেজী জানেন কিনা। এক মুহূর্তে ভাষার ফাসাদ মিটে গেল। তিনি সমস্ত শুনে আমাকে পাশের ঘরে গিয়ে, প্রয়োজনীয় তথ্য লিখিয়ে দিতে বললেন।

তাঁর কথামত পাশের ঘরে গেলাম। সেখানে যে সমস্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হল, তার কোনও উত্তরই আমার জানা নেই। আমাদের দেশে সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে বহু সম্প্রদায় আছে। এক একটা সম্প্রদায়ের শাখা, প্রশাখাও বহু। প্রত্যেকের পরিচয়জ্ঞাপক সাঙ্কেতিক পরিভাষা অর্থাৎ code আছে। সে কোড-ও বিস্তৃত। আমি তার কিছুই জানিনে। একে আমি চোদ্দ পয়সার সন্ন্যাসী, তাতে মাত্র দেড় মাস হল ভোল বদলিয়েছি। এ পর্যন্ত কোনও জাত সন্ন্যাসীর কাছে থেকে শিক্ষানবিশী করিনি। তারপর সন্ন্যাসীদের কোড কোনও বই বা অভিধানেও লেখা নেই। কাজেই কি করে জানব?

অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর মুখে শোনা যায়, ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখক সাধুবাবাদের লেখায়ও পাওয়া যায় যে, তাঁরা হৃষীকেশে কালীকমলীর গদিতে যেয়ে অর্দ্ধচন্দ্র প্রাপ্ত হয়েছেন। তার আসল কারণ হচ্ছে, তাঁরাও আমারই মত ভূঁইফোড় সাধু। কোনও জাত-সাধুসম্প্রদায়ের কোড জানা না থাকায় অথবা জানা কোডে ভুল থাকায়,

ভূঁইফোঁড়ত্ব ধরা পড়ে গেছে। ফলে এই সমস্ত সৎ-প্রতিষ্ঠানে পাত্তা মেলেনি।

আমার ভাগ্যে কিন্তু অন্যপ্রকার ঘটল। প্রশ্নের সম্মুখে বেকুফ হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে দেখে, কেরানীটি উঠে ম্যানেজারের ঘরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে একটা অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরে আমাকে যেতে হল। সে ঘরে একখানা গোল টেবিল ঘিরে চারখানা গদীআঁটা চেয়ার ছিল। দেখলাম, ঘরে ম্যানেজার আর সেই কেরানীটি আছেন। আমি যেতেই ম্যানেজার একখানা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন।

আমি বসলে ম্যানেজার বললেন—বাঙালীবাবু, আপনি ভয় পাবেন না। আমি বুঝেছি আপনি একজন পলিটিক্যাল এ্যাবস্কণ্ডার (রাজনৈতিক ফেরারী); আত্মগোপনের জন্য এখানে এসেছেন। আপনি যেমন ইংরেজ বিদ্বেষী, আমি আপনার চাইতেও বেশী বিদ্বেষী। ইংরেজ সরকার আপনার পরিবারবর্গের কোনও ক্ষতি করেছে কি না তা আমি জানিনে। কিন্তু ঐ ইংরেজ আমায় সর্বস্বান্ত করেছে। সিপাহী বিদ্রোহ থেকে আরম্ভ করে, আমার বড় ঠাকুরদাদা, ঠাকুরদাদা ও পিতাঠাকুর, তার সাথে আমাদের বংশের স্ত্রীপুরুষ সকলে ইংরেজ ও তাদের অনুগৃহীত অনুচরদের হাতে যে নির্যাতন ভোগ করেছে, তা শুনলে আপনি শিউরে উঠবেন। একবার দু'বার নয়, সেই ১৮৫৭ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯১০ সালের মধ্যে আটবার ঐ ইংরেজ আর তার দেশী অনুচর কুত্তাগুলো আমাদের পারিবারিক জীবন ধ্বংস করে, বংশের ছোট ছেলেমেয়েদের অনাথ অবস্থায় পথে বের করে দিয়েছে। আমার ঠাকুরদাদা ছিলেন জমিদার, আর আমি আজ চাকরি করে খাই।

বলতে বলতে ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে উঠে পায়চারি করতে লাগলেন। উত্তেজনায় চোখমুখ অস্বাভাবিক লাল হয়ে গেল। হাত দু'খানা পিছনে ধরে নীরবে পাঁচ সাতবার পায়চারি করে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে, যেন নিজের মনেই বলে চললেন—বেশ, আমি যতদূর পারি আপনাকে সাহায্য করব। বাঙালীর মাথা আর পাঞ্জাবীর সবল

বাহু, ভারতের দুই প্রান্তের এই দুটি যেদিন একত্র হবে, সে দিন অসাধ্য-সাধন করবে। বাঙালীবাবু, আপনি নিশ্চিন্ত হন। আমি আপনার চাকর, আপনি আমার দোস্ত্। যান এই বাবুর সাথে, আপনার সমস্ত ঠিক করে দেবে।

কেরানীটিকে বললেন—এঁকে থানেশ্বর মঠের কোড্ অনুযায়ী সমস্ত লিখে নেবেন, কারণ সেটাই নিরাপদ হবে। কোনও প্রশ্ন উঠলে আমরা তার উত্তর দিতে পারব। স্বর্গদ্বারের গদীতে আজই চিঠি দিন। ভাল জায়গায় টাপোর বসিয়ে, যা যা প্রয়োজন সমস্ত ঠিক মত দিয়ে দিতে লিখে দেবেন। বাঙালী সন্ন্যাসী যে প্রকার খেতে চান, সেই প্রকার খাদ্য দু'বেলা তাঁর কুঠিতে পৌঁছে দিতে লিখবেন। আর বাজার হতে একজোড়া রঙিন চশমা কিনে এনে এঁকে দিন।

আমার দিকে ফিরে বললেন—আপনি ট্যারা। ট্যারা মানুষ চোখের জন্যেই ধরা পড়ে। যখন বাইরে যাবেন, তখন চশমা পরে বেরোবেন। অপরিচিত কারও সাথে আলাপ করবেন না। আমি আপনাকে ব্রহ্মচারী যোগী বলে প্রচার করব।

সমস্ত কথা ইংরেজীতেই হল। এরকম লোককে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে মৌখিক ধন্যবাদ দেওয়া চলে না। তাঁর হাতখানা চেপে ধরলাম মাত্র।

আজ এই কাহিনী লিখতে বসে, বার বার একটা প্রশ্ন মনে জাগছে, কালীকমলীর গদীর ম্যানেজার যে সেদিন বলেছিলেন—'বাঙালীর মাথা আর পাঞ্জাবীর সবল বাহু, ভারতের দুই প্রান্তের এই দুটি যখন একত্র হবে, তখন অসাধ্য সাধন করবে।' সেইজন্যই কি ভারতে সাম্প্রদায়িক ভেদবাদ আমদানী এবং সুপরিকল্পিত উপায়ে সে বাদ পরিপুষ্ট করে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বমুহূর্তে, এই দুটি দেশ বিভক্ত করে, দুটি জাতিকে ছন্নছাড়া নিঃস্ব করা হল? আর যদি তাই হয়, তবে কার স্বার্থে?

সেদিন ধর্মশালায়ই থেকে গেলাম। ম্যানেজারের বাসা থেকেই খাবার এল। অপরাহ্নে গদীতে যেয়ে শুনলাম, স্বর্গদ্বারে আমার ব্যবস্থা পরদিন সন্ধ্যার মধ্যেই হয়ে যাবে। যে সময়টা হৃষীকেশে থাকব, তার

মধ্যে জায়গাটা একটু ঘুরে দেখে নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই, ম্যানেজার একজন লোক দিলেন। দেখার মত বিশেষ কিছুই নেই। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে শ্রীহৃষীকেশের মন্দির, আর সেখানে গঙ্গারঘাটে অজস্র মহাশোল মাছ দেখে, সন্ধ্যার পূর্বে ধর্মশালা থেকে যে রাস্তা সোজা গঙ্গার ধারে গিয়েছে সেই রাস্তা ধরে একটু বালির চড়া ভেঙ্গে, গঙ্গার তীরে এসে বসলাম। সেখানে বসে সেদিন অস্তগমনোন্মুখ সূর্যকিরণ-সমুজ্জ্বল পার্বত্য দৃশ্য যা দেখেছিলাম, তা ভাষায় বর্ণনা করার মত সামর্থ্য আমার নেই।

বহুবার অনুভব করেছি, কোনও কিছুর বর্ণনা শুনে, পড়ে, বা ছবি দেখে, পরে যখন বাস্তবে সেটা দেখার সুযোগ হয়েছে, তখন হতাশ হয়ে পড়েছি। এমন যে তাজমহল, সেও প্রথম দর্শনে আনন্দ দিতে পারেনি। ছবি দেখে, বর্ণনা পড়ে, তাকে ঘিরে মনের মধ্যে কল্পনারাজ্যে যে রঙিন তাজমহল জমাট বেঁধেছিল, বাস্তবে তার প্রথম দর্শন মাত্রেই সে স্বপ্ন ভেঙ্গে যেয়ে হতাশা এসে গেল। আমার মনে হয়, কোনও সুন্দর জিনিসের বর্ণনায় 'সেটা বড় চমৎকার' এই বলে রাখলেই ভাল হয়। তাতে করে পরবর্তী ভোক্তা বা দর্শক অনেক বেশী আনন্দ পাবেন। বাস্তব জগৎ বাস্তবই। ওর প্রত্যেকটি পদার্থ ভাল আর মন্দ এই দ্বন্দ্ব সমন্বিত। আমরা যখন কোনও কিছুর স্বরূপ বর্ণনা করি, তখন হয় তার সবটাই সুন্দর করে ফেলি, নয় তো সবটাই অসুন্দর করে তুলি। ফল হয় এই যে, যাঁরা সেই বর্ণনা শুনে বা পড়ে পরে সে পদার্থের সম্মুখীন হন, তখন তাঁদের মনে বস্তুটির একটা দিকের প্রস্তুতি থাকায়, অপর দিকটা চোখে পড়ে বিব্রত করে ফেলে। তবে বর্ণনার উদ্দেশ্য যদি বস্তু-পরিচয় না হয়ে কেবল কাব্যরসসৃষ্টি হয়, তা হলে আপত্তির কিছু নেই।

হৃষীকেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা পূর্বে পড়া ছিল। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় গঙ্গার তীরে বসে, যে অপূর্ব গম্ভীর দৃশ্য দেখলাম, তা সমস্ত কল্পনা ছাড়িয়ে গেল। অবাক্ হয়ে সেই পার্বত্য গঙ্গা ও সূর্যকিরণোজ্জ্বল পর্বতমালা দেখতে দেখতে যেন ডুবে গেলাম। হঠাৎ আমার সঙ্গী বলে উঠল, ঐ দেখুন আজ একজন মহাত্মা বেরিয়েছেন।

যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে গঙ্গার পূবতীরে একটা বেশ বড় পাহাড়। সেই সুদূর কালে ভগীরথের প্রযত্নে গঙ্গাদেবী যখন স্বর্গ থেকে নেমে ভারতভূমি ধন্য করে প্রবাহিতা হন, তখনই বোধহয় পাহাড়টার এক অঙ্গ ভেঙ্গে পথ করে নিয়েছেন। পাহাড়টাও নৃত্য-চঞ্চলা সুন্দরী গঙ্গার এ আব্দার মেনে নিয়ে, এযাবৎ তাঁকে কাছেই রেখেছেন। নিজের ভাঙা দেহ সুস্থ করার জন্য আর তাঁকে সরিয়ে দেননি।

পূর্ববঙ্গে পদ্মানদীর ভাঙনপাড়ির তলে যেমন গাঙ-শালিকের গর্ত থাকে, ঠিক সেই প্রকার এই পাহাড়টার ভাঙা জায়গায় কয়েকটা গুহা, এপার থেকে বেশ দেখা যায়। তারই একটা গুহার সম্মুখে দোকানের কুলুঙ্গীর গণেশের মত এক সাধু বসে আছেন। মুখে তাঁর দাড়ি, মাথায় বিশাল জটাভার।

সঙ্গীর নিকটে শুনলাম, ঐ জায়গায় কেউ যেতে পারে না। কতকাল ধরে সাধুরা ওখানে আছেন, তাও অজ্ঞাত। আমার সঙ্গী বহুপুরুষ যাবৎ টিহরীর অধিবাসী। সে তার বাপ-ঠাকুরদাদার মুখে ঐ সাধুদের কথা শুনেছে। তাঁরাও তাঁদের বাপ-ঠাকুরদাদার মুখে শুনেছেন, এবং পুরুষানুক্রমে দেখে আসছেন।

আমি বললাম—তুমি বলছ ওখানে কেউ যেতে পারে না। কিন্তু আমার তো মনে হয়, চেষ্টা করলে ওখানে যাওয়া একেবারে অসম্ভব নয়।

সঙ্গী উত্তর দিল—হ্যাঁ, মধ্যে মধ্যে আপনাদের মত বিদেশী কেউ কেউ চেষ্টা করে থাকেন। তবে এপর্যন্ত নানা দুর্ঘটনা ঘটে, তাঁদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তাতে মনে হয়, ঐ সাধুমহাত্মাদের ইচ্ছা নয় যে, কেউ তাঁদের নিকটে যায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হলে মহাত্মা তাঁর গুহায় অদৃশ্য হলেন। আমরা এপার থেকেই প্রণাম জানিয়ে, শ্রীহৃষীকেশের মন্দিরে আরতি দেখে ধর্মশালায় ফিরলাম।

পরদিন অপরাহ্ণ তিনটায় আমার পূর্বদিনের সঙ্গীর সাথে লছমন-ঝোলার পথে স্বর্গদ্বার আশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

স্বর্গদ্বারে

হৃষীকেশ থেকে স্বর্গদ্বার আশ্রম প্রায় তিন মাইল পথ। পথে লছমনঝোলায় ঝুলনো সাঁকোয় গঙ্গা পার হতে হয়। সুন্দর রাস্তা। লছমনঝোলা পর্যন্ত বাঁয়ে সুউচ্চ টিহরা পর্বত ডাহিনে কল্লোলিনী গঙ্গা। পথ চলেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে বহু সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রম। পথটা অল্প চড়াই হলেও চলতে কষ্ট হয় না, দুধারের মনোরম দৃশ্যই চড়াইএর কথা ভুলিয়ে রাখে।

প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই বিখ্যাত লছমনঝোলা সেতুর নিকটে পৌঁছে গেলাম। লছমনঝোলার বর্ণনা অনেক শুনেছি, পড়েছিও। বাস্তবে তার সম্মুখীন হয়ে, প্রথম দর্শনেই একটু ভাল করে দেখার লোভ চেপে রাখতে পারলাম না। সঙ্গীকে বলতেই সে মহা উৎসাহে সেতুর ওপরের পাহাড়, নীচের গঙ্গাতীর, ডাইনে, বাঁয়ে ঘুরে ঘুরে যত কিছু দেখার মত আছে, সব দেখালো। দেড় ঘণ্টা ঘুরে পাহাড়ে পথে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লেও আমার সঙ্গীর উৎসাহের বিরাম নেই। তার মাতৃভূমির গৌরবের বস্তু বিদেশী আমাকে দেখিয়ে, সে বস্তুর কাহিনী শুনিয়ে, আমার মুখে একটু প্রশংসা শুনতে চায়। তার জন্য এই পাহাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম গণনীয়ই নয়। তার ভাষা যে আমি ভাল বুঝিনে, তা বুঝে আমাকে সকল কথা বুঝবার জন্যে দেখলাম তার আকুল চেষ্টা। এই ভাবটা বোধ হয় সর্বত্রই একপ্রকার।

'বোধ হয়'—বলছি তার কারণ—আজ এই ১৯৬১ সালে পৌঁছে যতদূর মনে পড়ে, তাতে আমার ফেলে আসা সুদীর্ঘ পথের দু'ধারে, ভারতের বহু প্রদেশের অধিবাসীদের আলাপ আলোচনা শুনেছি। হয়তো ভাষার পার্থক্যে তার অনেক কথাই বুঝিনি। তথাপি যেটুকু বুঝেছি, তাতে বিপুল সংখ্যক তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালী, আর কতিপয় বড় বড় ভারতীয় নেতা ছাড়া, বিদেশীর নিকটে বা বিদেশী শুনতে পায় এমনভাবে, নিজের জাতি, ধর্ম, পূর্বপুরুষ ও জাতীয় নেতাদের

নিন্দামূলক সমালোচনা কেউ করে না। বরং যদি কোনও বিদেশীর মুখে সে প্রকার কিছু শোনে, বা লেখায় পড়ে, তবে সাধ্যমত তার প্রতিবাদ করে।

এই বৎসর দুই পূর্বে, ১৯৫৮ সালে, আমি আর এক অধ্যাপক আসাম যাচ্ছিলাম। মনিহারীঘাটে লিঙ্ক এক্স্প্রেসে দুজনে উঠেছি। যে গাড়িখানায় উঠলাম, তাতে আমরা আট-দশজন বাঙ্গালী আর দুজন অসমীয়া ভদ্রলোক ছিলাম। মনিহারীঘাট হতে ট্রেন ছাড়লে, কয়েকজন বাঙালী ভদ্রলোক অসমীয়া দুজনের সাথে আরম্ভ করলেন আলাপ। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম, আলাপী কজনই সবজান্তা। শ্রুতিকটু যতরকম শব্দ আছে, তার মধ্যে সবজান্তার আলোচনা শোনার মত কাণের দুর্ভোগ, বোধহয় মাইকের লাবেলাম্বাও নয়। বাক্ ও বাক্-স্বাধীনতার যুগে নিরুপায় আমি, জানলা দিয়ে মাথা গলিয়ে ইঞ্জিনের শব্দে কান আর প্রাকৃতিক দৃশ্যে চোখ ভরানোর চেষ্টা করলাম। তাতেও বাদ সাধল কয়লার কুচি চোখে ঢুকে। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে যখন চোখের যন্ত্রণাটা কমে এসেছে তখন কাণে এল আলাপীরা ধর্মতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমস্ত শেষ করে, বাঙালী কজন আরম্ভ করেছেন, বাংলাদেশে মৃত ও জীবিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কার কোষ্ঠীতে কোন্ কুগ্রহের কি অপকীর্তি আছে, তাই খুঁজে বের করতে। এই খোঁজাখুঁজি একতরফা বাঙালী কজনই করছেন। অসমীয়া দুজন হয়েছেন উৎসাহী শ্রোতা।

আর সহ্য হল না। সঙ্গী অধ্যাপকটিকে বললাম—চলুন অন্য গাড়িতে জায়গা পাওয়া যায় কিনা দেখি।

অধ্যাপক হেসে বললেন—অন্য গাড়িতে যেতে হবে না, আমি সব ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি।

এই বলে অধ্যাপক গায় পড়ে আরম্ভ করলেন সেই অসমীয়া দুজনের সাথে আলাপ। কথা প্রসঙ্গে শ্রীহট্টের গণভোট সম্পর্কে কয়েকজন অসমীয়া নেতার বিরুদ্ধ-সমালোচনা করতেই অসমীয়া দুজন বেশ উত্তেজিত হয়ে, তাদের নেতাদের দোষ স্খালনের জন্যে, আবল-

তাবল বকতে লাগলেন। মিনিট পাঁচেক বেশ গরম কথা কাটাকাটির পর অধ্যাপক হাসিমুখে হাতজোড় করে বললেন—দেখুন আপনাদের অসমীয়া নেতাদের বিরুদ্ধ-সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার আসল মতলবটা এইবার খুলে বলি।

অধ্যাপক মহাশয় তার সেই বাঙালী কজনকে লক্ষ্য করে বললেন, —আপনারা দেখুন, এই দুজন অসমীয়া ভদ্রলোক তাঁদের নেতাদের বিরুদ্ধ-সমালোচনা বাঙালী আমার মুখে শুনে, কেমন উত্তেজিত হয়েছেন। আমার কথার প্রতিবাদ করার মত কোনও যুক্তি, প্রমাণ বা তথ্যজ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও, তাঁরা তাঁদের স্বদেশী নেতাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য, কি প্রকার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। আর আপনারা ভারতবরেণ্য বাঙালী নেতাদের কোথায় কি কুৎসা আছে, তাই এই বিদেশী দুজনের নিকটে কীর্তন করে, আপনাদের উদারতা ও স্পষ্ট-বাদীতার বাহাদুরী পেতে চাচ্ছেন। এটা যে আপনাদের কত বড় ভুল, তা এই অসমীয়া ভদ্রলোক দুজনের নিকটে শিক্ষা করা উচিৎ।

শিক্ষা তাঁরা লাভ করেছিলেন কিনা, তা আর আমার জানার সুযোগ ঘটেনি। কারণ তাঁদের সাথে এ পর্যন্তও আর দেখা হয়নি। তবে অধ্যাপক মহাশয়ের এই অপূর্ব কৌশলে, আমিন গাঁ পর্যন্ত গাড়ির ভিতরের শব্দ আর কর্ণপীড়া জন্মায়নি।

লছমনঝোলা দেখে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে স্বর্গদ্বারে বাবা কালীকমলীর সত্রের গদীতে ত হলাম। আগের দিন হৃষীকেশের গদীর ম্যানেজারের নির্দেশ পেয়ে, এই ছোট গদীর ম্যানেজার সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আমাকে দেখে গদীর সকলেই যেন বেশ একটু আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন বলে মনে হল। বোধহয় বড় ম্যানেজারের পত্র পেয়ে, এঁরা একজন দিগ্‌গজ মহাপুরুষ দর্শনের আশায় বসেছিলেন।

পাকা কুঠি খালি ছিল না। সেজন্য কাঁচা কুঠি—অর্থাৎ বাংলাদেশে ঘরের মাথার টোপরের মত কুশ দিয়ে তৈরী একটা টাপোর আশ্রমের আম বাগানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। টাপোরের ভিতরের ব্যাস প্রায় আট ফুট। জানলার মত একটা ছোট দরজা। তিনখান

তক্তা পেতে তার ওপরে কুশের গদী ও দুখান কম্বল বিছিয়ে বিছানা করা হয়েছে। তামার কলসীতে জল, লোটা প্রয়োজনীয় সমস্ত আছে।

ভিতরে ঢুকে বেশ ভালই লাগল। আমার মনে হয়, পাকা কুঠি অপেক্ষা এই টাপোরই ভাল। রাত্রি ন'টায় খাবার এল, আটখানা পুরি, আচার, দুটো লাড্ডু, আধ সের দুধ। খেয়ে রাত্রিটা এক ঘুমে কেটে গেল।

পরদিন প্রাতে ম্যানেজার এসে জানতে চাইলেন আমার কি লাগবে। তাঁর মুখে শুনলাম, দিনে বেলা এগারটায় সত্রে সাধুসন্ন্যাসী, অতিথিদের খাবার দেওয়া হয়। ঐ সময়ে সত্রে ঘণ্টা বাজলে প্রায় সকলেই যার যার প্রয়োজন মত খাদ্য নিয়ে আসেন। কোনও কোনও মহাত্মার খাদ্য তাঁর কুঠিতেই পৌঁছে দেওয়া হয়। আমার খাদ্যও কুঠিতেই পৌঁছাবে। দিনের খাদ্য সাধারণত ঘি মাখানো চারখানা রুটি ওজন প্রায় তিন পোয়া, আধপোয়া চালের ভাত, একছটাক ঘি, একপোয়া দই, ডাল, শাক চিনি। রাত্রের খাদ্য যা পূর্বরাত্রে পেয়েছিলাম তাই। এই সাধারণ তালিকা ছাড়া আর আমার কি লাগবে, ম্যানেজার জানতে চাইলেন।

আমি জানালাম, যে খাদ্য তাঁদের সাধারণ তালিকায় আছে, তাই আমি খেয়ে উঠতে পারব না। আমার আর কিছুই প্রয়োজন হবে না। তবে যদি দু'একখানা বই দিতে পারেন ভাল হয়।

ম্যানেজার জানালেন, সত্রে কিছু হিন্দী বই আছে। সংস্কৃত গ্রন্থ হৃষীকেশের গদীতে আছে। ইংরেজী বা বাংলা বই নেই।

আমি 'রামচরিত মানস' বইখানা থাকলে পাঠাতে বললাম। পরদিন খোঁজ করে পাঠাবেন বলে বেশ খুশী মনেই ম্যানেজার বিদায় হলেন।

এই ম্যানেজারটি গোরখ্‌পুর জেলার অধিবাসী ব্রাহ্মণ, বয়স ষাটের কোঠায়, বেশ অমায়িক এবং আলাপী। তাঁর হিন্দী বুঝতে আমার বেশী অসুবিধে হয় না। আমার হিন্দীও তিনি বোঝেন। ক্রমে

তাঁর সাথে আলাপ জমে গেল। তাঁর মুখে শুনলাম, স্বর্গদ্বার আশ্রমের অধিবাসী সাধু মহাত্মাদের অদ্ভুত আচার ব্যবহারের কথা।

হৃষীকেশ স্বর্গদ্বারে এমন সমস্ত মহাত্মা আছেন, যাঁরা দিনে বিশ পঁচিশখানা রুটি দেড়পোয়া ঘি, আর আধসের চিনি খান। রাত্রে লাগে পাঁচ ছয় ডজন পুরি, আর পাঁচসের দুধ। আনুসঙ্গিক ডাল তরকারি তো আছেই। এছাড়া রকমারি খাদ্য গ্রহণকারী সাধুও কয়েকজন আছেন।

আমার কুঠির নিকটেই ছিলেন এক আড়াই সেরী মহারাজ। তাঁর একটা কিস্তি ছিল, সেটায় আড়াই সের খাদ্য ধ'রত। তিনি সেই কিস্তি পূর্ণ ক'রে খাদ্য গ্রহণ ক'রতেন। রাত্রে এক কিস্তি দুধ খেতেন।

হরেক্‌কিসিম্ মহারাজ রবিবারে উপবাস করেন। সোমবারে মিছরির সরবৎ চার সের, মঙ্গলবারে মাড়ভাত ও ঘি তিন সের, বুধবারে ফলের রস তিন সের, বৃহস্পতিবারে টাটকা কাঁচা দুধ চার সের খান।

মরিচা মহারাজ খান রোজ এক সের নির্জলা কাঁচালঙ্কার রস, আর আধসের ঘি। আর কোনও খাদ্যই গ্রহণ করেন না। এই লঙ্কার রস করার জন্য কাঠের যন্ত্র তৈরী করা হয়েছে। এক সের লঙ্কার রস মানে আধমন পঁচিশ সের কাঁচা লঙ্কার রস। এদেশে বছরের সব সময় কাঁচা লঙ্কা পাওয়া যায় না। তার জন্য ভারতের যে প্রদেশে যখন কাঁচালঙ্কা পাওয়া যায়, সেখান হতেই রেল পার্সেলে কাঁচালঙ্কা আনা হয়।

এ ছাড়া কেবলমাত্র ফল বা ফলের রস খেয়েও অনেকে থাকেন। কেউবা কেবলমাত্র ঘি আর চিনি খান। কেউ খান কেবল কাঁচা দুধ। বছরের পর বছর এই প্রকার ভাবে এঁরা কাটিয়ে দেন। ব্যাধি পীড়া এদের হয় দেহত্যাগের দু'একদিন পূর্বে। কোনও কোনও মহাত্মার তাও হয় না, এমনি একদিন সকলের অজ্ঞাতে দেহ ত্যাগ করে যান।

এই সমস্ত বড় বড় মহাত্মাদের প্রকৃত পরিচয় জানার কোনও উপায় নেই। হৃষীকেশের প্রধান গদীতে এঁদের পরিচয় লেখা থাকলেও, তা সাধারণে প্রচার করা হয় না। স্থানীয় অধিবাসীরা সাধু মহাত্মাদের আচার ব্যবহার ও আকৃতি প্রকৃতি দেখে এক একটা নাম দিয়ে নেয়।

গঙ্গার পশ্চিমপারে, হৃষীকেশের উত্তরে, একটা খয়ের বন আছে। সে বনেও অনেকগুলি সাধু মহাত্মা থাকেন। কেশবানন্দজী নামে এক মহাত্মাকে সে সময় আমি ঐ বনে দেখেছিলাম। তাঁর সাধন ছিল অদ্ভুত। রাত্রি চারদণ্ড গতে তিনি গঙ্গার তুষার-শীতল জলে নিমজ্জিত থাকতেন; উঠতেন সূর্যোদয়ের দেড়ঘণ্টা পূর্বে। দিনে এক প্রহর গতে গঙ্গার তীরে বালির চড়ায় দাঁড়িয়ে, সূর্যের সাথে দৃষ্টি সংযোগ করতেন। সে চোখে পলক পড়ত না। এক প্রহর বেলা থাকতে সূর্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। পুরো সাতফুট লম্বা, কালপাথরের মত গায়ের রঙ, বিরাট শক্তিশালী পুরুষ। তাঁর একটি বিভূতির কথা ঐ সময়ে হৃষীকেশের গদীর ম্যানেজারের মুখে শুনেছিলাম। ঘটনাটি আমি যখন স্বর্গদ্বারে ছিলাম তখনই ঘটে।

১৯২৬ সালের আগস্ট মাসে গাড়োয়াল-টিহরীরাজ্যের ইংরেজ রেসিডেন্ট সাহেব লণ্ডন থেকে টেলিগ্রাম পেলেন, তাঁর একমাত্র পুত্র লণ্ডনের রাস্তায় দুর্ঘটনায় পড়ে সাংঘাতিক আহত হয়ে হাসপাতালে গিয়েছে। সাহেব ব্যস্ত হয়ে সস্ত্রীক এসে ধরলেন হৃষীকেশে কালী-কমলীর গদীর ম্যানেজারকে। ম্যানেজার তাঁদের নিয়ে গেলেন কেশবানন্দজীর নিকটে। আজকাল যেমন কলকাতায় মাঠে বড় খেলা হলে রেডিওতে খেলার সময়ই বিবরণ প্রচারিত হয় ঠিক সেই ভাবে কেশবানন্দজী, তৎকালে লণ্ডন হাসপাতালে সাহেবের পুত্রের কি ঘটছে তা বর্ণনা করে গেলেন। ঐ সময়ে হাসপাতালে ছেলেটির পায়ে অস্ত্রোপচার হচ্ছিল। সেই অস্ত্রোপচারে কজন ডাক্তার ও নার্স, তাদের বেশ ভূষা, ঘরের বর্ণনা, কেমন করে কোথায় ছুরি বসানো হল, কখানা ভাঙা হাড় বের করে ফেলে দেওয়া হল, শেষে তাকে কোন্ ঘরে রাখা হল, সমস্ত শুনিয়ে দিলেন। দিন পনের পরে সাহেব এসে জানিয়ে গেলেন, মহাত্মার সব কথা মিলেছে। সাহেব পত্র পেয়েছেন।

* * *

স্বর্গদ্বারে বেশ আছি। কোনও হাঙ্গামা নেই। চমৎকার শান্ত পরিবেশ। অপরাপর কুঠিতে যে সমস্ত সাধু মহাত্মা আছেন তাঁরা

সকলেই নিজ নিজ সাধন নিয়েই থাকেন। আমার মত ভণ্ড বোধহয় আর একটিও নেই। পথে কারও সাথে দেখা হলে 'নমঃ নারায়ণায়' অথবা 'র‍্যাম রাম' বলে অভিবাদন করা ছাড়া কেউ কাকেও কিছু বলে না। সন্ধ্যায় সত্রের সম্মুখে গঙ্গার ঘাটে যেয়ে বসি। ঐ সময়ে আরও কয়েকজন মহাত্মা এসে বসেন। তাঁরা হিন্দী ও সংস্কৃতে পরস্পর আলাপ করেন। আমি বসে বসে তাঁদের সে আলাপ শুনি, কিছু বুঝি, কিছু বুঝিনে। যতটুকু বুঝি, তাতে ঐ সমস্ত সাধু মহাত্মাদের মধ্যে বহু সম্প্রদায় এবং সাধন পদ্ধতির পার্থক্য আছে। তাঁরা পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে, পরস্পরের মতবাদ বুঝতে চেষ্টা করেন। সে আলোচনায় কোনও আক্রমণ নেই, বাজে তর্কও নেই। আছে পরস্পরের মতবাদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধ।

প্রত্যহই কিছু কিছু তীর্থযাত্রী আসেন। মধ্যে মধ্যে সখের ভ্রমণকারীও আসেন। তাঁদের বেশীর ভাগই সাধুমহাত্মাদের কুটিরের দিকে তাকাতে তাকাতে চলে যান। অল্প কিছু কৌতূহলী কুটিরের নিকটে এসে উঁকিঝুঁকি দেন, কিন্তু কোনও উপদ্রব করেন না। সখের ভ্রমণকারীরা পথে যদি দীর্ঘ জটাধারী কোনও সাধু দেখেন, তবে তাঁর জটের ফটো তুলেই সন্তুষ্ট হন।

কোনও কোনও ধনী তীর্থযাত্রী সাধু-সেবার জন্য, তাঁদের কুটিরের দ্বারে নানাপ্রকার ফল, মেওয়া, কাপড়, কম্বল, টাকাপয়সা রেখে নীরবে চলে যান। সাধুমহাত্মারা ও সব স্পর্শই করেন না। তীর্থযাত্রীর দান ফল, মেওয়া পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা কুড়ায়, অথবা বানর, গরুতে খায়। কাপড়, কম্বল, টাকাপয়সা সত্রের জমাদার নিয়ে সত্রে জমা দেয়।

মেওয়া কাকে বলে তা হয় তো বাঙালী আমরা অনেকেই জানিনে। কাজুবাদাম, কাঠবাদাম, আখরোট, পেস্তা, কিসমিস আর সুঁদিনারকেল কুচি সমান ভাগে মিশালে মেওয়া হয়। এই মেওয়া এক এক কুটিরের দ্বারে দু'তিন সেরও পড়ে।

এ অঞ্চলে অনেক বাঘ আছে। ডোরাকাটা বড় বাঘই বেশী। রাত্রে প্রায়ই বাঘের ডাক শোনা যায়। সাধুমহাত্মারা শেষ রাত্রে

উঠে, দূরে পাহাড়ের ধারে পায়খানা যান। কিন্তু কোনও দিন কোনও সাধু আক্রান্ত হয়েছেন বলে শোনা যায় না। তাই বলে আমি কিন্তু প্রভাত না হলে দুয়ার খুলতাম না।

এমন যে সুন্দর স্থান, এমন যে শান্ত পবিত্র পরিবেশ, সেখানেও মাঝে মাঝে এক অদ্ভুত ধরনের উপদ্রব দেখা দেয়। সে উপদ্রব কোনও সংক্রামক ব্যাধি বা জীবজন্তু, পোকামাকড়ের নয়। সেটা একশ্রেণীর সাধু ও ভক্তের উপদ্রব।

এই উপদ্রবকারী সাধুবাবারা বহু দূরদেশ থেকে খোঁজ নিয়ে আসেন, কোন রাজা, জমিদার, ধনী, শেঠ, হৃষীকেশ স্বর্গদ্বারে কোন মহাত্মার ভক্ত। তারপর খোঁজ করে সেই মহাত্মার কুটিরদ্বারে এসে, ঐ ধনী ভক্তের বরাবর একখানা সুপারিশ পত্র প্রার্থনা করেন। উদ্দেশ্য তাঁদের অতি মহৎ। সিদ্ধমহাত্মার সুপারিশে, সাধুবাবা যদি ঐ ধনী ভক্তটিকে পাকড়াও করতে পারেন, তবে একটা মঠ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে, শোকতাপজর্জরিত অজ্ঞানান্ধ নরনারায়ণের সেবা করে নিজের জীবন ধন্য করবেন।

ভক্তেরা আসেন মহাত্মাদের নিকট হতে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধির সহজ অব্যর্থ ঔষধ শিক্ষার জন্যে। অথবা তামা বা পারা দিয়ে সোনা তৈরীর সহজ উপায় শিখতে। উদ্দেশ্য ঐ পূর্বোক্ত সাধুবাবাদেরই মত মহৎ।

এই সমস্ত সাধু, ভক্তেরা প্রথম হাতজোড় করে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা জানান। তারপর সুযোগ পেলে সাপের মত মহাত্মার চরণ জড়িয়ে ধরেন। শেষ পর্যন্ত কুটিরদ্বারে কঠোর অনশন সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন। পাঁচ সাত দিন পরে পাহাড়ীরা সত্যাগ্রহী সাধুবাবাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে, তিন চার মাইল দূরে ফেলে দিয়ে আসে।

আমি বিশেষ অনুসন্ধান করে যতদূর জানতে পেরেছি, তাতে এই সমস্ত সত্যাগ্রহীরা কোনও কালেই কৃতকার্য হতে পারেন না। তা সত্ত্বেও এ উপদ্রব প্রায়ই দেখা দেয়। তার কারণ যা শুনেছি তা আমাদের সকলেরই জেনে রাখা ভাল।

এই সমস্ত মানবপ্রেমিক সাধুভক্ত বাবাজীরা, হৃষীকেশ স্বর্গদ্বারের মহাত্মাদের নিকটে ব্যর্থ হয়েই যে একেবারে হাল ছেড়ে দেন তা নয়। অনেক সময় জাল সুপারিশ পত্রও ধরা পড়ে। হিমালয়ের সিদ্ধমহাপুরুষ প্রদত্ত সর্বরোগহর মহৌষধীরও অভাব নেই। কাজেই নতুন আবিষ্কারা-ভিলাষীর অভাব কোনও কালেই হয় না। অতএব উপদ্রবটা চিরকালই থাকবে।

একদিন সন্ধ্যায় সত্রের ঘাটে বসে মহাত্মাদের আলাপ শুনছি। এমন সময় ষাট পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স্ক এক দীর্ঘকায় বলবান পুরুষ এসে, দূর থেকে প্রণাম করে, সাধুমহাত্মাদের চরণে তার দুঃখের কাহিনী জানিয়ে, প্রতিকার প্রার্থনা করল। লোকটি জাতিতে রাজপুত, মধ্যপ্রদেশে বেরারের অধিবাসী। বাল্যকালে পিতামাতা হারিয়ে সহায় সম্বল কিছু না থাকায় চুরি করত। বড় হয়ে ডাকাতের দলে যোগ দেয়। এ পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ বৎসর জেল খেটেছে। শেষবারে নরহত্যা ও ডাকাতির অভিযোগে দশ বৎসর জেল খেটে এখানে এসেছে, তার মত পাপীর উদ্ধারের উপায় কোনও মহাত্মা করেন কিনা তাই জানতে।

দেখলাম, তার অকপট করুণ আবেদনে মহাত্মারা সকলেই সাড়া দিলেন। বললেন—বেটা ডর মৎ। গঙ্গাজীমে হররোজ স্নান কর। রামজীকো নাম লেও। ইঁয়া পর রহা যাও। সব কুছ্ ঠিক হো যায়েগা।

তারপর যতদিন আমি স্বর্গদ্বারে ছিলাম দেখতাম, বেলা একটায় একবার সে মহাত্মাদের কুটিরের পথ দিয়ে "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিত পাবন সীতারাম।" গাইতে গাইতে ঘুরে যেত। মহাত্মারা তাঁদের ভুক্তাবশিষ্ট রুটি ইত্যাদি কিছু কিছু দিতেন। নিজ মুখে কারও কাছে কিছু চাইত না। রাম নাম গান ছাড়া আর কোনও কথাই বলত না। লছমনঝোলার পশ্চিমপারে একটা মন্দিরের বারান্দায় আশ্রয় নিয়ে, সব সময় রাম নাম গাইত।

১৯৩৭ সালে দ্বিতীয়বার আমি লছমনঝোলা যাই। তখনও সে ঐখানেই ছিল। মুখে দাড়ি, মাথায় জট, প্রশান্ত মুখমণ্ডল

দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত। লোকে নাম দিয়েছে, রাম ভকত মহারাজ। কে বলবে এই ব্যক্তি ডাকাতি নরহত্যার দায়ে দশ বৎসর জেল খেটে, এগার বৎসর পূর্বে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে! অদ্ভুত মহৎরূপ, চমৎকার মহিমা ভগবৎ নামের।

সদানন্দ অবধূত

স্বর্গদ্বারে প্রথম মাসটা ভয়ে ভয়েই কেটে গেল। কি জানি কোথাও যদি সি. আই. ডি-র নজরে পড়ে যাই! ক্রমে সাহস বাড়তে লাগল। প্রতিদিন সন্ধ্যার এক ঘন্টা পূর্বে বেড়াতে যাই। মধ্যে মধ্যে লছমনঝোলা পার হয়ে পশ্চিম ধারেও যাই। লছমনঝোলার উত্তরে পাহাড়ের গায়ে ছোট একখানা বাংলো। বাংলোর সম্মুখে ছোট বাগান, বড় বড় গোলাপ ফুলে ভরা। রাস্তা থেকে উপরে প্রায় পঞ্চাশটা সিঁড়ি ভেঙ্গে তবে বাংলোয় পৌঁছানো যায়।

বাংলোর বারান্দায় একখানা সোফা। তাতে বসে থাকেন মুণ্ডিত-মস্তক গেরুয়াধারী এক ব্যক্তি। হাতে তাঁর ইংরেজী সংবাদ পত্র। ওদিকে বেড়াতে গেলে প্রতিদিনই ঐ একই অবস্থায় তাঁকে দেখি। তিনিও বোধ হয় আমাকে লক্ষ্য করেন।

প্রথম যে দিন দেখলাম সে দিন মনে সন্দেহ জাগল, বোধ হয় পুলিসের বড়দরের গুপ্তচর, এই সীমান্ত ঘাঁটি আগলে বসে আছে। সত্রের ম্যানেজারের নিকটে অনুসন্ধান করে জানলাম, সাধুটির নাম সদানন্দ অবধূত। ছমাস হল ঐ বাংলোটা গাড়োয়াল সরকার থেকে ভাড়া নিয়ে বাস করছেন। তার পূর্বে কয়েক মাস হরিদ্বারে ছিলেন। হরিদ্বারে ভোলানন্দ গিরি মহারাজের মঠে বেশ পরিচিত। এখানে কারও সাথে মেশেন না। কোন্ প্রদেশে জন্ম স্থান তা ম্যানেজার জানেন না। তবে নাকি খুব বড়লোক, আর বড় আংরেজীওয়ালা।

বুঝলাম সাধুটি তাহলে সি. আই. ডি. নন। কারও সাথে যখন মেলামেশা করেন না, তখন আমি নিশ্চিন্ত মনে তাঁর বাংলোর নীচের

রাস্তা দিয়ে বেড়াতে যাই। কিন্তু প্রাত বারই আমিও তাঁর দিকে তাকাই, তিনিও আমাকে দেখেন।

শেষে একদিন দেখলাম, তিনি নীচে নেমে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি নিকটবর্তী হতেই সন্ন্যাসীদের প্রথা মত 'ওঁ নমঃ নারায়ণায়' বলে আমাকে অভিবাদন করলেন। আমিও প্রত্যভিবাদন জানালাম। তারপর তিনি হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোন্ প্রদেশের অধিবাসী, বাঙালী নাকি?

আমিও হিন্দীতে বললাম—আমি বাঙালী।

তখন তিনিও বাংলায় বললেন, তিনিও বাঙালী। আমি যদি তাঁর আশ্রমে যাই, তবে খুশি হবেন।

তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর আশ্রম বাংলোয় উপস্থিত হলাম। বারান্দায় আর একখানা চেয়ার এসে গেল। চেয়ারে বসে লক্ষ্য করলাম, অনাড়ম্বর ভোগ বিলাসের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই আশ্রম নামক বাংলোয় আছে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা চাকর চা, বিস্কুট আর কিছু আপেলের টুকরো এনে দিয়ে গেল। চা খেতে খেতে কথা আরম্ভ হল। অবধূতই প্রথম প্রশ্ন করলেন—

কতদিন সন্ন্যাসী হয়েছেন?

অল্প কিছুদিন মাত্র।

সন্ন্যাসী হলেন কেন?

তাতে আপনার কি প্রয়োজন বুঝতে পারছিনে।

ওঃ, আপনি চটে গেলেন। আচ্ছা বেশ, তা এখানে আছেন কোথায়?

স্বর্গদ্বারে আম বাগানে এক কুটিরে। কালী কমলীর গদী থেকেই ব্যবস্থা হয়েছে।

বলেন কি! কালী কমলীর গদী আপনার মত সন্ন্যাসীর জন্তে স্বর্গদ্বার আশ্রমে ব্যবস্থা করেছে! কি করে এদের বাগালেন?

এটাও আপনার অবান্তর প্রশ্ন। আমি স্বর্গদ্বার আশ্রম কুটিরে

থাকি। প্রয়োজনীয় সমস্ত কালীকমলীর সত্র যোগায়। এই মাত্র জেনে রাখুন। আর কিছু না জানতে চাইলে অনুগৃহীত হব।

দেখুন আপনার এই আশ্রমে স্থান পাওয়ায় সত্যই আমি বিস্মিত হয়েছি। কারণ, আমি বেশ ভালভাবেই জানি, এরাই শুধু নয়, বাংলার বাইরে অবাঙালীদের কোনও প্রতিষ্ঠানই বাঙালী সাধু-সন্ন্যাসীদের বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। যে সমস্ত বাঙালী পশ্চিমে সাধু-সন্ন্যাসীদের চেলা হয়ে, বহুকাল তাঁদের আশ্রম বা মঠে বাস করে হিন্দুস্থানী বনে যেতে পারেন, তাদের এঁরা কিছু শ্রদ্ধা করে। কিন্তু বাংলা দেশ থেকে আগত কোনও বাঙালী সাধু-সন্ন্যাসীকে এঁরা পাত্তাই দেয় না। আপনি কোন্ মঠে কোন্ মহাত্মার নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন?

আপনার এ প্রশ্নের উত্তরও আমি দেব না।

বুঝলাম, আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার মত আপনার কিছু নেই। আমার পরিচয় কতকটা আপনাকে দিই। আমি শ্রীশ্রীমৎ সদানন্দ অবধূত। নামটা আমিই নিজে পছন্দ করে রেখেছি। ধনী পিতার তৃতীয় পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর অনেকগুলো নগদ টাকা হাতে পেয়েছি। সংসারটাকে ভাল করে ভোগ করার মতলবে বিয়ে করিনি। যাতে কোনও দায়িত্ব এসে ঘাড়ে না চাপে, তার জন্যে মাথা নেড়া করে গেরুয়া পরেছি। সর্ব কর্মে পারদর্শী দুটো চাকরের বেশী রাখিনে। ভোজনে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই বেদবাক্যটা পুরোপুরি মেনে চলি। ভারত ও ভারতের বাইরে বহু দেশে ঘুরেছি। তার মধ্যে বেশী সময় কেটেছে এই হিমালয়ের বুকে। আমার পেষা হচ্ছে, সাধু, সন্ন্যাসী, মোহান্ত, গোস্বামী, বৈরাগী—এই সব নিয়ে নাড়াচাড়া করা।

এ নিয়ে কোনও বই লিখছেন নাকি?

না না, অমন অপকর্ম আমার দ্বারা হবে না। এটা আমার নিজস্ব খেয়ালমাত্র।

আপনি বহু সাধু, সন্ন্যাসী, মহাত্মা দর্শন করেছেন। আপনার

কথায়ই বুঝতে পারছি যে, আপনি ঐ সমস্ত সাধু মহাত্মা দর্শন করে, কেবলমাত্র আশীর্বাদ সংগ্রহ করেই ফিরে আসেননি। তাঁদের আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা ভালভাবেই পর্যবেক্ষণ করেছেন। এঁদের সম্পর্কে অনেক তথ্যই আপনি জনসাধারণে জানাতে পারেন, তাতে বহু লোকের উপকার হতে পারে।

মোটেই না। আমার লেখায় কারও কোনও উপকার হবে না। প্রকৃত সাধু মহাত্মাদের সন্ধান পেলে মানুষ ছুটবে তাবিজ, কবচ, ঔষধ, জলপড়ার জন্যে। সে সমস্ত ভক্তের ভক্তির ঠেলায় সাধু মহাত্মা চোখে সর্ষে ফুল দেখে পালাতে পথ পাবেন না। আর ভণ্ড ব্যবসাদার সাধুবাবাদের মুখোস খুলে দিয়েও কোনও লাভ হবে না। বাংলা দেশেই খোঁজ করলে দেখতে পাবেন, বহু সাধু, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বৈষ্ণব, গোস্বামী, অপকর্ম করে, প্রহারাদি থেকে জেল পর্যন্ত খেটে আসার পরও তাঁদের ভক্তের অভাব হয় না। মানুষের এ-এক আশ্চর্য মোহ।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। উঠে পড়লাম। এদিকে বেড়াতে এলে আশ্রমে এসে চা খাওয়ার স্থায়ী নিমন্ত্রণ পেলাম। অমৃতবাজার পড়ার লোভও আছে। বিদায় নিয়ে ভাবতে ভাবতে চললাম, এ কি প্রকার সাধু ?

* * *

পরদিন অপরাহ্ন পাঁচটা বাজতেই আশ্রমে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, অবধূত মহারাজ আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। যেয়ে বসতেই চা, লুচি, আচার অনেক কিছু এসে গেল। খাচ্ছি আর ভাবছি, আমার ভোজন ভাগ্যের ওপরে বোধহয় সবগুলো শুভগ্রহের পূর্ণ দৃষ্টি আছে। এর পর যতদিন ওখানে ছিলাম, প্রত্যহ অপরাহ্ণে অবধূত আশ্রমে চা-ভোজ খেতাম।

সদানন্দ অবধূত মহারাজের সাথে তীর্থস্থান, সাধু-সন্ন্যাসী ও বিভিন্ন সাধক-সম্প্রদায়ের সাধনপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হোত। তিনি উত্তরে মানস সরোবর, কৈলাস ; দক্ষিণে কন্যাকুমারী ; পূর্বে ডিব্রুগড়,

মণিপুর; পশ্চিমে বেলুচিস্থানে হিংলাজ, আর এর মধ্যস্থলে প্রায় সমস্ত তীর্থই ভ্রমণ করেছেন। এই ভ্রমণে রসহস্যময় হিমালয়ই ছিল তাঁর সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়। সাধু মহাত্মাদের খোঁজ পেয়ে, হিমালয়ের অতি দুর্গম প্রদেশেও তিনি গিয়েছেন। অনেক মহাত্মার দর্শনও পেয়েছেন।

আমি একদিন প্রশ্ন করেছিলাম, আপনি তো বহু সিদ্ধ মহাপুরুষ দর্শন করেছেন। তাঁরা কেউ আপনাকে অলৌকিক কিছু দেখিয়েছেন কি?

অবধূত হেসে উত্তর দিলেন—না। কেউই আমাকে অলৌকিক কিছু দেখাননি। আমার ভ্রমণের প্রথম দিকে, বিন্ধ্যাচলে এক মহাপুরুষকে এবিষয়ে অনুরোধ করেছিলাম। তাতে তিনি উত্তর দিলেন, "তুমি অলৌকিক কাণ্ড দেখার জন্য এত অর্থ ব্যয় ও শারীরিক কষ্ট স্বীকার করে পাহাড় পর্বতে, দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন। কলকাতা যাও। সেখানে কোনও ভাল ম্যাজিসিয়ানের ম্যাজিক্ দেখ গিয়ে। দু-এক টাকা খরচ করে আরামে বসে অনেক অলৌকিক কাণ্ড দেখতে পাবে।" এই উত্তর পাওয়ার পর আমার ও বদখেয়াল দূর হয়েছে। তবে দেখার মত চোখ আর বুঝার মত বুদ্ধি থাকলে, এই সমস্ত মহাত্মাদের অনেক অলৌকিক ব্যাপারই দেখা যায়। স্বর্গদ্বার আশ্রমবাসী মহাত্মাদের আহার-বিহারই কি কম আশ্চর্যের বিষয়!

আমি প্রশ্ন করলাম, হিমালয়ের দুর্গম প্রদেশে যে সমস্ত সাধু মহাত্মা থাকেন, তাঁদের খাদ্য কি? কোথা থেকেই বা সে খাদ্য যোগাড় হয়?

অনেকে আছেন তাঁরা বোধহয় ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-গ্রীষ্ম জয় করেছেন। যাঁরা তা করতে পারেননি, তাঁরা বন্য চামরী গাইয়ের শুকনো দুধ সংগ্রহ করে রাখেন। বন্য চামরী যখন বাচ্চাকে দুধ খাওয়ায়, তখন তার অপর তিনটে বাঁট দিয়ে প্রচুর দুধ ক্ষরিত হয়ে মাটি বা পাথরের ওপরে পড়েই জমে যায়। দশ পনরো

মিনিটের মধ্যেই ঐ জমাট দুধ লজেঞ্চুসের মত শক্ত হয়। তখন তার ওপরে ধূলোবালি পড়লেও আর ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। এই শুকনো দুধ কুড়িয়ে এনে সাধুরা গুহায় রেখে দেন। প্রয়োজনমত গরম জলে ধুয়ে, ফুটিয়ে নিলে চমৎকার দুধ হয়। এছাড়া হিমালয়ে কয়েক প্রকার মূল পাওয়া যায়। সেগুলো খেতেও যেমন সুস্বাদু, তেমনি পুষ্টিকর, আর খেলে শরীর গরম করে, শীতও দূর করে। এই সমস্ত মূল সাধুরাই চেনেন। কোনও গৃহী বা ভণ্ড সাধুদের নিকটে ঐ সমস্ত মূল চেনার মত কিছু তাঁরা প্রকাশ করেন না।

এমন দুর্গম স্থানে এত কষ্ট করে সাধুরা থাকেন কেন ?

তাঁরা তো একে কষ্ট মনে করেন না। বরং ঐ সমস্ত সুদুর্গম স্থানে তাঁদের সাধন-ভজনে বিঘ্ন কম হয় বলে, বেশ আনন্দেই থাকেন।

এই সমস্ত সাধু মহাত্মারা আমাদের লোকালয়ে আসেন কি ?

কদাচিৎ আসেন। এলেও কেউ তাঁদের চিনতে পারে না। তাঁরাও ধরা দেন না।

আপনার কথায় আমার ধারণা হচ্ছে, সাধুরা বড় স্বার্থপর।

না, তা নয়। জ্ঞান হচ্ছে অজ্ঞান বিরোধী। অজ্ঞান মানব প্রকৃত তত্ত্বোপদেশ বোঝেও না, গ্রহণ করতেও পারে না। সংসারী মানব তার সংসার বাসনার অনুকূল উপদেশ বোঝে, গ্রহণও করে। কর্মীমানব জন্ম-জন্মান্তর ধরে কর্মের ভিতর দিয়ে সুখ-দুঃখের আঘাতে বৈরাগ্যের সংস্কার লাভ করে। সেই সংস্কারগত বিষয় বৈরাগ্য যখন পরিপুষ্ট হয়, তখন তাকে বিষয় ছাড়িয়ে অপ্রাকৃত ব্রহ্মানন্দ লাভের জন্য উন্মুখ করে তোলে। তখনই ঐ সমস্ত ব্রহ্মানন্দী সৎ মহাপুরুষ দেখা দিয়ে উপযুক্ত সাধনোপদেশ দেন। তার পূর্বে সৎ-কর্মী-আচার্যের উপদেশই গৃহস্থকর্মী মানবের হিতকর। এ বিষয়ে আধুনিক কালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবই অতি স্পষ্ট করে কর্মী-গৃহস্থের পথ দেখিয়েছেন। তার পূর্বে উপদেশ দিয়েছেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ; আর তারও পূর্বে গীতায় দিয়েছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

অনেক জায়গায়ই তো দেখা যায় বা শোনা যায়, সংসার ত্যাগী সিদ্ধ মহাপুরুষেরা গৃহস্থদের দীক্ষা দিয়ে শিষ্য করেন। এ ব্যাপারটা তবে কি?

সিদ্ধ মহাপুরুষ তো দূরের কথা, কোনও সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী বা বৈরাগী কর্মী-গৃহস্থকে দীক্ষা দেন না, কারণ সেটা শাস্ত্র ও সাধন-ভজন বিরোধী। দীক্ষা প্রদানের শাস্ত্রীয় তাৎপর্য শিষ্যকে গুরুর নিজ সাধন পথের পথিক ও সঙ্গী করে নেওয়া। কাজেই গুরু চলবেন এক পথে, আর তাঁর শিষ্য চলবে ভিন্ন পথে বা বহু দূরে দূরে, তা হয় না। পারমার্থিক দীক্ষা মানে গুরু-শিষ্যের হাত ধরাধরি করে শ্রেয়ের পথে চলার ব্যবস্থা।

আমার প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর এখনও হয়নি। আমি জানতে চাই, সৎ মহাপুরুষদেরও দেখা যায় গৃহস্থকে দীক্ষা দিতে। তাঁদের সেই সমস্ত গৃহী শিষ্যদের মধ্যে এমন বহু অসৎ লোক থাকে যারা সারা জীবনেও সংশোধিত হয় না। এই সমস্ত দীক্ষা ব্যাপারটা কি?

আপনাকে আবার বলি, আপনার কথিত মহাপুরুষ যদি ব্যবসাদার মহাপুরুষ না হয়ে সত্যই সৎ হন, আর তাঁকে পাইকারী হারে দীক্ষা দিতে দেখে থাকেন, তবে জানবেন ওটা আদৌ দীক্ষা নয়; ভগবৎনামোপদেশ মাত্র। ঐ প্রকার নামোপদেশ যদিও শাস্ত্রসম্মত, তথাপি আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রে গৃহস্থের যে দীক্ষা-সংস্কারের ব্যবস্থা আছে, ওটা তা নয়। তথাপিও যে দেখা যায়, ঐ প্রকার নামোপদেশপ্রাপ্ত গৃহস্থেরা মনে করে তাদের দীক্ষা হয়েছে, সেটা তাদের নিদারুণ ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনও শাস্ত্রই গৃহস্থাশ্রম ত্যাগী সন্ন্যাসীর নিকটে গৃহীর দীক্ষা গ্রহণ করে গৃহস্থ-কর্মী থাকা সমর্থন করে না।

তবে ঐ প্রকার নামোপদেশদাতা সৎ সন্ন্যাসী মহাত্মারা গৃহস্থের এ ভুল ভেঙে দেন না কেন?

দেখুন আগেকার দিনে কলকাতায় বিয়ে বাড়িতে, বরযাত্রীদের

সাথে মিশে, রাস্তা থেকে কতকগুলো রবাহুত আসত। এই রবাহুতদের বেশভূষা ভদ্রলোকের মত দেখে, বরযাত্রীরা মনে করতেন এরা কন্যার বাড়ির লোক। কন্যাপক্ষেরও অনেকে মনে করতেন, এরা বরযাত্রী। ঐ সমস্ত রবাহুতরাই বিয়ে বাড়িতে সব চাইতে বেশী হৈ-চৈ করত। কন্যাপক্ষে যাঁরা প্রাচীন ও বিজ্ঞ, তাঁরা জেনেশুনেও শুভ কার্যের দিন আদর করে রবাহুতদের এক পেট খাইয়ে দিতেন। তাঁরা জানতেন, এগুলো এক পেট খেতে এসেছে মাত্র, প্রকৃত আত্মীয় যাঁরা তাঁরা ঠিকই আছেন। তেমনি সৎ মহাপুরুষদের নিকটেও বহু রবাহুত আসে। এক সন্ধ্যা ভোজ খাওয়ার মত। একটা মন্ত্র উপদেশও পায়। তারপর ঐ রবাহুতগুলোই 'আমি অমুক মহাপুরুষের শিষ্য' বলে ঢাক পিটিয়ে বেড়ায়। বিয়ে বাড়ির বরের মত মহাপুরুষের প্রকৃত শিষ্য দু-একটিই থাকে। ঢাক পেটানো হৈ-চৈ ভক্তদের মধ্যে নির্বাক শান্ত বরসদৃশ সেই শিষ্যকে খুঁজে বের করা কঠিন। সেই গুরু শিষ্যকে চেনেন, আর শিষ্য গুরুকে চেনে।

এইবার ব্যবসাদার সাধু-সন্ন্যাসীদের ব্যাপারটা একবার বলুন?

আপনি ও-ব্যবসায় নামবেন নাকি? যদি নামতে চান তবে ও-ব্যবসার অনেক কিছুই আপনাকে বলতে পারব, শিখাতেও পারব।

না নামলেও তো এদের চিনে সাবধান হতে পারব।

আমার আগ্রহ দেখে অবধূত বলতে আরম্ভ করলেন, ভারতে ব্যবসাদার সাধু-সন্ন্যাসী ও তাদের শিকারগুলোকে বাঙালী ও অবাঙালী, এই প্রধান দুটো ভাগে ভাগ করতে হবে। অবাঙালী সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রধান শিকার হচ্ছে—ধনী, শেঠ, মারোয়াড়ী, মূর্খ রাজা, জমিদার। তার জন্য সাধুবাবারা শিক্ষা করেন থট্‌রীডিং, হিপ্‌নটিজম্‌, আর কিছু হাতসাফাই ম্যাজিক। মাথায় বড় বড় জট তৈরী করতে হয়। অনেকে বাজার হতে পছন্দমত জট কিনে নিয়ে মাথায় জুড়ে নেয়। বাঙালী ব্যবসাদারদের চাইতে এদের ব্যবসা অনেক সহজ।

বাঙালী সাধুবাবাদের প্রধান শিকার হচ্ছে, সমাজের উচ্চস্তরের ধনী ইংরেজী শিক্ষিত উচ্চপদস্থ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দল। এ শিকার

কায়দা করতে হলে, প্রথমত প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। ভাল মটর গাড়ি ও মূল্যবান বেশভূষা না হলে, প্রথমদিকে এ সমস্ত শিকারের আস্তানায় ঢোকাই যায় না। নিজের চেহারা যদি সে রকম না হয়, তবে একটি সুন্দরী আশ্রমজননী যোগাড় করতে হবে। যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করে ভাল ভাল লেখক ও বক্তা দালাল রেখে, কৌশলে কাগজে-কলমে এবং বক্তৃতায় প্রচারকার্য চালাতে হয়। নিজেও ইংরেজী শিক্ষিত হতে হবে। পাশ্চাত্য দর্শন ও সাহিত্যে ভাল জ্ঞান থাকা চাই। তারপর যদি কিছুদিন বিলেত বা আমেরিকা ঘুরে আসা যায়, তবে একেবারে সোনায় সোহাগা। এই সমস্ত যোগাতা থাকলে তবে বড় বড় শিকার ঘায়েল হবে।—

আর যদি মূলধনের অভাবে সাধারণ গৃহস্থ ও বাঙালী ব্যবসাদার শ্রেণীর মধ্যে পসার করতে চান, তবে কিছুদিন নবদ্বীপে থেকে, ব্যবসাদার বাবাজী, গোস্বামীদের হাবভাব, চালচলন, কথা বলার কায়দা শিক্ষা করবেন। যদি একটু ভাগবত পাঠ বা রসকীর্তন শিক্ষা করতে পারেন, তবে বড়ই ভাল হয়। পুলক, কম্প, প্রেমাশ্রু যদি অভ্যাস করতে পারেন ভাল, না পারেন ঔষধের দোকান হতে এক শিশি 'লাইকার এমন ফোর্ড' কিনে নেবেন। ওর দু-চার ফোঁটা এসেন্সমাখা রুমালে ঢেলে, বৈষ্ণবীয় জামা বেণীয়ানের বুকের পটির মধ্যে রেখে দেবেন। সময়মত ভাবাবেগে মাথাটা বুকের দিকে নত করলে অথবা ঐ রুমাল দিয়ে একটু নাক মুছলেই অশ্রু, কম্প, পুলক সব এসে যাবে।

আমি বললাম—আপনি দেখছি কাকেও ছেড়ে কথা বলছেন না। তার মধ্যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ওপরই আক্রমণটা বেশী।

অবধূত হেসে বললেন—ভাই, আমি যে ঐ স্তরেই জন্মিয়ে সাতাশ বৎসর কাটিয়েছি। এখনও মাঝে মাঝে মিশে থাকি। কাজেই আমি আমার নিজের স্তরটাকে বেশ ভাল করেই চিনি। তোমাদের দৃষ্টিতে উচ্চস্তরের শিক্ষিত ধনী আমরা বাল্যকালে ঠাকুরমার শিব পূজো বা গোপাল পূজো শেষ হলে, চরণামৃত ও প্রসাদ খাই; একটা প্রণামও করি। একটু বড় হলে, খাবার টেবিলে বসে কলিমুদ্দিন বাবুর্চির

রান্না মুর্গির ঠ্যাং চিবুতে চিবুতে শুনি, পূজো অর্চনা ইত্যাদি সমস্ত কুসংস্কার। কলেজে ঢুকে শুনি বা পড়ি "Religion is an intution of union with the world."—Havlock Alis.

"Religion is nothing but unconditional submission to a mystry, which can never be solved." —Prof. Shotwell.

"It was fear that first made God and religion." —Prof. John Lucrecious.

তারপর যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করি তখন হই পুরোদস্তুর সুন্দরবনের দক্ষিণরায়।* ধর্মের বাপের সাধ্য কি যে, আমাদের কাছে ঘেঁষে।

কেউ কেউ আবার সভায় বক্তৃতা করে বাহাদুরী নেবার জন্যে গীতা উপনিষদের ইংরেজী তর্জমা পড়ে, হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হন। কর্মস্থলে পদাধিকারবলে যদি কোনও ধর্মসভায় নিমন্ত্রণ পান, তাহলে সে সভায় উপস্থিত হয়ে এমন তাজ্জব বক্তৃতা করেন যে, যদি সে সভায় কোনও পীলে রোগী, টুলো পণ্ডিত উপস্থিত থাকেন, তবে সে বক্তৃতা শোনার সাথে সাথে তাঁর পীলে কমতে থাকে।—

পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বৎসর বয়স পর্যন্ত এঁদের এই প্রকারই চলে। তারপরে অনেকেই বেশ একটু ঘাবড়িয়ে যান, তা সে দক্ষিণরায়ই হন অথবা ধর্মবিশেষজ্ঞই হন। নিজের বুদ্ধির ওপরে আর আস্থা রাখতে পারেন না। একদিকে রক্তের জোরের সাথে সাথে মনের জোর কমে আসে; অপরদিকে নিশ্চিত মৃত্যুর অন্ধকার গুহা হতে অজ্ঞাত ভীতির কালোছায়া, মন ও বুদ্ধিকে বিচলিত করে তোলে। এই অবস্থায় এঁরা মহাপুরুষদের জীবনচরিত, কথামৃত ইত্যাদি পড়তে আরম্ভ করেন। তার ফল একটা প্রচলিত গল্প দিয়ে বুঝাই।

এক ভদ্রলোক তাঁর বালবিধবা কন্যাকে মহাভারত পড়তে দিয়েছিলেন। পড়া শেষ হলে ভদ্রলোক মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা

* (দক্ষিণরায়—সুন্দর বনের বড় বাঘ।)

করেছিলেন, মহাভারতের কোন্ চরিত্রটি তার সবাপেক্ষা ভাল মনে হয়েছে। বালবিধবা মেয়ের মুখে উত্তর পেলেন—দ্রৌপদী চরিত্রই শ্রেষ্ঠ, কেননা সে অপূর্ব বুদ্ধিমতী। এক সাথে পাঁচ-পাঁচটা বিয়ে করে রেখেছিল, দু-চারটে মরলেও যাতে অনাথা না হতে হয়।

এই বালবিধবাটি যেমন মহাভারত পড়ে সার সংগ্রহ করেছিল, প্রায় সেই প্রকারেই অনেকে মহাপুরুষদের জীবনচরিত পড়ে আশান্বিত হন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব পাপী জগাই-মাধাই দুই ভাইয়ের সমস্ত পাপ নিজে গ্রহণ করে, এক রাত্রেই দুজনকে পরম ভক্ত করে দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরীশ ঘোষ মহাশয়ের সমস্ত ভার গ্রহণ করে, তাঁকে সাধন-ভজনের পরিশ্রম থেকেও রেহাই দিলেন। অতএব একটা অবতার বা সিদ্ধমহাপুরুষ ধরতে পারলেই আর ভাবতে হবে না। মোক্ষপ্রাপ্তি একেবারে ইন্‌সিওর হয়ে থাকবে। ফলে এই সমস্ত উচ্চস্তরের শিক্ষিত ব্যক্তিই ব্যবসাদার অবতারবাবা, সাধুবাবাদের প্রধান শিকার।—

বাংলাদেশে পল্লী অঞ্চলের বাসিন্দা ও জাত ব্যবসায়ীশ্রেণী, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষ সকলেরই যেমন ধোপা, নাপিত, পুরোহিত নির্দিষ্ট আছে, তেমনি একটি গুরুবংশও নির্দিষ্ট থাকে। নিজ নিজ গুরুবংশধর পণ্ডিতই হোক, আর মূর্খ ই হোক, তাঁর নিকটেই প্রয়োজন হলে দীক্ষা নিতে হয়। গুরুবংশ ত্যাগ করে অন্যত্র দীক্ষা গ্রহণ অত্যন্ত দোষাবহ, এ ধারণাও তাদের মধ্যে বদ্ধমূল। কাজেই কোনও ভুঁইফোঁড় গোঁসাই বা সাধু-সন্ন্যাসী অবতারব'বার পক্ষে, পল্লী অঞ্চলে বা বাঙালী ব্যবসাদারশ্রেণীর মধ্যে, ফলাও ব্যবসা চালানো সম্ভব হয় না। তাদের মধ্যে বড় জোর শিক্ষা, উপদেশ, নামযজ্ঞ, মহোৎসব এই সমস্ত চলে; তাতে খুব বেশী কমিশন থাকে না। এই সমস্ত ব্যবসাদার সাধু-সন্ন্যাসী-বাবাদের কপাল ভাল খোলে, সহরের উচ্চবর্ণের শিক্ষিত ধনীসমাজে। সে সহর যত বড় হয় ততই ভাল। আর অবতারত্ব লাভ, বড় সহর ছাড়া অন্যত্র একেবারেই অসম্ভব।

আমি প্রশ্ন করলাম—বাংলাদেশে একশ্রেণীর প্রতিষ্ঠান দেখা যায়, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সন্ন্যাসীরা দেশের কোথাও বন্যা, মহামারী,

দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দেখা দিলে, সেই মহা দুর্দিনে আর্তদেশবাসীর সেবার জন্য পরম বন্ধুর মত, জনসাধারণের পাশে এসে দাঁড়ান। তাঁদের সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?

অবধূত উত্তর দিলেন—দেখুন আপনিও সন্ন্যাসী সেজেছেন। কিন্তু আপনিও জানেন. আমিও বুঝেছি, আপনি ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য সন্ন্যাসী হননি। ভগবৎ দর্শন, ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য, নিজের দেহ ও দৈহিক সমস্ত প্রচেষ্টা ত্যাগ করার নামই সন্ন্যাস। শ্রীমদ্ভাগবত এই প্রকারই বলেন। আচার্য শঙ্কর তাঁর বেদান্ত ভাষ্যের প্রথমেই ব্রহ্ম-জ্ঞানের অধিকারী অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ পাবার অধিকারী নির্ণয়ে ও মুণ্ডক উপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ডে ২১—২২ শ্রুতি ব্যাখ্যায় অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছেন—"কর্মীর ব্রহ্মনিষ্ঠা সম্ভব নহে। কারণ কর্ম ও আত্মতত্ত্বজ্ঞান পরস্পর অত্যন্ত বিরোধী। যে ব্যক্তি সমস্ত কর্ম এমন কি কর্ম করার বাসনা পর্যন্ত ত্যাগ করে গুরুসমীপে এসেছে, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ ও সন্ন্যাস প্রাপ্ত হবে।"

এখন এই তাৎপর্যে এই সমস্ত গেরুয়াধারীদের সন্ন্যাসী বলা যায় না। এই সেবাব্রতি সৎকর্মী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্তক শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের প্রেরণায় স্বামী বিবেকানন্দ। আর কিছু না দেখে কেবল মাত্র এই অভিনব জনসেবাব্রতী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ও সংগঠক বলেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব যুগাবতার, আর স্বামী বিবেকানন্দ মহাপুরুষ বলে গণ্য হতে পারেন। এই সমস্ত সেবাব্রতী সন্ন্যাসীদের আচার-ব্যবহার শাস্ত্রীয় সন্ন্যাসীর মাপকাঠি দিয়ে মেপে বিচার করা চলবে না। তবে যদি এই প্রকার সন্ন্যাসী কেউ বা কোনও সম্প্রদায়, তাঁদের সেবা-ব্রতের আদর্শচ্যুত হন অথবা জনসাধারণের আধ্যাত্মিক জ্ঞানোপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করেন তবে তাঁর বা সেই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস শাস্ত্রের কষ্টিপাথরে কষেই আসল মেকী-বিচার করতে হবে।

স্নাইপ পাখি

স্বর্গদ্বারে দুই মাস কাটল। আমার নিজের দিক দিয়ে চিন্তা করলে এ দু-মাস পরম সুখেই ছিলাম। সদানন্দ অবধূত মহাশয়ের সাথে পরিচয় হওয়ার পর আলাপের লোকও পেয়েছিলাম। প্রভাতে ঘুম ভাঙে গঙ্গার পশ্চিম পারের গুরুকুল, ঋষিকুলের অস্ফুট সামগান শুনতে শুনতে। হাত-মুখ ধুয়ে কালীশঙ্কর দাদার শিক্ষামত সন্ধ্যা বন্দনাদি করে আমবাগানেই একটু ঘোরাফেরা করি। কোনও দিন যাই বদরীনারায়ণের পথ ধরে পাহাড়ের উপর দিয়ে দু-তিন মাইল। দুপুরে খেয়ে বসি রামচরিতমানস বইখানা নিয়ে। অপরাহ্ণ চারটে বাজলেই উপস্থিত হই অবধূত আশ্রমে। সেখানে শুনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আচার-ব্যবহার ও তার ইতিহাস, আর তার বাস্তব বিশ্লেষণ। কোনও দিন বা শুনি তাঁর গ্রীস, ইতালী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ভ্রমণকাহিনী। সন্ধ্যার পর উপস্থিত হই সত্রের ঘাটে। সেখানে বসে রাত্রি আটটা পর্যন্ত শুনি সাধু মহাত্মাদের অপূর্বস্নিগ্ধ শাস্ত্রীয় আলাপ। এইভাবে স্বর্গদ্বারে সুখে আমার দিন যায়।

একদিন অবধূত আশ্রম থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে এসে দেখলাম, লছমনঝোলার ওপরে দাঁড়িয়ে একটা লোক, বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করছে। লোকটাকে দেখে পশ্চিমা মুসলমান ফকীর বলে মনে হল। মাথায় কাঁচাপাকা লম্বা চুলে অনেকগুলো তেতুলে জট পাকিয়েছে। মুখে বড় দাড়ি। গলায় হরেক রকমের বড় বড় মালা। পরনে কাল রঙের আলখেল্লা। মাথায় ফকীরে টুপি। হাতে ফকীর সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বাঁকানো লাঠি। কোমরে চিকণ লোহার সিকলে বাঁধা একটা কিস্তি।

দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। সি, আই, ডি, নাকি? উপায় নেই। লছমনঝোলা সেতু আমাকে পার হতেই হবে: সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে চললাম। মনে দুঃখ হল, রঙিন চশমাটা সাথে নেই। এগিয়ে চলেছি। মধ্যে মধ্যে চোখ তুলে দেখি, ফকীর এক দৃষ্টিতে আমার দিকে

তাকিয়ে আছে। খুব জোর পায়ে হাঁটা দিলাম। ফকীরের পাশ কাটাতেই ফকীর উঁচু পাথরটার উপর থেকে নামতে নামতে বলল—এ সাধুবাব্য, থোরা ঠারিয়ে।

দাঁড়াতে হল। পূর্বপার হতে পাহাড়ী ব্যবসাদারদের একপাল ভারবাহী ছাগল উঠেছে সেতুর ওপরে। কাজেই ছাগল পার না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়াতে হবেই। ফকীর দেওয়ান অতি বৃদ্ধ, বাতগ্রস্তও বটে, লাঠি ভর করে কুঁজো হয়ে হাঁটেন। কাছে এসে আর একবার ভাল করে দেখে নিয়ে, পরিষ্কার বাংলায় বললেন—তুমি কলকাতার অমুক মেসে থাকতে না?

শুনে মনে হল এ কণ্ঠস্বর আমার পরিচিত। মুখের দিকে তাকিয়েও মনে হল, চোখ দুটোও যেন চেনা। কিন্তু কোথায় যে দেখেছি তা ধরতে পারলাম না। যতগুলো পুলিস-অফিসারের সাথে পরিচয় ছিল, তাঁদের সকলের ওপর দিয়ে মনের চোখ ও কান বুলিয়ে নিলাম। নাঃ, এ তো পরিচিত কোনও পুলিস-অফিসার নয়! তবে কে?

আমাকে নির্বাক ও চিন্তান্বিত দেখে ফকীর বলতে আরম্ভ করলেন—ছ'বছর পূর্বে জুলাই মাসে এক বাদল-সন্ধ্যায় কলকাতার মেসে আড্ডা চলছিল। এমন সময় সর্বাঙ্গ কাদা-মাখা ভূতের মত এক অতিথি ঘরের দরজায় উপস্থিত হয়। তারপর সেই অতিথি ভিজে জামা-কাপড় ছেড়ে তোমার একখানা কাপড়—

আর বলতে হল না, চিনে ফেলেছি। অদ্ভুত ছদ্মবেশ। বয়সটা পর্যন্ত চল্লিশ বছর বেড়ে গেছে!

ছাগলের পাল পার হলে দুজনে পূর্বপারে এসে সম্মুখেই খোলা ধর্মশালাটায় যেয়ে বসলাম।

প্রথমেই জানতে চাইলাম তাঁর বর্তমান অবস্থাটা কি?

তিনি সংক্ষেপে বললেন—অবস্থা ভাল নয়। আমি পুলিসের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছি। তারা দলে দলে হাতকড়ি আর দড়ি নিয়ে সারা ভারত আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ধরতে পারলেই হাতকড়ি পরিয়ে দড়িতে ঝুলিয়ে দেবে। কাজেই এ দেশে থাকা আর সম্ভব

নয়। এবার তাদের নাগালের বাইরে যেতে চেষ্টা করছি। এতদিন ছিলাম বহুরূপী, এখন স্নাইপ পাখি হয়ে স্নাইপের দেশে যাব।

তৎকালে পার্টির অবস্থা জানতে চাইলে বললেন—

তুমি তো জান, এখন আর দু'দলে কোনও মতান্তর বা ভেদ নেই। দক্ষিণেশ্বর বোমার ঘটনা ও কাকোড়ী ট্রেন-লুটের ব্যাপারে বহু ভাল ভাল কর্মী ধরা পড়েছে। এই ঘটনার পর দলের প্রধান নেতারা দলে দুর্বলচেতা বিশ্বাসঘাতকের অনুপ্রবেশ ঘটেছে সন্দেহ করে সুপরিচিত ভাল কর্মীদের নিয়ে একটা বিশেষ দল গঠনের চেষ্টা করছেন। এই বিশেষ দলে তোমাকেও নেওয়া হয়েছে।—

কাকোড়ী মামলায় ইন্দুভূষণ মিত্র ও কাকোশ সরকারী সাক্ষী হয়েছে। এ দুটোর মধ্যে অন্তত ইন্দুকে সরাতে না পারলে দলের অনেক কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এ পর্যন্ত চেষ্টা করে তাদের ছায়াও দেখা যাচ্ছে না, পুলিস অত্যন্ত সতর্ক। এখন একমাত্র ভরসা কোর্টে মামলা উঠলে দূর থেকে যদি তাদের দেখা পাওয়া যায়। সে অবস্থায় কিছু করার জন্য, তোমার খোঁজ করা হয়েছিল। তোমার সন্ধান পেয়ে পার্টির লোক যে দিন পুরী যায়, তার দুদিন পূর্বে তুমি গোয়েঙ্কা ধর্মশালা হতে উধাও হয়েছে।—

এখানে এসে হৃষীকেশ কালীকমলীর ম্যানেজারের কথায় তোমার আভাস পেয়ে এদিকে এসে দেখলাম তুমি অবধূত মহারাজের সাথে আড্ডা জমাচ্ছ। ভাল করে না দেখে তোমাদের সম্মুখে যেতে সাহস করিনি। তাই ঐ পাথরটার ওপরে বসে অপেক্ষা করছিলাম।—

কালীকমলীর গদীর ম্যানেজার ও সদানন্দ অবধূত আমাদেরই লোক। তবে হাতে-কলমে কর্মী নন, অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষক। অবধূত মশাই প্রথম হতেই নানাভাবে আমাদের সাহায্য করে আসছেন। বহু কর্মীর দুঃস্থ পরিবার তাঁর গোপন অর্থ-সাহায্যে দুটো খেয়ে পরে বেঁচে আছে।—

অবধূতের সাথে আমিও দেখা করব। হিমালয় পার হওয়ার পথের সন্ধান তিনি ভাল জানেন। আজ সন্ধ্যা হয়ে গেল। এখন

যেয়ে আর কথা হবে না। সন্ধ্যার পর তিনি ভজন-সাধন নিয়েই থাকেন। কাল প্রাতে আসব। তুমি কিন্তু কাল প্রাতে এস না, বিকেলে এস। কালীশঙ্কর ব্রহ্মচারীর মুখে তোমার কথা কিছু কিছু শুনেছি।

অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করলাম—কালীশঙ্কর দাদার সাথে আপনার কোথায় দেখা হয়েছে?

ডিমাপুরে দেখা হয়েছিল। প্রায় দু'বছর পূর্বে ঐ দিক দিয়ে হাঁটাপথে ব্রহ্মদেশে গিয়েছেন। এক বছর ব্রহ্মদেশ ঘুরে বোধহয় গত জানুয়ারী মাসে ব্যাঙ্কক পৌঁছেছেন। অদ্ভুত কর্মী লোক। এক দেশে যেয়ে সে দেশের ভাষা শিখে বক্তৃতা করতে ছয় মাসও তাঁর লাগে না। ও দেশে যেয়ে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়েছেন। বহু ছাত্রও যোগাড় করে ফেলেছেন। তাঁর মতলব ঐ সমস্ত দেশে এমন কতকগুলি কর্মী তৈরি করবেন, যারা স্বদেশে জাতীয় জাগরণ আনতে আত্মনিয়োগ করবে।

আপনি এখন কি করবেন?

বর্তমানে যে প্রকার ধরপাকড় আরম্ভ হয়েছে তাতে মনে হয়, আমার পক্ষে দেশে থেকে কাজ চালান সম্ভব নয়। সেজন্য সরে পড়তে চাই। এই পথে হিমালয় পার হয়ে তিব্বত-চীন পার হব। তারপর রাশিয়ার কুয়াসায় গা ঢাকা দিয়ে দেখব কিছু করা যায় কি না। কালীশঙ্কর দাদা বলেন সাম্রাজ্যবাদীদের নাগপাশ আজ পৃথিবীর বহু জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছে। তার জন্য সমস্ত পরাধীন জাতির মধ্যে জাগাতে হবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। আর তা হলেই ভারতের মুক্তিপথ সুগম হবে। এই উদ্দেশ্যে অনেকেই বাইরে যেয়ে কাজ করছেন। ভারতে গণ-জাগরণের জন্য কংগ্রেসই এখন ভাল কাজ চালাচ্ছে। আমরা বিদেশে থেকে চেষ্টা করব। ভারতে সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রচেষ্টা অচল হয়ে উঠেছে।

আপনি এ পথ ধরলেন কেন?

এ পথ দিয়ে যাওয়ার কতকগুলো সুবিধে আছে কাল বিকেলে আমাকে যখন দেখবে তখন আর এ বেশ থাকবে না। যে বেশ ধরব তাতে বদরীনারায়ণ পর্যন্ত আশা করি নিরাপদে পেঁৗছে যাব। বদরী-নারায়ণ থেকে প্রায় পনরো দিনের পথ অতিশয় দুর্গম। ঐ পথটা অতিক্রম করতে পারলেই অবশিষ্ট পথে আমাদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন আশ্রয় আছে।

সন্ধ্যা ঘোর হয়ে গিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি এখন কোথায় যাবেন ?

আজ এখন হৃষীকেশেই ফিরে যাব। কাল সকালে এসে অবধূত মহারাজকে ফকিরি গান শুনাব। বিকেলে তুমি অবধূত আশ্রমে এলে আর সব কথা হবে।

দুজনেই উঠে পড়লাম। ফকীর চললেন লছমনঝোলার দিকে। আমি ভাবতে ভাবতে চললাম আমার কুটীরে।

সে রাত্রে আদৌ ঘুম হল না। পরদিনও মনের দারুণ অস্বস্তি নিয়ে অপরাহ্ন চারটে পর্যন্ত কাটল। চারটে বাজতেই অবধূত আশ্রমে উপস্থিত হয়ে দেখি ফকীর উপস্থিত আছেন। তবে ফকীরের আর ফকীরত্ব নেই। এক জটাজুটোধারী কোমরে লোহার শিকল বাঁধা কৌপিন পরিহিত সৌম্যমূর্তি সন্ন্যাসী বসে আছেন। কে বলবে যে ইনিই সেই একদিন পূর্বের বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত মুসলমান ফকীর।

অবধূত আমাকে দেখে হেসে বললেন—কি হে, মুখ যে এক রাত্রেই মলিন হয়ে গেছে. ভয় পেলে না কি ? না স্বর্গদ্বারের এমন আরাম ছেড়ে যেতে হবে বলে দুঃখ হচ্ছে ? কিন্তু ভেবে দেখ এখন তুমি পার্টির নিকটে কত মূল্যবান। তোমার নিরাপত্তা সকলেরই কাম্য। এ জায়গা বড় বিপজ্জনক। এখানে বহু গুপ্তচর আছে। তা সত্ত্বেও যে তুমি এতদিন কেন ধরা পড়নি তাই আমি ভাবছি। আমার মনে হয় আলীপুর জেলখানার ঘটনায় এ পর্যন্তও পুলিস তোমাকে জড়ানোর মত কোনও সংবাদ পায়নি। তথাপি তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে।

এর পরেও আমাকে নীরব দেখে সন্ন্যাসী বললেন—তুমি তোমার

পরিবারবর্গের জন্য চিন্তা করো না। যদি দলীয় কোনও কাজে বিপন্ন হও, তবে তোমার পরিবার যাতে প্রতিপালিত হয়, তার ব্যবস্থা এই অবধূত মহাশয়ই করবেন। সেদিক থেকে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার। নিতান্ত নিরুপায় না হলে তোমার মত লোককে কোনও বিপজ্জনক কাজের ভার দেওয়া হয় না, এ নিয়ম তুমি নিজেই জান।

মনে যে দুশ্চিন্তা জমাট বেঁধে ছিল তার অনেকখানি কেটে গেল। আমি প্রশ্ন করলাম,—তা হলে এখন আমাকে কি করতে হবে?

সন্ন্যাসী বললেন—তুমি অবধূত মহাশয়ের পরামর্শ মত কাজ কর। আপাতত দু-একদিনের মধ্যে তোমাকে কোনও নিরাপদ স্থানে পাঠানো হবে। তোমার সাথে সংবাদ আদান-প্রদান অবধূত মহারাজই করবেন। আগামীকালই লাক্ষ্ণৌতে সংবাদ পেঁ'ছে যাবে। যেখানে যাঁরা আছেন তাঁরা সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে, তারপর তোমাকে নিয়ে যাবেন। আমি যতদূর শুনে এসেছি তাতে কোর্টে মামলা উঠলে সাক্ষীর কাঠগড়ায় ছাড়া অন্য কোথাও ঐ দুটো বিশ্বাসঘাতকের দেখা পাওয়ার উপায় নেই।

আর বিশেষ কোনও কথা হল না। সেদিন একটু বেলা থাকতেই আমি ও সন্ন্যাসী একত্রে আশ্রম থেকে বিদায় নিলাম। রাস্তায় এসে সন্ন্যাসী বললেন—ভাই তুমি কিছু মনে করো না। আমার কাছে অনেকগুলো টাকা ছিল। ওর বেশীরভাগই পার্টির টাকা। পার্টির টাকা পার্টির তহবিলে জমা দিতে অবধূত মশাইয়ের হাতে দিয়ে গেলাম। এখন আমার নিজস্ব টাকা কিছু হাতে আছে। যে পথে চলেছি সে পথে এ টাকাও সম্পূর্ণ লাগবে না। এর থেকে তোমাকে কিছু দিয়ে যেতে চাই। তুমি টাকা কটা বাড়ি পাঠিয়ে দাও।

আমি বললাম—সে কি করে হবে? তাতে যে আমার ঠিকানা জানাজানি হয়ে যাবে।

ওঃ তাও তো বটে। আচ্ছা, টাকা কটা কাল যাওয়ার পথে অবধূত মহাশয়ের হাতে দিয়ে যাব, তিনি পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। তুমি কিন্তু কাল আর আমার সাথে দেখা করতে চেষ্টা করো না। আমি

হৃষীকেশ হতে এক সন্ন্যাসীদলের সাথে বদরীনারায়ণের পথ ধরব। কালীকমলীর ম্যানেজারই সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

লছমনঝোলা বাঁদিকে রেখে হৃষীকেশের পথ পাহাড় ঘেঁষে চলেছে। নির্বাক দুজন চলেছি সেই পথে। আমি কেন চলেছি তাঁর সাথে, তা বলতে পারব না। হয়তো সেদিন তাঁর সাথে সাথে হৃষীকেশ পর্যন্তই যেতাম, কিন্তু তা হল না। লছমনঝোলা ছাড়িয়ে প্রায় এক মাইল দক্ষিণে যে জায়গায় শালবন আরম্ভ হয়েছে, সেইখানে এসে সন্ন্যাসী বললেন—ভাই, এবার তুমি ফিরে যাও।

কথাটা শুনে চমকে উঠলাম। তাইতো, আমি কোথায় যাচ্ছি তাঁর সঙ্গে! দাঁড়ালাম। তিনিও দাঁড়ালেন। শালগাছের ছায়ায় সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হয়ে উঠেছে। সেই আলো-আঁধারে নীরবে দুজনে মুখোমুখী দু-মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে নীরবেই বিদায় নিলাম।

তারপর সেই হতে এ যাবৎ বহুবার হিমালয় দেখেছি। সন্ধ্যার আলো-আঁধারে হিমালয়ের অভ্রভেদী চূড়ার দিকে তাকালেই মনে হয়, ঐ সেই হিমালয়। ঐ দুর্গম হিমালয়ের উত্তরে দুর্গম তিব্বত। তারপর মহাচীনের পশ্চিমে বিশদ-সঙ্কুল স্টেপল্যাণ্ড। তারও উত্তরে বরফ-ঢাকা ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন সাইবেরীয়া-রাশিয়া। আমার সেই ফেরারী বন্ধু পেরেছেন কি পৌঁছুতে সে দেশে? এখনও কি সেই ঘন কুয়াশার দেশে থেকে স্বদেশের স্বাধীনতা-সূর্যালোক প্রত্যাশা করছেন? ভারত-গগনে স্বাধীনতা-সূর্য তো উদিত হয়েছে। এখনও কি তোমাদের ফিরে আসার সময় হয়নি? আজ ভারতে পরাধীনতার রাত্রি কেটে যেয়ে, স্বাধীনতা-সূর্য উদয়ের সাথে সাথে, ব্যক্তিস্বার্থের নিবিড় মেঘ, যে দুর্নীতির প্রবল ঝড় দেশের বুকে তুলেছে, তাতে দিশেহারা দেশ-বাসীদের এই দুঃখ-দারিদ্র্য-প্রবঞ্চনা-সমুদ্র পার করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে হে মহান বিপ্লবীসম্প্রদায়, আবার তোমরা আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়াও।

সেদিন দলীয় কঠোর নিয়মের শাসনে যে পরিচয় নিতে পারিনি সে পরিচয় দেবার সময় কি এখনও হয়নি? বোধহয় সে পরিচয় দেবার

প্রয়োজনবোধই তোমাদের নেই। তাই কবি গেয়েছেন—"যখন লক্ষ্মীদেবী স্বর্গে ওঠেন, আমরা পশি নীল অতল।"

কিন্তু এ তো লক্ষ্মীদেবী ওঠেননি। এ যে অলক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়েছে। যে ভারতের মাতৃরূপ তোমাদের মনে জেগেছিল, যাঁর গ্লানি দূর করার জন্য পিতামাতার চোখের জল, আত্মীয়-পরিজনের স্নেহবন্ধন, গৃহের সুখশান্তি, সব কিছু উপেক্ষা করে 'তোর ডাক শুনে যদি কেউ না আসে, তবে একলা চল রে'—নীতি গ্রহণ করে দিবানিশি মৃত্যুর সাথে পাল্লা দিয়ে স্বাধীনতা-লাভের দুর্গম পথের দুর্দান্ত পথিক হয়েছিলে, আজ তোমরা যেখানেই থাক একবার তাকিয়ে দেখ—তোমাদের ধ্যানের ভারত, তোমাদের বাংলামায়ের অবস্থা।

তোমাদের কাজ সুসম্পন্ন হয়নি। সমুদ্র মন্থনে উঠেছে গরল, অমৃতের সন্ধান এখনও মেলেনি। হে মহান্ বিপ্লবীদল, তোমরা আবার এস। বাঙালী তরুণ-তরুণীদের আবার গড়ে তোল। তাদের শোভাযাত্রা শ্লোগান ছাড়িয়ে কর্মী হতে শিখাও। তোমাদের আদর্শে ভারতের তরুণ-তরুণীরা আবার বজ্রকঠোর নির্ভীক অদম্য কর্মী হয়ে উঠুক।

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥